Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ব মুসলিম ঐক্য : সমস্যা ও করণীয় (২০০০-২০১৫)

World Muslim Unity :Challenges and Remedies (2000-2015)

পিএইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত গবেষণাপত্র

জুন-২০২১

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইব্‌ন হোছাইন

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

মোঃ কামরুল হাসান

পিএইচ. ডি. গবেষক

রেজি. নং- ২০৯/ ২০১৪-২০১৫

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ব মুসলিম ঐক্য : সমস্যা ও করণীয় (২০০০-২০১৫)

World Muslim Unity :Challenges and Remedies (2000-2015)

পিএইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত গবেষণাপত্র

জুন-২০২১

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইব্‌ন হোছাইন

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উপস্থাপনায়

মোঃ কামরুল হাসান

পিএইচ.ডি. গবেষক

রেজি. নং- ২০৯/ ২০১৪-২০১৫

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"বিশ্ব মুসলিম ঐক্য : সমস্যা ও করণীয় (২০০০-২০১৫)"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভ আমার গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে, এ শিরোনামে ইতোপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেননি। পিএইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এ গবেষণাপত্র বা এর কোন অংশ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপিত হয়নি।

(মোঃ কামরুল হাসান)
রেজি. নং : ২০৯/২০১৪-২০১৫
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোঃ কামরুল হাসান কর্তৃক উপস্থাপিত **“বিশ্ব মুসলিম ঐক্য : সমস্যা ও করণীয় (২০০০-২০১৫)”** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এটি একটি মৌলিক গবেষণা। আমার জানামতে এ অভিসন্দর্ভ কিংবা এর কোন অংশ অন্যের ডিগ্রী থেকে নেয়া হয়নি অথবা অন্য কোন প্রকাশনায় প্রকাশের জন্য জমা দেয়া হয়নি। সুতরাং গবেষককে পিএইচ. ডি. ডিগ্রী প্রদানের নিমিত্তে অভিসন্দর্ভটি পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের জন্য জমা নেয়ার সুপারিশ করছি।

(ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইব্‌ন হোছাইন)
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যার একান্ত দয়া ও মেহেরবানীতে **"বিশ্ব মুসলিম ঐক্য : সমস্যা ও করণীয় (২০০০-২০১৫)"** শীর্ষক পিএইচ. ডি. গবেষণাটি সমাপ্ত করতে সক্ষম হয়েছি। সালাত ও সালাম আমাদের প্রিয় নবী, মানবতার মহান শিক্ষক ও বন্ধু রাসূলে আকরাম (স.) ও তাঁর মহান পরিবারবর্গ, সাহাবায়ে আজমা'ঈন, তাবে'ঈন, তাবে-তাবে'ঈনসহ আল কুর'আনের খাদিম সকল মহামানবের প্রতি যুগে যুগে যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের বদৌলতে বিশ্ববাসী সঠিক পথের দিশা পেয়েছেন। মুসলিম ঐক্যের বিষয়ে ছোট বেলা থেকেই ভাবতাম 'নিজেদের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য যদি মুসলিমরা এক হতো।' সে চিন্তা থেকেই পিএইচ. ডি. করার সুযোগ পেয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম নিজের ক্ষুদ্র সাধ্যের মধ্যে আর কিছু সম্ভব না হোক ঐক্যের জন্য একটা গবেষণা হোক। আল-হামদুলিল্লাহ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীনে ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষে বিভাগীয় অধ্যাপক আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইব্‌ন হোছাইন স্যারের সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানে পিএইচ. ডি. গবেষণায় সে সুযোগটি লাভ করি। অভিসন্দর্ভটি তৈরির প্রতিটি পর্যায়ে আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক স্যার খুবই আন্তরিকতার সাথে আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান, উপদেশ ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করে অভিসন্দর্ভ প্রস্তুতিতে যাবতীয় সহায়তা করেছেন। তিনি আমাকে হাতে কলমে গবেষণা শিখিয়েছেন, তাঁর অধীনেই আমি এম. ফিল. ডিগ্রি সম্পন্ন করেছিলাম। তিনি তাঁর সংগ্রহ থেকে প্রয়োজনীয় সহায়ক পুস্তক প্রদান করে এবং বিভিন্ন সময়ে নানা পুস্তকের প্রাপ্তি সংবাদ দিয়ে আমার পিএইচ. ডি. গবেষণা কর্মকেও এগিয়ে নেয়ার পথ প্রশস্ত ও সুগম করে দিয়েছেন। তিনি গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আদ্যপান্ত পরিমার্জনা ও সংস্কারের দায়িত্ব পালন করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। আমি তাঁর জন্য মহান আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতে সর্বোত্তম প্রতিদান কামনা করছি। এরপর আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই একই বিভাগের অধ্যাপক ও ডিপার্টম্যান্টের বর্তমান চেয়ারম্যান ড. শামসুল আলম স্যারের প্রতি, এম. ফিল. কোর্সের ভর্তির সময় যার সংস্পর্শে আসি। তখন থেকেই তিনি আমার গবেষণাকর্ম সম্পাদনে বিভিন্নভাবে উৎসাহ প্রদান করেছেন। অনেক জটিল বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়ে আমার নিকট সহজবোধ্য করে দিয়েছেন। এছাড়াও বিভাগীয় সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর প্রতি যারা কোন না কোনভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান, বিশ্ব বরেণ্য ইসলামী শিক্ষাবিদ প্রফেসর সাইয়্যেদ মাওলানা কামালুদ্দীন আব্দুল্লাহ জাফরী, বাংলাদেশ কুর'আন শিক্ষা সোসাইটির চেয়ারম্যান বিশিষ্ট লেখক ও অনুবাদক বহুগ্রন্থ প্রণেতা মাওলানা আব্দুস শহীদ নাসিম, সিএসডিএফ এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মীর মানজুর মাহমুদ, ভোলা জেলার বাটামারার পীর প্রখ্যাত আলেম মাওলানা মুহিব্বুল্লাহ, বাংলাদেশ মসজিদ মিশনের

Dhaka University Institutional Repository

জেনারেল সেক্রেটারী ড. মাওলানা খলিলুর রহমান মাদানী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. মুহাম্মাদ হাবিবুর রহমান, কাঁটাবন কেন্দ্রীয় মসজিদের খতীব ও বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আ ন ম রফিকুর রহমান মাদানী, ঐতিহ্যবাহী তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ ড. মুফতি মাওলানা আবু ইউসুফ খান, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মাওলানা আব্দুস সবুর মাতুব্বর, আন-নাহদা ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মাওলানা রফিকুল ইসলাম মিয়াজী ও ভাইস চেয়ারম্যান ড. মুহিব্বুল্লাহ শাহীন এর প্রতি। তাঁরা আমার গবেষণাকর্ম এগিয়ে নেয়ার ব্যাপারে অনেক সময় ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়েছেন ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন। কৃতজ্ঞতা জানাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি প্রাপ্ত বন্ধুবর ড. মোঃ আশরাফুল হক ও বিআইসির প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব এস এম জহিরুদ্দীনকে যারা শত ব্যস্ততার মধ্যেও নিজ দায়িত্বে প্রুফ দেখা ও অভিসন্দর্ভটি মেকআপের কাজে আমাকে সহায়তা করেছেন। আরো কৃতজ্ঞতা জানাই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য পিএইচ. ডি. ডিগ্রি প্রাপ্ত আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাজ ড. মুফতি মাওলানা মুহাম্মাদ হাবিবুল্লাহ এর প্রতি। তিনি বিভিন্ন সময় আমাকে গবেষণা কাজে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন। অভিসন্দর্ভটি রচনায় আমি যে সকল দেশী বিদেশী লেখকগণের রচনার সাহায্য নিয়েছি তাদের কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি ও তাঁদের জন্য আল্লাহর কাছে উত্তম প্রতিদান কামনা করছি। তা ছাড়াও আমার শ্রদ্ধেও আব্বু মাওলানা আবু ইউসুফ, আম্মু মমতাজ বেগম, দাদু ভাই মাওলানা যাইনুল আবেদীন, শশুর মাওলানা ছালেহ উদ্দীন, শাশুড়ি আমেনা বেগম, স্ত্রী শামীমা শারমিন, একমাত্র সন্তান শাহ আব্দুল্লাহ মাবরুর, ছোট ভাই হাসনাঈন ও সুফিয়ান, ভগ্নিপতি ফজলুর রহমান, মোস্তাফিজুর রহমান, বোন মাকসূদা ও হাফসাসহ আত্মীয়বর্গ ও শুভাকাঙ্খী সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি যারা আমার পিএইচ. ডি. গবেষণায় বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন ও উৎসাহ দিয়েছেন। মাগফিরাত ও জান্নাতে সর্বোচ্চ মর্যাদা কামনা করছি আমার প্রয়াত দাদা-দাদু, নানা-নানু, বড় ভাই, ছোট বোন ও দুই মামা সহ সেসকল আত্মীয়স্বজনের যাঁরা ইতোমধ্যে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন তাদের সকলের জন্য। আল্লাহ তাঁদের কবরকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দিন। অভিসন্দর্ভটি রচনায় আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, পাবলিক লাইব্রেরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ইণ্ডিয়ান জাতীয় গ্রন্থাগার কলকাতা, আল আরাফাহ ও ইসলামী ব্যাংক লাইব্রেরী ঢাকা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান থেকে সহায়তা নিয়েছি। এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ আন্তরিকতার সাথে আমাকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন, আমি তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞ।

-গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

আরবী অক্ষরের বাংলা প্রতিবর্ণায়ন

ا	আলিফ	অ/া	ق	ক্বাফ	ক্ব
ء	হামযা	অ/’ (ঊর্ধ্ব কমা)	ك	কাফ	ক
ب	বা	ব	ل	লাম	ল
ت	তা	ব	م	মীম	ম
ث	ছা	ছ/স	ن	নূন	ন
ج	জ্বীম	জ	و	ওয়াও	ওয়া/উ/ও/ভ
ح	হা	হ	هـ	হা	হ
خ	খা	খ	ة	তা/হা	ত
د	দাল	দ	ي	ইয়া	য়
ذ	যাল	য	اي	ঈ	ী
ر	র	র	◌ٍ	দুই যের	ইন
ز	যা	য	◌ً	দুই যবর	আন
س	সীন	স	◌ٌ	দুই পেশ	উন
ش	শীন	শ	◌ّ	তাশদীদ	দ্বিত্ব বর্ণ/্য
ص	সোয়াদ	স	◌َ	যবর	া/আ
ض	দোয়াদ	দ	◌ِ	যের	ি/ই
ط	ত্বোয়া	ত্ব	◌ُ	পেশ	ু/উ
ظ	যোয়া	য	ا	হ্রস	হ্রস চিহ্ন
ع	আইন	‘আ/উল্টো কমা	بُ	বু	বু
غ	গাইন	গ	بو	বূ	বো
ف	ফা	ফ	بي	বী	বি

শব্দ সংক্ষেপ নির্দেশনা

আল কুর'আন ০০:০০	প্রথম সংখ্যা সূরা ও দ্বিতীয় সংখ্যা আয়াতের
('আ.)	'আলাইহিস্ সালাম
ইমাম বুখারী	আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল জু'ফী
ইমাম মুসলিম	আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন-নিশাপুরী
ইমাম তিরমিযী	আবূ 'ঈসা মুহাম্মাদ ইব্ন 'ঈসা আত-তিরমিযী
ইমাম আবূ দাউদ	আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্ন আশআস্ আস-সিজিস্তানী
ইমাম নাসাঈ	আহমদ ইব্ন শু'আইব আন-নাসাঈ
ইমাম ইব্ন মাজাহ্	আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মাজাহ্ আল-কাযবীনী
ইমাম আহমাদ	আহমাদ ইব্ন হাম্বল
ইমাম ত্বহাবী	আবূ জা'ফর আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ আত-ত্বহাবী
ইব্ন কাছীর	আবূল ফিদা 'ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইব্ন কাছীর
ইব্ন জারীর	আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আত-ত্বারী
ই. ফা. বা.	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
কুরতুবী	আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন আবী বকর ইব্ন ফার্‌রাহ আল-কুরতুবী
ত্বারাণী	আবুল কাশেম সুলায়মান ইব্ন আহম্‌দ আত-ত্বারাণী
বায়হাকী	আহমাদ ইব্ন হুসাইন আল-বায়হাকী
যাহাভী	ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন 'উছমান আয-যাহাভী
রাযী	আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন 'উমর ইবনুল হুসাইন আত-তামিমী ফখরুদ্দীন আর-রাযী
শাওকানী	মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ আশ-শাওকানী
খ্রি. পূ.	খ্রিস্ট পূর্ব
খ্রি.	খ্রিস্টাব্দ
তা. বি.	তারিখ বিহীন
(র.)	রহমাতুল্লাহি 'আলাইহি
(রা.)	রাদিয়াল্লাহু 'আনহু/ 'আনহুম/ 'আনহা/ 'আনহুমা/ 'আনহুন্না
(স.)	সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম
ইমাম মালিক	ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (র.)
মুস্‌নাদু আহমাদ	মুস্‌নাদু ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র.)
বুখারী	আল জামে'উল মুস্‌নাদুস সহীহ আল মুখ্‌তাসার মিন সুনানি রাসূলিল্লাহ (স.)
মুসলিম	সহীহ মুসলিম
তিরমিযী	সুনান আত-তিরমিযী
আবু দাউদ	সুনান আবু দাউদ
ইবনু মাযাহ	সুনান ইব্ন মাযাহ
নাসাঈ	সুনান আন নাসাঈ
ড.	ডক্টর
অনু.	অনুবাদ

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

ঘোষণাপত্র		০৩
প্রত্যয়ণপত্র		০৪
কৃতজ্ঞতা স্বীকার		০৫
প্রতিবর্ণায়ন		০৭
শব্দ সংক্ষেপ নির্দেশনা		০৮
সূচি		০৯-১৮

ভূমিকা		**২০-২১**

প্রথম অধ্যায়	**বিশ্ব মুসলিম পরিচয়**	**২২-২৮**
	বিশ্ব	২২
	মুসলিম	২২
	উম্মাহর পরিচয়	২৪
	মুসলিম উম্মাহই শ্রেষ্ঠ উম্মাহ	২৫
	শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন ও ধরে রাখার জন্য করণীয়	২৬
	মুসলিম উম্মাহ মধ্যমপন্থী জাতি	২৬

দ্বিতীয় অধ্যায়	**ঐক্য ও ঐক্যের ভিত্তি**	**২৯-৪৯**
	ঐক্য	২৯
	ঐক্যের প্রকার	৩০
	অনৈক্য	৩২
	এক. ঈমানের প্রাসঙ্গিক বিষয়ে অনৈক্য	৩২
	দুই. ফিকহী বিষয়ে অনৈক্য	৩২
	তিন. ইখতেলাফ মা'আল ইফতেরাক	৩৩
	ইখতেলাফ ও ইফতেরাক	৩৪
	চার. দাওয়াতি পদ্ধতির অনৈক্য	৩৫
	পাঁচ. রাজনৈতিক চিন্তা ও দর্শনের অনৈক্য	৩৫
	ঐক্যের ভিত্তি	৩৬
	মুসলিম ঐক্য সম্ভব!	৩৭
	আহলে কিতাবদের সাথে ঐক্য	৩৮
	মুসলিম উম্মাহর ঐক্য অর্থ?	৩৮
	সাধারণ জনতার ঐক্য ও একটি অদ্ভুত আশা	৩৮
	মুসলিম বিশ্বের সীমানা ও পরিধি	৪০

Dhaka University Institutional Repository

	মুসলিম বিশ্বের জনসংখ্যা	৪১
	ঐক্যের পথে প্রথম চ্যালেঞ্জ	৪১
	দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ	৪২
	তৃতীয় চ্যালেঞ্জ	৪৩
	চতুর্থ চ্যালেঞ্জ	৪৩
	মুসলিম বিশ্বের ঐক্য বলতে আমরা কী বুঝি?	৪৪
	ব্যক্তিগত পর্যায়	৪৫
	জাতি রাষ্ট্র পর্যায়	৪৬

তৃতীয় অধ্যায়	**কুর'আন ও হাদীসে ঐক্য ও অনৈক্য প্রসঙ্গ**	**৫০-৭৭**
	আল্লাহর রজ্জুকে ঐক্যবদ্ধভাবে ধারণ করার নির্দেশ	৫০
	মুসলিমদের শক্তির প্রথম মূল ভিত্তি তাকওয়া	৫২
	তাকওয়ার হক কী?	৫২
	মুসলিমদের শক্তির দ্বিতীয় মূল ভিত্তি পারস্পরিক ঐক্য	৫৩
	নানামত সৃষ্টিকারীদের পরিণতি	৫৭
	মুসলিমদের বিজয়ের জন্য অন্যতম শর্ত	৫৮
	ঐক্যের ভিত্তি দীন	৫৯
	ইলমে অহীর জ্ঞানই ঐক্যের হাতিয়ার	৬০
	রবের ইবাদতই ঐক্যের মূল প্রেরণা	৬১
	ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখলে আল্লাহ অনুগ্রহ করবেন	৬১
	ঐক্যবদ্ধ থাকলে আল্লাহ অনুগ্রহ করেন	৬২
	পারস্পরিক বিদ্বেষ অনৈক্যের কারণ	৬৩
	ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য যা অনুশীলন করা জরুরী	৬৩
	ঐক্যের সার্থে যা পরিহার করা আবশ্যক	৬৬
	বন্ধুত্ব ও শত্রুতার নীতিমালা	৬৭
	বিভেদ নিরসনে কুর'আনের দিক নির্দেশনা	৬৮
	অনৈক্যের পরিণতি	৭২
	হাদীসের আলোকে ঐক্য	৭২
	সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করা ফরয	৭৩
	জান্নাতের আনন্দ উপভোগ	৭৩
	রাসূল (স.) ও সাহাবায়ে কিরামই অনুসরণীয়	৭৪
	ঐক্য ও সংহতি রক্ষা	৭৪
	পাঁচটি বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ	৭৫
	শয়তানের হাত থেকে বাঁচার উপায়	৭৫
	প্রকৃত মু'মিন ও মুসলিমের পরিচয়	৭৬
	মুসলিম ঐক্যে ফাটল ধরালে ভয়াবহ শাস্তি রয়েছে	৭৭

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়	**ঐক্যের গুরুত্ব**	**৭৮-৮৫**
	ঐক্য একমাত্র ইসলামের ভিত্তিতেই সম্ভব	৭৮
	ঐক্য আল্লাহর আনুগত্যের ওপর নির্ভরশীল	৮০
	মুসলিমদের জাতীয় ও সমষ্টিগত কল্যাণ	৮১
	সরল সঠিক পথে চলার উপায়	৮১
	আল্লাহ ঐক্যবদ্ধ লোকদের ভালোবাসেন	৮২
	আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ পাওয়ার নিশ্চয়তা	৮২
	মহা পুরস্কার ও সফলতার সুসংবাদ	৮২
	ঐক্যবদ্ধ রাখা নবীগণের বৈশিষ্ট্য	৮৩
	নিশ্চিত সফলতা	৮৩
	বিচ্ছিন্নতাবাদিদের পরিণতি	৮৩
	বিচ্ছিন্নতাবাদিদের জন্য আল্লাহর আযাবের হুঙ্কার	৮৪
	কিছু অংশ মানা আর কিছু অংশ না মানার পরিণতি	৮৫

পঞ্চম অধ্যায়	**উম্মাহর ঐক্যের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস**	**৮৬-১০৫**
	আদম থেকে নূহ (আ.)	৮৬
	হযরত মূসা ও হারূন (আ.)-এর যুগ	৮৬
	ঐক্যের স্বার্থে জাতীয় ভুলও এড়িয়ে যাওয়া	৮৬
	বিশ্ব নবীর যুগ	৮৭
	হিলফুল ফুযুল গঠন	৮৮
	হাজারে আসওয়াদ স্থাপন	৮৮
	নবুওয়্যাতের যুগ	৮৯
	মতবিরোধ মুক্ত সোনালী যুগ	৮৯
	বিশ্ব নবীর যুগে সাহাবায়ে কিরামগণের বৈশিষ্ট্য	৯০
	আওস ও খাযরাজের মাঝে সম্প্রীতি স্থাপন	৯১
	মহানবী (স.) এর বিদায় হজ্জের ভাষণ	৯১
	ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা	৯৫
	ঐক্যের স্বার্থে ফিতনা এড়ানোর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত	৯৭
	যুগে যুগে মতৈক্যের সোনালী ঘটনাবলী	৯৮
	প্রথম ও দ্বিতীয় খলিফা নির্বাচন	৯৮
	হিজরী সন প্রবর্তনের বিষয়ে ঐক্যমত্য	৯৮
	নবী (স.)-এর যুগে সাহাবায়ে কিরাম	৯৯
	খেলাফতে রাশেদার শাসনকাল	৯৯
	শায়খাইনের সময়কাল	১০১
	হাজ্জাজের পিছনে ইব্ন ওমরের সালাত	১০৩

Dhaka University Institutional Repository

	ইমাম শাফেয়ীর ঘটনা	১০৩
	হোসাইন আহমাদ মাদানী ও আশরাফ আলী থানভী	১০৩
	পশ্চিমা অমুসলিমদের দ্বি-মূখী নীতি	১০৩

ষষ্ঠ অধ্যায়	**অনৈক্যের সূত্রপাত ও তার ইতিহাস**	**১০৬-১৩৩**
	অনৈক্য বনাম মতপার্থক্য	১০৬
	ইখতেলাফ (মতপার্থক্য)	১০৬
	ইসলামে মতপার্থক্যের বিধান	১০৬
	ইফতেরাক বা দলাদলি	১০৮
	সৃষ্টির সূচনা থেকেই শয়তানের হিংসা ও অনৈক্য	১০৯
	আদম (আ.) কে সম্মান দেয়ার কারণ	১১০
	হাবিল ও কাবিলের দ্বন্দ্ব	১১১
	অনৈক্যের আনুষ্ঠানিক সূচনা	১১২
	হযরত ইয়াকূব (আ.) এর পুত্রদের দ্বন্দ্ব	১১২
	বিশ্ব নবীর যুগে মত পার্থক্যের সমাধান	১১৩
	সাহাবা যুগে মতভেদ	১১৩
	তাবেয়ীগণের মতপার্থক্য	১২১
	ঈমানদার ও কাফিরের চিন্তার অনৈক্য	১২২
	চূড়ান্ত অনৈক্য ও অধঃপতনের শুরু	১২২
	খারেজী সম্প্রদায়	১২৪
	খারেজী সম্প্রদায়ের উত্থান ও পতন	১২৭
	খারেজীদের কিছু বৈশিষ্ট্য	১২৯
	খারেজী চিনার উপায়	১২৯
	বর্তমান যামানার খারেজী	১৩২

সপ্তম অধ্যায়	**মুসলিম উম্মাহর সমকালীন অনৈক্য (২০০০-২০১৫)**	**১৩৪-১৪১**
	একে অপরের প্রতি মন্দ ধারণা	১৩৪
	অপরের দোষ অন্বেষণ	১৩৪
	হিংসা	১৩৬
	সাময়িক ক্ষমতার লোভ	১৩৬
	পরকালের সাফল্যের প্রতি অনাসক্তি	১৩৭
	অমুসলিমদের ইসলাম বিদ্বেষ	১৩৮
	ইসলামের দুশমনদের চক্রান্ত	১৩৮
	মুনাফিকরা মন্দ কাজে উৎসাহিত করে	১৩৯
	বিভিন্ন চিন্তা লালনকারী রাজনৈতিক দলসমূহ	১৩৯
	ফিলিস্তিন	১৪০

	গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে উৎখাত	১৪০
	সৌদি আরব ও ইরান	১৪১
	কাতার অবরোধ	১৪১
	মিডিয়ার মিথ্যা প্রচারণা	১৪১

অষ্টম অধ্যায়	**ঐক্য প্রচেষ্টা (২০০০-২০১৫)**	**১৪৩-১৬২**
	আই এম সি টি সি গঠন	১৪৩
	এলায়েন্স গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	১৪৪
	জোটের ৩৪টি দেশ	১৪৫
	মূল্যায়ন	১৪৫
	বাংলাদেশে ইসলামী ঐক্য প্রচেষ্টা	১৪৬
	প্রথম সম্মেলন	১৪৬
	দ্বিতীয় সম্মেলন	১৪৬
	সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ	১৪৮
	শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের ঐতিহাসিক আহবান	১৪৮
	জাতীয় শরীয়াহ কাউন্সিলের আহবায়ক কমিটি গঠন	১৫০
	লিয়াজোঁ কিমিটির সদস্যবৃন্দ	১৫১
	শরীয়াহ কাউন্সিলের ২০০৩ সালের সম্মেলন	১৫২
	পুরানা পল্টনে শরীয়াহ কাউন্সিলের বৈঠক	১৫২
	মজলিসে আমেলার সদস্যগণ	১৫৩
	জাতীয় শরীয়াহ কাউন্সিলের পরবর্তী সম্মেলন	১৫৭
	শরীয়াহ কাউন্সিলই সর্বদলীয় ঐক্য মঞ্চ	১৫৮
	হেফাযতে ইসলাম বাংলাদেশ	১৬০
	হেফাযতে ইসলামের দাবিসমূহ	১৬১
	লং মার্চ এবং সমাবেশ	১৬২
	পর্যালোচনা	১৬২

নবম অধ্যায়	**উম্মাহর অনৈক্যের কুফল ও পরিণতি**	**১৬৩-১৭৯**
	ভয়াবহ কুফল ও পরিণতি	১৬৪
	সমস্যা জিইয়ে রাখার সুযোগ পেল	১৬৪
	মানব হত্যাকারী কাকের চেয়েও নিকৃষ্ট	১৬৪
	অনৈক্যের ক্ষতির উদাহরণ	১৬৫
	তাতারিদের ভয়াবহ আক্রমণ	১৬৫
	বাগদাদের হৃদয় বিদারক ঘটনা	১৬৬
	এ ধ্বংসের অন্যতম কারণ গৃহবিবাদ	১৬৮
	কা'বায় চার ইমামের পিছনে সালাত আদায়	১৬৯

	মুসলিমরা স্পেন থেকে বিতাড়িত	১৬৯
	মুসলিমদের পশ্চাদপদ অবস্থা	১৭০
	মুসলিমদের পরনির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয়	১৭০
	বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিভক্তির পরিণতি	১৭১
	শিরক-কুফর ও খৃষ্টধর্ম প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি	১৭১
	আলিম ওলামাদের বিষয়ে ব্যাপক কুৎসাচার	১৭১
	হানাহানি ও রক্তারক্তি	১৭২
	আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বিভক্তির পরিণতি	১৭৩
	ফিলিস্তিনে ধব্বংসযজ্ঞ	১৭৩
	ইয়াহুদী কর্তৃক বায়তুল মোকাদ্দাসে আগুন	১৭৬
	আফগানিস্তানে বর্বোরোচিত হামলা	১৭৭
	ইরাকে আগ্রাসন	১৭৭
	লিবিয়া ও সিরিয়ায় ধ্বংসযজ্ঞ	১৭৮
	নির্যাতিত বিভিন্ন মুসলিম জনপদ	১৭৮
	বিশ্বনবীকে নিয়ে ব্যঙ্গ করার ধৃষ্টতা	১৭৯
	আল কুর'আনে আগুন দেয়ার ধৃষ্ঠতা	১৭৯

দশম অধ্যায়	**ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সমস্যাসমূহ**	**১৮০-১৮৩**
	সুশিক্ষার অভাব	১৮০
	মাযহাবের গোঁড়ামী	১৮০
	কুর'আন-সুন্নাহর আইন সমাজে কার্যকর না থাকা	১৮০
	দীন বিজয়ী না থাকা	১৮১
	মুসলিমদের দীন বিজয়ের ঐক্যবদ্ধ ফ্লাটফর্ম নেই	১৮১
	খিলাফত ব্যবস্থা ও খলীফা না থাকা	১৮১
	ঐক্যের ধ্যান ধারণা পোষণ না করা	১৮১
	ক্ষমতার লোভ	১৮২
	সম্পদের লোভ	১৮২
	অমুসলিমদের ষড়যন্ত্র ও প্রোপাগান্ডা	১৮২
	ঐক্যের সুনির্দিষ্ট এজেন্ডা না থাকা	১৮২
	যালিম পরাশক্তির ভয়	১৮৩
	ইসলামী ঐক্য প্রতিষ্ঠায় অন্যান্য সমস্যাসমূহ	১৮৩

একাদশ অধ্যায়	**উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্য উপায় ও করণীয়**	**১৮৪-২২১**
	সকলের জন্য সুশিক্ষা নিশ্চিত করা	১৮৪
	ঐক্যের প্রেরণা দান	১৮৪
	বলিষ্ঠ নেতা নির্বাচন	১৮৪

Dhaka University Institutional Repository

	সঠিক নেতৃত্ব দান	১৮৫
	দেশের আলেম সমাজের গোলটেবিল বৈঠক	১৮৫
	নেতৃবৃন্দের চা চক্র, গোল টেবিল বৈঠক	১৮৫
	একে অপরকে মূল্যায়ন করা	১৮৬
	কারো প্রতি ক্ষোভ বা ঘৃণা না রাখা	১৮৬
	অন্যের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা	১৮৭
	নিজেদের মাঝে ঐক্যবদ্ধ দৃঢ় বন্ধন তৈরী করা	১৮৮
	নিজেদের মাঝে বৈঠক ও যোগাযোগ বৃদ্ধি	১৮৯
	আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দু'আ করা	১৮৯
	বিশ্ব নবী (স.) এর দু'আ	১৯০
	পরকালিন সফলতাই চূড়ান্ত সফলতা	১৯১
	সামরিক শক্তি অর্জন	১৯১
	আধুনিক সমরাস্ত্র উৎপাদন ও রপ্তানি	১৯২
	বিশ্ব পরিস্থিতি মূল্যায়ণ করা	১৯২
	প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা	১৯২
	আমাদের করণীয়	১৯৩
	প্রয়োজনে শান্তি চুক্তি করা	১৯৩
	শিক্ষা বিপ্লব	১৯৪
	আকাশ গবেষণা	১৯৪
	মিডিয়া ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ	১৯৪
	ইসলামিক মিডিয়া তৈরী	১৯৫
	নিজস্ব স্যাটেলাইট	১৯৫
	মুসলিম সোস্যাল মিডিয়া	১৯৬
	ইন্টারনেটের বিকল্প মুসলিমদের ইন্টারনেট	১৯৬
	মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিকপন্থা অবলম্বন	১৯৬
	তাকলীদ বিষয়ে সচেতনতা	১৯৭
	কুর'আন-হাদীসের অনুসরণ এবং ইস্তেখরাজ	২০০
	কুর'আন ও সুন্নাতের অনুসরণ ও অনুকরণ	২০০
	ক. চিন্তা-গবেষণা	২০১
	খ. উসূলসমূহকে পুরোপুরি আয়ত্ত করা	২০১
	গ. সঠিক পন্থা অবলম্বন	২০১
	ইমাম আবু হানীফা (র.) এর বক্তব্য	২০২
	ইমাম মালিক (র.) এর বক্তব্য	২০৩
	ইমাম শাফেয়ী (র.) এর বক্তব্য	২০৩
	ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) এর বক্তব্য	২০৩
	ইমাম আবু ইউসুফ ও যুফার (র.)	২০৪

	ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান (র.)	২০৪
	ফকীহদের পারস্পরিক মতপার্থক্যের সমাধান	২০৫
	ঐক্যের স্বার্থে সংবাদ যাছাই করা	২০৭
	দুই গ্রুপ ঝগড়ায় লিপ্ত হলে করণীয়	২০৮
	মুসলিম পরস্পর ভাই ভাই	২০৮
	ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে অটুট রাখতে করণীয়	২০৯
	সালামের প্রচলন	২০৯
	আত্মীয়তার সম্পর্ক সুদৃঢ়করণ	২১০
	অন্যকে ক্ষমা করে দেয়া	২১১
	অন্যকে খাওয়ানো	২১১
	প্রতিবেশির সাথে সর্বোত্তম ব্যবহার	২১১
	মেহমানের উত্তম মেহমানদারী করা	২১২
	অধীনস্থদের সাথে সর্বোত্তম ব্যবহার	২১৩
	প্রতিশোধ না নেয়া	২১৩
	ধৈর্য ধারণ করা	২১৪
	কোমল হৃদয়ের অধিকারী হওয়া	২১৬
	কাফিরদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করা	২১৬
	প্রতিরোধ যুদ্ধের সূচনা	২১৭
	গণীমত লাভের প্রেরণা	২১৭
	কুর'আনের শিক্ষা	২১৮
	পারিবারিক শিক্ষা	২১৮
	মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষা	২১৯
	জুমুআর খুৎবায় ঐক্যের আলোচনা	২১৯
	টিভি মিডিয়ায় ঐক্য সংক্রান্ত প্রচারণা	২১৯
	বিশ্ব শান্তির জন্য ঐক্য	২১৯
	খিলাফত ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা	২২০
	কোন মুসলিমকে ঘৃণা না করা	২২০
	পারস্পরিক সাক্ষাত	২২০
	মতবিনিময়	২২০
	সংলাপ	২২১

দ্বাদশ অধ্যায়	**উম্মাহর ঐক্যের সুফল**	**২২২-২২৪**
	ভারতীয় মুসলিমদের দৃষ্টান্ত	২২২
	ভারত বর্ষ থেকে ইংরেজদের উৎখাত	২২২
	পাকিস্তানে সফল ওলামা সম্মেলন	২২২
	কু-ব্যর্থ করে দেয়া হল	২২৩

Dhaka University Institutional Repository

	সোভিয়েত ইউনিয়নের পরাজয়	২২৩
	বাংলাদেশের দু'টি নির্বাচন	২২৩
	বাংলাদেশে ইসলামী ঐক্য	২২৩
	বাংলাদেশে হেফাযতে ইসলামের সফলতা	২২৩
	কওমী মাদরাসার সনদ লাভ	২২৪

ত্রয়োদশ অধ্যায়	**ঐক্য প্রতিষ্ঠায় দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান**	**২২৫-২৪৮**
	ওআইসি	২২৫
	ওআইসির স্লোগান	২২৫
	ওআইসি গঠনের পটভূমি	২২৫
	আরব ইসরাঈল যুদ্ধ	২২৭
	প্রতিষ্ঠার কারণ	২২৮
	প্রতিষ্ঠাকাল ও নামকরণ	২২৮
	ওআইসি গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	২২৯
	বাস্তবতা	২৩৫
	ডি. ৮	২৩৬
	ইত্তেহাদুল 'আলামী লি উলামাইল মুসলিমীন	২৩৭
	সার্ক	২৩৮

চতুর্দশ অধ্যায়	**কয়েকজন মুসলিম চিন্তা নায়ক ও তাঁদের ঐক্য প্রচেষ্টা**	**২৪৯-২৯০**
	বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী (র.)	২৪৯
	মুমিনদের ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা	২৪৯
	হিংসা থেকে বাঁচার উপায়	২৫৬
	সাঈদ নূরসীর একটা স্মরণীয় ঘটনা	২৫৭
	শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (র.)	২৬১
	সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.)	২৬২
	মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব সম্পর্কে তাঁর সংক্ষিপ্ত চিন্তাধারা	২৬৩
	বিশ্ব কবি আল্লামা ইকবাল	২৬৩
	ফয়সাল ইবন আব্দুল আযিয	২৬৫
	মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা	২৬৭
	সৌদি আরবের বাদশাহ	২৬৭
	সাইয়্যেদ আবুল আলা মাওদুদী (র.)	২৭১
	মুসলিম ঐক্য চিন্তা	২৭১
	শহীদ হাসান আল-বান্না (র.)	২৭২
	মুসলিম ঐক্য প্রচেষ্টায় ফুরফুরার পীর সাহেব	২৭৩
	ড. ইউসুফ আল-কারযাভী (হাফিযাহুল্লাহ)	২৭৩

	মাওলানা আব্দুর রহীম (র.)	২৭৫
	ইসলামী দলগুলোকে একত্রিত করতে তাঁর প্রচেষ্টা	২৭৮
	আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পণ্ডিত	২৭৮
	তাঁর লিখিত গ্রন্থ	২৭৯
	রজব তাইয়্যেব এরদোয়ান	২৮৫
	তুরস্কে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান	২৮৬
	সিরিয়া সংকট সমাধান	২৮৬
	তুরস্ক-মধ্যপ্রাচ্য ও মুসলিম বিশ্ব সম্পর্ক	২৮৭
	মুসলিম বিশ্ব ঐক্যের ডাক	২৮৭
	হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনা	২৮৮
	খিলাফাহ ফিরিয়ে আনার ইঙ্গিত	২৮৮
	মুহাম্মাদ ইবন সালমান	২৮৯

পঞ্চদশ অধ্যায়	**সুপারিশমালা**	**২৯১-২৯৮**

শেষকথা		**২৯৯-৩০০**

সহায়ক গ্রন্থাবলী		**৩০১-৩১০**

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ব মুসলিম ঐক্য : সমস্যা ও করণীয় (২০০০-২০১৫)

World Muslim Unity :Challenges and Remedies (2000-2015)

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

মুসলিম উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ থাকা এবং নিজেদের একতা ও সংহতি রক্ষা করা ইসলামের একটি অন্যতম মৌলিক ফরয কাজ। বর্তমান প্রেক্ষাপটে উম্মাহর ঐক্য আরো অত্যাবশ্যকীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে-দেশ ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে। কারণ বর্তমান মুসলিমরা নির্মম নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ডের শিকার আজকের ইরাক, লিবিয়া, সিরিয়া, ইয়ামান, কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, মিয়ানমার, আফগানিস্তান, চীনের ঝিংঝিয়াংসহ বিশ্বময়। গোটা দুনিয়ার মাযলূম মুসলিমদের বর্তমান করুণ অবস্থা বিবেচনা করে বিবেকবান মানুষরা ভাবছে এর থেকে উত্তরণের উপায় কী? না কি এভাবেই চিরদিন মার খেতে থাকবে মুসলিম উম্মাহ? তবে সময় এবং বিবেকের দাবী হল, উম্মাহকে আবার ঘুরে দাঁড়াতে হবে, সকল অন্যায়, অপকর্ম, যুল্‌ম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। নিজেদের আত্মরক্ষার শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। আর সেজন্যই নিজেদের মাঝে ইস্পাত কঠিন ঐক্যের কোন বিকল্প নেই। ঐক্য ব্যতীত নিজেদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল মেটানো কিংবা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আগ্রাসন প্রতিরোধ কিছুই সম্ভব নয়। এ বিষয়টির গুরুত্ব বুঝাতেই মুসলিম উম্মাহকে বহু আগেই আল-কুর'আন ও আল-হাদীসে বিশদ দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে সেভাবে ভয় কর যেভাবে ভয় করা উচিৎ এবং মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। আর তোমরা আল্লাহর রজ্জু (আল-কুর'আন)-কে শক্ত করে ধারণ কর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না এবং তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর, তোমরা ছিলে পরস্পরের দুশমন, তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেছেন। ফলে তোমরা তাঁরই অনুগ্রহে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলে। আরো স্মরণ করো তোমরা ছিলে অগ্নিকুণ্ডের কিনারে, তিনিই তোমাদেরকে তা থেকে উদ্ধার করেছেন। এভাবেই আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শন স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা সৎ পথ প্রাপ্ত হও। তোমাদের মধ্যে একটি দল থাকবে, যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে ডাকবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কার্য থেকে নিষেধ করবে; এ সকল লোক হবে সফলকাম। আর তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছিল ও মতভেদ করেছিল। তাদের জন্যই রয়েছে মহাশাস্তি।"(আল-কুর'আন, ০৩:১০৩-১০৫)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন: "নিশ্চই যারা ধর্ম সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করেছে এবং নিজেরা বিভক্ত হয়েছে তাদের কোন কাজের দায়িত্ব তোমার নেই, তাদের বিষয় আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। তিনিই তাদের অবহিত করবেন তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে।" (আল-কুর'আন, ০৬:১৫৯) "আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর ও নিজেরা বিবাদ করো না, করলে সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিনষ্ট হবে। এক্ষেত্রে

তোমরা ধৈর্য্য ধারণ করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্য্যশীলদের সঙ্গেই আছেন।” (আল-কুর'আন, ০৮:৪৬)
নবী কারিম (স.) বলেছেন: “মু'মিনগণ মিত্রতা প্রবণ। আর ঐ ব্যক্তির মাঝে কোন কল্যাণ নেই, যে মিত্র হয় না এবং যাকে মিত্র বানানো যায় না।” (মুসনাদে আহমাদ, হা. নং-৯১৯৯) তিনি আরো বলেছেন: “এক মু'মিন আরেক মু'মিনের জন্য আয়না স্বরূপ। আর এক মু'মিন আরেক মু'মিনের ভাই। সে তার জমি সংরক্ষণ করে এবং তার অনুপস্থিতিতে তাকে হিফাযত করে (বেষ্টন করে রাখে)।” (সুনানু আবু দাউদ, হা. নং-৪২৭২) নবী কারিম (স.) আরো বলেছেন, মু'মিন মু'মিনের জন্য দেয়ালের মত, যার একাংশ আরেক অংশকে শক্তিশালী করে।” রাবী বলেন: “এরপর তিনি (স.) তাঁর হাতের আঙুলগুলো প্রবিষ্ট করে দেখালেন।” (সহীহ বুখারী, হা. নং-৬০২৬, সহীহ মুসলিম, হা. নং-২৫৮৫)
আলোচ্য আয়াতে কারীমা ও হাদীসসমূহ থেকে বুঝা যায়, একতাবদ্ধ থাকা মুসলিম উম্মাহর অন্যতম মৌলিক কাজ। আর বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য কত যে গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যকীয় বিষয় তা ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝানোর কোন প্রয়োজন নেই। অনৈক্যের কবলে নিমজ্জিত বিশ্ব মুসলিমদের বর্তমান দুঃখ, দুর্দশা যে কোন সচেতন ব্যক্তির হৃদয়কেই ভারাক্রান্ত ও ব্যথিত করে। বর্তমান মুসলিম উম্মাহ যেন আর বিভক্ত না থাকেন সে আশা হৃদয়ে লালন করেই “বিশ্ব মুসলিম ঐক্য : সমস্যা ও করণীয় (২০০০-২০১৫)” শীর্ষক এ গবেষণা কর্ম। সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি মুসলিম উম্মাহ যেন এ প্রেক্ষাপটে সহজে ঐক্যবদ্ধ হন এমন প্রেরণাদায়ক বিষয়গুলো নিয়ে আসার জন্য। আর যেগুলো উম্মাহর ঐক্যের পথে বাধা তা এরিয়ে গিয়েছি। এরপরও নিজের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে হয়তোবা যথাযথ বিষয়গুলো ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। তাই মহান আল্লাহর কাছে বিনীতভাবে ফরিয়াদ করছি তিনি যেন আমার যাবতীয় দূর্বলতা ও অযোগ্যতাকে ক্ষমা করে দেন এবং বিশ্ব মুসলিমের ঐক্যের লক্ষে এ গবেষণাটি কবূল করেন, আমীন।

প্রথম অধ্যায়
বিশ্ব মুসলিম পরিচয়

বিশ্ব

বাংলা অভিধানে বিশ্ব শব্দটির অর্থ করা হয়েছে- পৃথিবী, ধরিত্রি, ধরা, ভুবন, জগৎ, দুনিয়া, জাহান, প্রভৃতি। আরবীতে العالم[১] এবং ইংরেজিতে World। মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের বসবাসের জন্য আমাদের জীবন চলার যাবতীয় উপকরণ দিয়ে যে বিশাল ভূ-ভাগ সৃষ্টি করেছেন এখানে 'বিশ্ব' বলতে তা-ই উদ্দেশ্য।

মুসলিম

'মুসলিম' শব্দটি আরবী। ইসমে ফায়েল এর একবচনের সীগাহ, বহুবচনে মুসলিমূনা বা মুসলিমীনা ব্যবহৃত হয়। আভিধানিক অর্থ মুসলমান, আত্মসমর্পণকারী, নিবেদিত[২] ইত্যাদি। পবিত্র কুরআ'নুল কারীমে এ বিষয়ে সরাসরি বক্তব্য রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

"আর ইবরাহীম ও ইয়াকূব (আ.) এ সম্বন্ধে তাদের পুত্রগণকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, 'হে পুত্রগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য দীনকে (ইসলামকে) মনোনীত করেছেন, সুতরাং তোমরা মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী) না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।"[৩]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন:

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

"ইবরাহীম (আ.) ইহুদি কিংবা নাসারা ছিলেন না, ছিলেন না কোন মুশরিক বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম।"[৪]

আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেছেন:

---

১. العالم শব্দটি একবচন। বহুবচনে العالمون (হালতে রফয়ী'), হালতে নসবীতে العالمين যেমন, সূরা ফাতিহার মধ্যে এর ব্যবহার, الحمد لله رب العالمين (সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতাপারক আল্লাহর জন্য)।

২. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আরবী বাংলা অভিধান [আল-মু'জামুল ওয়াফী]* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর-২০০৭), পৃ. ৭৭৬

৩. আল কুর'আন, ০২:১৩২

৪. আল কুর'আন, ০৩:৬৭

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

"আর দীনের দিক থেকে ঐ ব্যক্তির চেয়ে উত্তম কে আছে, যে মুহসিন (পুণ্যবান) অবস্থায় আল্লাহর জন্য নিজেকে নিবেদন করেছে (মুসলিম হয়েছে) এবং ইবরাহীমের আদর্শকে অনুসরণ করেছে? আর আল্লাহতো ইবরাহীমকে নিজের বন্ধু হিসেবেই গ্রহণ করেছেন।"[৫]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন:

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

"যখন তাঁর রব তাঁকে বলেছিলেন 'আত্মসমর্পণ করো'। সে বলেছিল: 'আমি জগৎসমূহের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম'।"[৬]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

"আর কথায় ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কে উত্তম? যে (মানুষকে) আল্লাহর দিকে ডাকে, সৎকাজ করে এবং বলে 'আমি মুসলিম' (আত্মসমর্পণকারী)।"[৭]

পরিভাষায়, যে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে মহান প্রতিপালক হিসেবে গ্রহণ করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না এবং রাসূল (স.) প্রদর্শিত পথে নিজের জীবন পরিচালনা করবে, আল্লাহর দেয়া হালালকে হালাল মানবে, হারামকে হারাম হিসেবে বয়কট করবে, সালাত কায়েম করবে, রমাদানের সাওম পালন করবে, নিসাবের অধিকারী হলে যাকাত দিবে ও হজ্জ করবে, সেই মুসলিম। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

"পূর্ব ও পশ্চিমে মুখ ফিরানোতে তোমাদের কোন কল্যাণ নেই বরং কল্যাণ আছে, যে আল্লাহ, পরকাল, ফিরিশতাগণ, কিতাবসমূহ ও নবীগণের প্রতি ঈমান আনে। আর তাঁর ভালোবাসায় অর্থ দান করে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অনাথ, অভাবগ্রস্থ, পর্যটক ও সাহায্যপ্রার্থী এবং দাস মুক্তির জন্য। আর সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে ও প্রতিশ্রুতি করে তা পূর্ণ করে, অর্থ সংকটে, দুঃখ ক্লেশে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য্য ধারণ

৫. আল কুর'আন, ০৫:১২৫
৬. আল কুর'আন, ০২:১৩১
৭. আল কুর'আন, ৪১:৩৩

করে। মূলত: এরাই (তাদের ঈমান ও ইসলামের দিক থেকে) সত্যবাদী এবং এরাই (প্রকৃত) মুত্তাকী।”[৮]

নবী কারীম (স.) বলেছেন:

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْه

“প্রকৃত মুসলিম সে যার হাত ও জবান থেকে অন্য মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে। আর প্রকৃত মুহাজির সে যে আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকে।”[৯] নবী কারীম (স.) আরো বলেছেন:

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ

“প্রকৃত মুসলিম সে যার হাত ও জবান থেকে অন্য মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে। আর প্রকৃত মু’মিন সে যাকে মানুষেরা তাদের রক্ত ও সম্পদের বিষয়ে নিরাপদ মনে করে।”[১০]

উম্মাহর পরিচয়

মুসলিম শব্দের সাথে ‘উম্মাহ’ শব্দটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর উম্মাহ শব্দটি বহুল পরিচিত একটি আরবী শব্দ। এক বচন, বহু বচনে ‘উমামুন’। অভিধানে এর শাব্দিক অর্থ তুলে ধরা হয়েছে, জাতি, জনগণ, পথ, ধর্ম ইত্যাদী। তবে সাধারণভাবে উম্মাহ বলতে জাতিকেই বুঝায়। সে হিসেবে ‘মুসলিম উম্মাহ’ বলতে ‘মুসলিম জাতিই’ উদ্দেশ্য। ইসলামে ঐক্যের প্রসঙ্গ নিয়ে কথা শুরু হলেই পরিভাষাটি সামনে এসে উপনীত হয়। তাই এর অর্থ সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা থাকা দরকার। মহাগ্রন্থ আল কুর’আনে উম্মাহ শব্দটি বিভিন্ন প্রসঙ্গে ৬২ বার এসেছে।[১১] আল্লাহ তা’আলা কুর’আনুল কারীমে ঘোষণা করেছেন:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُم فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

“সমস্ত মানুষ ছিল একই উম্মত। অতঃপর আল্লাহ নবীগণকে প্রেরণ করেন সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং তাদের সাথে সত্য সহকারে কিতাব নাযিল করেন, যেন মানুষেরা যে বিষয়ে মতভেদ করত সেসবের মীমাংসা করতে পারেন। আর যাদেরকে তা দেয়া হয়েছিল, স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরেও তারা সে বিষয়ে বিদ্বেষবশতঃ বিরোধিতা

---

৮. আল কুর’আন, ০২:১৭৭

৯. ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনূদিত এবং প্রকাশিত (ঢাকা: ই.ফা.বা. ৫ম সংস্করণ, এপ্রিল-২০০৪), ১ম খন্ড, হাদীস নং-০৯

১০. ইমাম তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনূদিত এবং প্রকাশিত (ঢাকা: ই.ফা.বা. ২য় সংস্করণ, মে-২০১৪), ৫ম খন্ড, হাদীস নং-২৬২৮

১১. আবূ আব্দুল্লাহ, *ইসলামে ঐক্য* (ঢাকা: আল হেরা প্রিন্টার্স, ফকিরাপুল, প্রকাশকাল, ফেব্রুয়ারী-২০১৪), পৃ. ১০

করত। অতঃপর আল্লাহ তাঁর ইচ্ছাক্রমে ঈমানদারদেরকে হিদায়াত দিয়েছেন সে সত্য বিষয়ে যে ব্যাপারে তারা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছিল। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথের দিকে পথ প্রদর্শন করেন।"[১২]

মুসলিম উম্মাহই শ্রেষ্ঠ উম্মাহ

মুসলিম উম্মাহই শ্রেষ্ঠ উম্মাহ এটা সরাসরি আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন। মুসলিম উম্মাহর জন্য এ ঘোষণা যে কত দামী, যিনি যত বিবেকবান তিনি ততো ভালভাবে উপলব্ধি ও মূল্যায়ণ করার কথা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُون

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানব জাতির জন্য যাদের বের করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দিবে, অসৎ কাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনবে। আর আহলে কিতাবগণ যদি ঈমান আনতো তবে তা ছিল তাদের জন্য ভাল। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মু'মিন ছিল; কিন্তু তাদের অধিকাংশই ফাসিক।"[১৩]

আলোচ্য আয়াতে মুসলিম উম্মাহকে শ্রেষ্ঠ উম্মাহ গণ্য করা হয়েছে এবং তার কারণ কি তাও বলে দেয়া হয়েছে। আর তা হল, মানবতার কল্যাণের জন্যই তাদের সৃষ্টি সুতরাং 'ভাল কাজের আদেশ দেয়া, মন্দ কাজে নিষেধ করা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান, বিশ্বাস তথা আস্থা রাখা'। মুসলিম উম্মাহর মধ্যে যদি এ ভালো কাজের বৈশিষ্ট্যগুলো যথাযথ থাকে তবে তারা শ্রেষ্ঠ উম্মাহ। অন্যথা এ উপাধি ও সম্মান থেকে তারা বঞ্চিত হবে।

এরপর আহলে কিতাবদের নিন্দাবাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হল, এ বিষয়টিকে পরিস্কারভাবে বুঝিয়ে দেয়া যে, যদি মুসলিম উম্মাহ ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ প্রদান না করে তা হলে তারাও তাদের মত বিবেচিত হবে। কেননা আহলে কিতাবদের বৈশিষ্ট্য ছিল তারা যে মন্দ কাজ করত, তা থেকে তারা একে অপরকে নিষেধ করত না। এ আয়াতে তাদের অধিকাংশ লোককে ফাসিক বলা হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে,

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা প্রদান করার শরয়ী মান 'ফারযে আইন' (যা পালন করা উম্মাতের প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয), নাকি 'ফারযে কিফায়াহ' (যা উম্মাহর কিছু লোক আদায় করলে সবার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে, আর কেউ না করলে সকলে গুনাহগার হবে) ?

---

১২. আল কুরআন, ০২:২১৩
১৩. আল কুরআন, ০৩:১১০

অধিকাংশ আলেমের মতে এটা ফরযে কিফায়াহ। অর্থাৎ আলিমদের দায়িত্ব হল তাঁরা এ ফরয আদায় করবেন। কারণ শারীয়াতের দৃষ্টিতে ভাল ও মন্দ নির্বাচনের সঠিক জ্ঞান তাঁদেরই আছে। তাঁরা যদি দীনের দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব পালন করেন, তাহলে উম্মাহর অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের পক্ষ থেকে এ ফরয আদায় হয়ে যাবে। যেমন, জিহাদও সাধারণ অবস্থায় 'ফরযে কিফায়াহ'। অর্থাৎ কোন একটি দল এ কাজ আদায় করলেই তা যথেষ্ট হবে। আবার অনেকের মতে উক্ত আদেশ ও নিষেধ করার কাজ নিজ নিজ জ্ঞান ও সাধ্যানুযায়ী প্রত্যেকের উপর ফরজ। আর এ কথাই সঠিক বলে মনে হয়।[১৪]

শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন ও ধরে রাখার জন্য করণীয়

আল্লাহ তা'আলা মুসলিম উম্মাহকে নিজে সরাসরি শ্রেষ্ঠ উম্মাহ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এটা কত বড় সম্মান এবং গৌরবের বিষয় ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এ শেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য করণীয় বিষয়গুলোও তিনি একই আয়াতে কারীমার মধ্যে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন, আর সেগুলো হল,

- মুসলিম উম্মাহকে মানুষের জন্য পাঠিয়েছেন, সুতরাং মানুষের কল্যাণ করা।
- সৎ কাজের আদেশ দান।
- অসৎকাজে কাজে বাধা প্রদান।
- আল্লাহর প্রতি যথাযথ ঈমান আনয়ণ।

মুসলিম উম্মাহ মধ্যমপন্থী জাতি

মুসলিম উম্মাহকে আল্লাহ তা'আলা মধ্যমপন্থী জাতি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। সকল কিছুতে মধ্যম পন্থা অবলম্বনই সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বোত্তম পন্থা, সে হিসেবে মুসলিম উম্মাহ মধ্যমপন্থী হওয়ার কারণে সকল জাতির উপর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে বেশি মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ তা'আলা কুর'আনুল কারীমে বলেছেন:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيم

"আর এভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মতরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানবের সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ হবেন। তুমি এ যাবৎ যে কেবলার অনুসরণ করছিলে তা এ জন্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যাতে আমি জানতে পারি, কে রাসূলের অনুসরণ করে আর কে পিছনে ফিরে যায়? আল্লাহ যাদের হেদায়াত করেছেন তারা ব্যতীত অন্যদের নিকট এটা নিশ্চিত কঠিন আর আল্লাহ এমন

---

১৪. আল্লামা হাফিয সালাহুদ্দীন ইউসুফ, সম্পাদনা, আব্দুল হামীদ ফাইযী আল মাদানী, *তাফসীরে আহসানুল বায়ান* (ঢাকা, তাওহীদ পাবলিকেশন্স, জুন-২০১৫), পৃ. ১২৩-১২৪

নন যে, তোমাদের ঈমান নষ্ট করবেন। নিশ্চই আল্লাহ মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল, পরম দয়ালু।”[১৫]

وَسَط শব্দের অর্থ সর্বোৎকৃষ্ট বিষয়।[১৬] হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, মুহাম্মাদ (স.) عدل শব্দ দ্বারা وَسَط এর ব্যাখ্যা করেছেন এর অর্থ সর্বোৎকৃষ্ট। আলোচ্য আয়াতে মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে যে, তাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মত করা হয়েছে। এর ফলে হাশরের ময়দানে তারা একটি স্বাতন্ত্র লাভ করবে। সকল পয়গম্বরের উম্মতেরা তাদের নবীগণের হিদায়াত ও প্রচারকার্য অস্বীকার করে বলতে থাকবে, 'দুনিয়াতে আমাদের কাছে কোন আসমানী গ্রন্থ পৌঁছেনি এবং কোন পয়গম্বরও আমাদের হেদায়াত করেননি।' তখন মুসলিম সম্প্রদায় পয়গম্বরগণের পক্ষে সাক্ষ্যদাতা হিসেবে উপস্থিত হবে এবং সাক্ষ্য দিবে যে, 'পয়গম্বরগণ সব যুগেই আল্লাহর পক্ষ থেকে আনীত হেদায়াত যথাযথভাবে তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, তাদেরকে সঠিক পথে আনয়ণের জন্য তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন।' বিবাদী উম্মতগণ মুসলিম সম্প্রদায়ের সাক্ষ্যে প্রশ্ন তুলে বলবে, 'আমাদের আমলে এ সম্প্রদায়ের কোন অস্তিত্বই ছিল না। আমাদের ব্যাপারাদি তাদের জানার কথা না। কাজেই আমাদের বিপক্ষে তাদের সাক্ষ্য কেমন করে গ্রহণ হতে পারে?' মুসলিম সম্প্রদায় এ প্রশ্নের উত্তরে বলবে, 'নিঃসন্দেহে তখন আমাদের অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু আমাদের নিকট তাদের অবস্থা ও ঘটনাবলী সংক্রান্ত তথ্যাবলী একজন সত্যবাদী রাসূল ও আল্লাহর কিতাব আল কুর'আন সরবরাহ করেছে। আমরাও সে কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাদের সরবরাহকৃত তথ্যাবলীকে চাক্ষুস দেখার চেয়েও অধিক সত্য মনে করি; তাই আমাদের সাক্ষ্য সত্য।' অতঃপর রাসূল (স.) উপস্থাপিত হবেন এবং সাক্ষীদের সমর্থন করে বলবেন, 'তারা যা কিছু বলছে সবই সত্য। আল্লাহর গ্রন্থ এবং আমার শিক্ষার মাধ্যমে তারা এসব জানতে পেরেছে।' হাশরের ময়দানে সংঘটিতব্য এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সহীহ বুখারী, সুনানে তিরমিযীসহ একাধিক হাদীস গ্রন্থে সংক্ষেপে ও সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মানের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, এ সম্প্রদায়কে মধ্যমপন্থী সম্প্রদায় করা হয়েছে।[১৭]

তাফসীরে আহসানুল বায়ানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, وَسَط শব্দের অর্থ হল, মধ্যম। কিন্তু তা শ্রেষ্ঠ বা সর্বোত্তম অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আর আলোচ্য আয়াতে একে এ অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদেরকে সর্বোত্তম কিবলা দেয়া হয়েছে, অনুরূপ তোমাদেরকে সর্বোত্তম উম্মতও করা হয়েছে এবং এর উদ্দেশ্য হল, তোমরা মানুষের জন্য

---

১৫. আল কুর'আন, ০২:১৪৩

১৬. মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ শাফী' (র.), অনু. ও সম্পাদনা, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (র.), *তাফসীর মা'আরিফুল ক্বোরআন* (সৌদি আরব, খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহাদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, প্রকাশকাল, ১৪১৩ হিজরী), পৃ. ৭৪

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

সাক্ষ্য দিবে।[১৮] যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন: لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس

"যাতে রাসূল (স.) তোমাদের জন্য সাক্ষ্যদাতা এবং তোমরা সাক্ষ্যদাতা হতে পার মানবমণ্ডলীর জন্য।"[১৯] কোন কোন হাদীসে এর বিশ্লেষণ এসেছে এভাবে যে, যখন মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন নবীগণকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'তোমরা কি আমার আদেশ মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছিলে?' তাঁরা বলবেন 'হ্যাঁ'। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, 'তোমাদের কি কোন সাক্ষী আছে?' তাঁরা বলবেন, 'হ্যাঁ, মুহাম্মাদ (স.) এবং তাঁর উম্মতগণ।' তখন এ উম্মত সাক্ষ্য দিবে। আর এ জন্য وَسَط এর অনুবাদ ন্যায়পন্থীও করা হয়। এ শব্দের আরো একটি অর্থ মধ্যপন্থীও করা হয়। অর্থাৎ উম্মাতে মুহাম্মাদী হল মধ্যপন্থী। অতিরঞ্জন ও অবজ্ঞা থেকে তারা পবিত্র। আর এটাই হল ইসলামের শিক্ষা। এতে অতিরঞ্জন (কোন কিছুকে নিয়ে বাড়াবাড়ি) এবং অবজ্ঞা (কোন জিনিসকে তার উপযুক্ত মর্যাদা থেকে একেবারে নিচে নামানোরও কোন অবকাশ) নেই।[২০]

---

১৮. *তাফসীর আহসানুল বায়ান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

১৯. আল কুর'আন, ২২:৭৮

২০. *তাফসীর আহসানুল বায়ান*, প্রাগুক্ত

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঐক্য ও ঐক্যের ভিত্তি

ঐক্য

ঐক্য শব্দটি একতার চেতনা থেকে উদ্ভূত। এক সাথে থাকা এক বিশ্বাস বা চেতনা লালন, করা, এক লক্ষ্যে ধাবিত হওয়া প্রভৃতি একতার ধারণা। এটি একটি অবস্থার নির্দেশক। সে অবস্থা হল, এক বিশ্বাস ও এক নিয়মের অধীনে পরিচালিত হওয়া। একতা, অভিন্নতা, সাম্য, মিল, সদৃশ, সংহতি, সহাবস্থান প্রভৃতি ঐক্য শব্দের ভাব বহন করে। পক্ষান্তরে বিভেদ, বিচ্ছিন্নতা, সম্পর্কহীনতা, বিরোধীতা, দ্বন্দ, ভাঙ্গন, প্রভৃতি ঐক্যের বিপরীতার্থক।[২১]
ইংরেজীতে, Unity, Oneness, Community, Union, Federation, Association, United, Alliance, Consonance.

ঐক্য বুঝাতে আরবীতে اِتِّحَادٌ- وَحْدَةٌ- إِجْمَاعٌ- اِتِّفَاقٌ- ইত্যাদী শব্দ বহুল প্রচলিত।[২২] তবে এ অর্থে কুর'আন ও হাদীসে جَمِيْعٌ বা جَمَاعَةٌ ইত্যাদী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবীতে আভিধানিকভাবে جَمَاعَةٌ শব্দের অর্থ অনেক মানুষের দল। যারা একটি উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়েছেন।[২৩] কুর'আন ও সুন্নাহর ব্যবহারে মুসলিমগণের একত্রিত বা ঐক্যের অবস্থাকে জামায়াত বলা হয়েছে। বর্তমানে 'জামায়াত' শব্দটি ঐক্যের চেয়ে অনৈক্যের অর্থেই বেশি ব্যবহার করা হয়। কুর'আনুল কারীমে 'জাম'আ' শব্দটি ফিরকা, দল বা গ্রুপের বিপরীতে একত্রিত বা ঐক্যবদ্ধ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[২৪]
ঐক্য আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টি জগতের সুন্নাহ। গ্রহ, নক্ষত্র, সৌরজগৎ, পৃথিবীর জল ও স্থলের প্রাণীকূল সর্বত্রই একই নিয়ম। সেখানে কোন ব্যত্যয় নেই। মানুষের দৈহিক গঠনের দিকে তাকালেও বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। দেহের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সামঞ্জস্য, সমন্বয় ও সংহতির মাধ্যমে এক ও অভিন্ন লক্ষ্যে সক্রিয়।
আমাদের সমাজে একথা সর্বজনবিদিত যে, 'একতাই বল', 'দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ', 'দশের লাঠি, একের বোঝা' এসব ঐতিহাসিক প্রবাদবাক্যগুলো থেকে স্পষ্টভাবেই বুঝা যায় যে, ঐক্যই লক্ষ্য অর্জনের শক্তি। আস্থা এবং সাফল্য অর্জনের অন্যতম প্রেরণা।[২৫]

---

২১. *ইসলামে ঐক্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৭
২২. ড. ইবরাহীম মাদকুর, *আল মু'জামুল ওয়াসীত* (ইন্ডিয়া, জাকারিয়া বুক ডিপো, সাহারানপুর, দেওবন্দ, প্রকাশকাল, আগষ্ট-২০০১), পৃ. ১৩৪
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫
২৪. *ইসলামে ঐক্য*, প্রাগুক্ত
২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ০৯

ঐক্যের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রায়োগিক ধারণা নিম্নরূপঃ

- ✓ সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যগত ঐক্য, যেমন- মানবজাতি
- ✓ বিশ্বাস ও চেতনার ঐক্য, যেমন- মুসলিম জাতি
- ✓ জাতীয়তার পরিচয়গত ঐক্য, যেমন- ভাষা, বর্ণ, সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীগত পরিচয়
- ✓ আদর্শের ঐক্য, যেমন- নবী (স.)-এর আদর্শ অনুসরণ
- ✓ জীবন ব্যবস্থার ঐক্য, যেমন- ইসলাম অনুশীলন
- ✓ লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইস্যু বা কর্মসূচীভিত্তিক ঐক্য, যেমন- রাজনৈতিক কর্মসূচী বাস্তবায়ন, নির্বাচনী ঐক্য
- ✓ শত্রুর মোকাবেলায় ঐক্য, যেমন- যুদ্ধ, সন্ধি
- ✓ বিশেষ শ্রেণির ঐক্য, যেমন- শ্রমিক ঐক্য, শেতাঙ্গ ঐক্য, কৃষ্ণাঙ্গ ঐক্য
- ✓ চিন্তার ঐক্য, যেমন- সমমনা ও সমচিন্তার ঐক্য
- ✓ দলীয় ঐক্য, যেমন- বিভিন্ন দল বা গোষ্ঠীর ঐক্য
- ✓ আঞ্চলিক ঐক্য, যেমন- সার্ক, আরবলীগ, ইইউ
- ✓ আন্তর্জাতিক ঐক্য, যেমন- জাতিসংঘ, ওআইসি, কমনওয়েলথ

মানুষের স্রষ্টা ও রব আল্লাহ। তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরিত সর্বশেষ নবী এবং রাসূল হলেন মুহাম্মাদ (স.)। তাঁকে এবং তাঁর রাসূলকে যারা বিশ্বাস ও মান্য করেন তারাই কেবল মাত্র মুসলিম। এখানে মুসলিম ঐক্য নিয়েই আমাদের আলোচনা ও গবেষণা।
আর ঐক্যের বিভিন্ন ধরন থাকে যেমন, পারিবারিক ঐক্য, সামাজিক ঐক্য, জাতীয় ঐক্য, আন্তর্জাতিক ঐক্য, ইত্যাদি। উপরোক্ত ঐক্য দ্বারা সমগ্র পৃথিবীর মুসলিম জাতির ঐক্যই উদ্দেশ্য।

ঐক্যের প্রকার

ঐক্যের কয়েকটি প্রকার উল্লেখ করা যায়,
এক. ঈমানের প্রাসঙ্গিক বিষয়ে ঐক্য (আকীদাগত)
ঈমানের ছয়টি মৌলিক বিষয়[২৬] তথা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, পরকালের প্রতি বিশ্বাস, ফিরিশতাগণের প্রতি বিশ্বাস, কিতাবের প্রতি বিশ্বাস, নবীগণের প্রতি বিশ্বাস, তাকদীরের ভাল মন্দের প্রতি বিশ্বাস। এ বিষয়ে সারা পৃথিবীর কোন মুসলিমের মাঝে কোন দ্বিধা-বিভক্তি নেই।

দুই. ফিকহী বিষয়ে ঐক্য (ইজতিহাদ)

২৬. ড. খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (র), *কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদাহ* (আস-সুন্নাহ পাবিলকেশন্স, পৌর বাস টার্মিনাল, ঝিনাইদহ-৭৩০০, ডিসেম্বর ২০১৭), পৃ. ৮১

কুর'আন ও সুন্নাহতে কোন বিষয়ের সরাসরি দিক নির্দেশনা না পেয়ে মুজতাহিদগণ নুসূসকে সামনে রেখে যে ফিকহী মতামত দিয়েছেন সে বিষয়ে ঐক্য। এ বিষয়ের দলীল,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ كَيْفَ تَقْضِي إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا آلُو قَالَ فَضَرَبَ صَدْرِي فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يُرْضِي رَسُولَهُ

"হযরত মু'আয ইবন জাবাল (রা.) কে যখন নবী (স.) কাজী নিয়োগ করে ইয়ামানে প্রেরণ করছিলেন তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'হে মু'আয, তুমি লোকদের মাঝে কী দিয়ে ফায়সালা ও মিমাংসা করবে?' মু'আয (রা.) বলেছিলেন, 'মহান আল্লাহর কিতাব কুর'আন দ্বারা।' নবী (স.) আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'যদি কোন বিষয়ে কুর'আনে না পাও তবে কী দিয়ে ফায়সালা করবে?' মু'আয (রা.) বললেন, 'আল্লাহর প্রেরিত রাসূলের সুন্নাহ দ্বারা ফায়সালা করব।' নবী (স.) আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'যদি এর মাঝেও সমাধান না পাও?' তখন হযরত মু'আয (রা.) বললেন, 'আমি আমার বিবেক দ্বারা এগুলোর মাঝে ইজতেহাদ করে ফায়সালা করব।' তখন নবী (স.) বললেন 'সে আল্লাহর প্রশংসা করছি যিনি তাঁর রাসূলকে এমন প্রতিনিধি দান করেছেন, যে তাঁর রসূলকে সন্তুষ্ট করেছে'।"[২৭]

তিন. ইখতেলাফ মা'আল ইত্তেহাদ

অর্থাৎ একতা ঠিক রেখে মতভেদ করা। এর কতিপয় দৃষ্টান্ত,

(১) রাসূল (স) বহু কাজে সাহাবায়ে কিরামের বিপরীতধর্মী মত শুনেছেন। যেমন, বদরের যুদ্ধ, বিভিন্ন অভিযান এবং বদরের যুদ্ধবন্দীদের ঘটনায় তিনি সাহাবায়ে কেরামগণের কথা মনোযোগের সাথে শ্রবণ করেছেন। তাঁরাও নবীজির কথাকে হৃদয় দিয়ে শুনেছেন। আবার সিদ্ধান্তকৃত বিষয় নিজেদের মতের বিপরীত বা কখনো কঠিন এবং কষ্টের মনে হলেও মনে প্রাণে তা মেনে নিয়েছেন এবং বাস্তবায়নে ঐক্যবদ্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

(২) নবীজির ইন্তেকালের পর খিলাফত প্রশ্নেও তাঁরা অবশেষে একমত হয়ে হযরত আবু বকর আস সিদ্দীক (রা.) কে খলীফা নির্বাচিত করলেন।

(৩) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণাও এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত। এ ঘোষণা ও পদক্ষেপের বিষয়ে খোদ হযরত ওমর (রা.) খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবুবকর আস-সিদ্দীক (রা.) এর সাথে দ্বি-মত পোষণ করেও পরবর্তীতে হযরত আবু বকর (রা.) এর সিদ্ধান্তই সঠিক ছিল তা ঘোষণা দিয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন।

২৭. *মুসনাদু আহমাদ*, মাকতাবায়ে শামিলাহ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২১০৮৪

চার. কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যাগত ঐক্য
কুর'আন ও হাদীসে বর্ণিত মৌলিক সকল বিষয়েই মুসলিম সমাজে ঐক্য বিরাজমান। যেমন, আল্লাহর একত্ব, কিবলা, সালাত, সাওম, যাকাত, হজ্জ, ঈদ, কুরবানী ইত্যাদী।

পাঁচ. রাজনৈতিক চিন্তা ও দর্শনের ঐক্য
গোটা পৃথিবীতে ইসলামী রাজনীতি যারা করেন তাদের সকলের মৌলিক চিন্তার জায়গা এক 'তারা আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করতে চান।'

অনৈক্য

অনৈক্যের প্রকার; অনৈক্যের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকার নিচে উল্লেখ করা হল,

এক. ঈমানের প্রাসঙ্গিক বিষয়ে অনৈক্য (আকীদাগত)

মুসলিম উম্মাহর প্রাচীনকালের বিভক্তির কারণ ছিল বিশ্বাস বা আকীদাগত মতভেদ। এ কারণে দেখা যায় সে সময় আকীদার ভিত্তিতেই শিয়া, রাফেযী, খারিজী, মুতাযিলী, জাহমী, কাদরী, জাবারী ইত্যাদি ফিরকার জন্ম হয়েছিল। তাদের বিপরীতে সাহাবীগণের অনুসারী মূল ধারার মুসলিমগণ নিজেদেরকে 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহ' অর্থাৎ সুন্নাত ও ঐক্যের অনুসারী বলে গণ্য করতেন। পরবর্তী যুগে 'আহলুস সুন্নাহ' এর অনুসারিদের মধ্যেও বিশ্বাস বা আকীদার ছোট বা বড় বিষয়গুলো নিয়ে বহু প্রকারের অনৈক ও বিভক্তির জন্ম নিয়েছে। আর এটা স্পষ্ট কথা যে, ঐক্য ও বিভক্তি মূলতই বিশ্বাস বা মনের কর্ম। এ জন্য বিশ্বাস বা আকীদার মতভেদ থেকে বিভক্তি ও শত্রুতার জন্ম নেয়াটাই স্বাভাবিক।[২৮]

দুই. ফিকহী বিষয়ে অনৈক্য

আকীদাগত মতভেদ নিয়ে বিভক্তির চেয়েও অনেক বড় ও প্রকট হয়ে পড়েছে বর্তমান যুগে ফিকহী মতভেদ কেন্দ্রিক বিভক্তি। ইসলামের প্রথম যুগগুলোতে আকীদার মতভেদ নিন্দনীয় ও বিভক্তি বলে গণ্য করা হত, তবে ফিকহী মতভেদ সহনীয় বলে গণ্য ছিল। ক্রুসেড যুদ্ধোত্তর যুগগুলোতে মাযহাবী মতভেদ এক প্রকারের বিভক্তির রূপ গ্রহণ করে। বর্তমানে মাযহাবের নামে ফিকহী মতভেদগুলো পূর্বের যুগের চেয়েও অনেক প্রকটভাবে বিভক্তির অন্যতম কারণ হিসেবে পরিণত হয়েছে।[২৯]

---

২৮. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (র), *কুরআন- সুন্নাহর আলোকে জামায়াত ও ঐক্য* (আস-সুন্নাহ পাবিলকেশন্স, পৌর বাস টার্মিনাল, ঝিনাইদহ-৭৩০০, অক্টোবর ২০১৭), পৃ. ০৯
২৯. *প্রাগুক্ত*

আর উপরোক্ত দু'টো মতভেদের অন্যতম কারণ সাহাবায়ে কিরামের কর্মধারা পরিত্যাগ করা। হাদীস ও ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, সাহাবীগণের যুগ থেকেই উপরোক্ত দু'প্রকারের মতভেদ ছিল। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই তাঁরা যে কোন মূল্যে জামা'আত বা ঐক্য এবং ভ্রাতৃত্বের দিকে লক্ষ্য রেখেছেন। সাহাবী ও তাবিয়ীগণ বিশ্বাস বা আকীদা বিষয়ক মতভেদকে নিন্দনীয় ও বর্জনীয় বলে গণ্য করেছেন। কারণ বিশ্বাস বা আকীদা অপরিবর্তনীয় ও স্থির।[৩০] এরপরও তাঁরা বিশ্বাস বা আকীদা বিষয়ক মতভেদ বা বিভ্রান্তিতে লিপ্তদের প্রতি জামা'আত, ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যবোধের চেতনা লালন করতেন। খারিজীগণ সাহাবায়ে কিরামকে অত্যন্ত খোড়া ও ভিত্তিহীন দলীল দিয়ে কাফির ফতোয়া দিত এবং তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ও তাদেরকে হত্যা করা বৈধ মনে করত। এরপরেও সাহাবায়ে কিরাম যুদ্ধ ময়দান ছাড়া তাদেরকে কাফির বলা থেকে বিরত থেকেছেন। তাদের ঈমান, আমল ও আবেগের মূল্যায়ন করেছেন। যুদ্ধের ময়দানের বাইরে তাদের পিছনে সালাত আদায়সহ তাদের সাথে ধর্মীয় ও সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা করেছেন।[৩১]

খারিজীদের বিষয়ে হযরত আলী (রা.) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'এরা কি কাফির? তিনি বললেন, এরা তো কুফরি থেকে বাঁচার জন্যই পালিয়ে বেড়াচ্ছে।' বলা হল, 'তবে কি তারা মুনাফিক?' তিনি বললেন, 'মুনাফিকরা খুব কমই আল্লাহর যিকির করে। আর এরা তো রাত দিন আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত।' বলা হল, 'তবে এরা কী?' তিনি বলেন, 'তবে এরা বিভ্রান্তি ও নিজ মত পূজার ফিতনার মধ্যে নিপতিত হয়ে অন্ধ ও বধির হয়ে গেছে।'[৩২]

তিন. ইখতেলাফ মা'আল ইফতেরাক

ইখতেলাফ মা'আল ইফতেরাক তথা বিভক্তিসহ মতপার্থক্য যা ইসালাম হারাম করে দিয়েছে। বিশেষ করে জামা'আত বা ঐক্যের বিপরীতে কুর'আন ও হাদীসে তাফাররুক ও ইফতেরাককে নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয় বলা হয়েছে। ইফতেরাক, তাফাররুক, ফারক ইত্যাদি শব্দের মূল অর্থ পার্থক্য, পৃথক, বিভক্ত, বিভক্তি, বিচ্ছিন্ন হওয়া বা বিচ্ছিন্ন করা। আর বিভক্তি বা দলাদলি মূলত পারস্পরিক শত্রুতার একটি অবস্থা।[৩৩] আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"আর তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছিল ও মতভেদ করেছিল। তাদের জন্যই রয়েছে মহাশাস্তি।"[৩৪]

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

---

৩০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ০৯-১০

৩১. *জামায়াত ও ঐক্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০, , উদ্ধৃত; ইবনু তাইমিয়া, *মাজমূউল ফাতাওয়া*, ৭/২১৭-২১৮; ড. নাসির আল আকল, আল খাওয়ারিজ, পৃ. ৪৭-৪৮

৩২. প্রাগুক্ত, উদ্ধৃত; ইবনুল আসীর, *আন- নিহাইয়াহ ফী গারিবিল হাদীস*, ২/১৪৯

৩৩. জামায়াত ও ঐক্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৫

৩৪. আল কুর'আন: ০৩:১০৫

“এবং অন্তর্ভুক্ত হয়ো না মুশরিকদের, যারা নিজেদের দীনকে বিভক্ত করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উৎফুল্ল।”[৩৫]

ইখতেলাফ ও ইফতেরাক এর মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা

(১) ইখতিলাফ বৈধ কিন্তু ইফতিরাক হারাম। সাহাবায়ে কেরাম ও ইমামগণ কোন কোন বিষয়ে ইজতিহাদের মাধ্যমে ইখতিলাফ করেছেন এবং তাদের এ ইখতিলাফ কুর'আনও হাদিস সমর্থন করে এমনকি উৎসাহিত করে। তাদের মধ্যে কোন দলাদলি ছিল না। কিন্তু ইফতেরাক বা দলাদলি না করার জন্য কুর'আন ও হাদিসে বারবার কড়া নিষেধ করা হয়।

(২) ইখতিলাফ বা মতভেদ দলিলের মাধ্যমে হয়ে থাকে। যেমন সাহাবায়ে কেরাম ও ইমামগণ মতভেদ করেছেন। কিন্তু ইফতেরাক বা দলাদলি সব সময় নিজস্ব পছন্দ ও অপছন্দ থেকে হয়। যেটাকে ইত্তিবায়ে হাওয়া বা যার যার নাফসের গোলামি বলা যায়। অহির যে অংশ কারো মতের পক্ষে যাবে তা গ্রহণ করবে আর যে অংশ তার মতের বিপক্ষে যাবে তা বাদ দিবে বা তার বিভিন্ন অপব্যাখ্যা করবে। যা ভয়াবহ কবিরা গুণাহ।

(৩) ইখতিলাফ আবেগে কিংবা কারো প্রতি ভক্তির কারণে হয় না কিন্তু ইফতেরাক বা দলাদলি কোন নেতা, সংগঠক, আকাবির এবং বুজুর্গের প্রতি অতিভক্তি বা অতি আবেগে হয়ে থাকে।

(৪) যারা ইখতিলাফ করেন তারা কুর'আন ও হাদিস জেনে বুঝে গবেষণা করে ইখতিলাফ করেন। কিন্তু যারা দলাদলি করেন তারা কুর'আন ও হাদিসের কিছু অংশ বুঝে বা বিলকুল না বুঝে বা অহির ইলম ভুলে গিয়ে বা গোপন করে দলাদলি করেন। তারা আবার সাধারণ মানুষকে আল্লাহ তা'আলার কিতাব পড়তেও দেন না বা নিরুৎসাহিত করেন।

(৫) ইখতিলাফে হিংসার কোন সুযোগ নাই বরং কুর'আন ও হাদিসের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণের ভিত্তিতে ইখতিলাফ বা মতভেদকে নিরসন করা হয়, যা অপরের মতের প্রতি ভালবাসা ও সহনশীলতা বাড়িয়ে দেয় এবং বিভক্তি কমিয়ে দেয়। অপরদিকে ইফতেরাক বা দলাদলিতে হিংসা, জিদ, উগ্রতা এবং বিভক্তি সৃষ্টি করে।[৩৬]

(৬) ইখতিলাফ নবী (স.) ও সাহাবায়ে কিরামের সুন্নাহ অনুসরণের মাধ্যমে হয় কিন্তু ইফতেরাক বা দলাদলি সুন্নাহ অনুসরণে হয় না। খারিজীগণ হাদিস অমান্য করত না বরং

---

৩৫. আল কুর'আন: ৩০:৩০-৩২
৩৬. *জামায়াত ও ঐক্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৭

তারা সুন্নাহর দুশমন ছিল, যার কারণে ইসলামের ইতিহাসে তারাই প্রথম দলাদলি সৃষ্টিকারী ছিল।

(৭) ইখতিলাফ কোন বিদ'আত সৃষ্টি করেনি কিন্তু ইফতেরাক বিদ'আত সৃষ্টি করেছে। শুধু তাই নয় বরং এটি নিজেই বিদ'আত। দলাদলিতে লিপ্ত লোকগুলো সারাজীবন প্রতিপক্ষের প্রতিটি কর্মে বিদ'আত ছাড়া আর কিছু আছে বলে বিশ্বাস করে না।

(৮) ইলম, ইখলাস, ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালবাসার সাথে ইখতেলাফ থাকতে পারে। কিন্তু এগুলোর সাথে 'ইফতেরাক' থাকতে পারে না। কেবলমাত্র এগুলোর অনুপস্থিতিতেই ইফতেরাক জন্ম নেয়।[৩৭]

(৯) ইখতেলাফকারী আলিম নিন্দিত নন বরং তিনি ইখলাস ও ইজতিহাদের ভিত্তিতে প্রশংসিত ও পুরস্কার প্রাপ্ত। মুজতাহিদ ভুল করলে একটি পুরস্কার ও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছলে দু'টি পুরস্কার লাভ করেন।[৩৮]

(১০) ইখতেলাফ অনেক ক্ষেত্রেই রহমত, পক্ষান্তরে ইফতেরাক সকল ক্ষেত্রেই আযাব ও ধ্বংস।[৩৯]

চার. দাওয়াতি পদ্ধতির অনৈক্য

সমকালিন বিভক্তির অন্যতম একটি কারণ পদ্ধতিগত ভিন্নতা। বিশেষত ইসলাম প্রচার ও প্রসারে সমকালিন মুসলিমগণ রাজনীতি, লেখনী, ময়দানি দাওয়াত, শিক্ষাবিস্তার, বিভিন্ন পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ইত্যাদি পদ্ধতির অনুসরণ করছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রত্যেক পদ্ধতির অনুসারী নিজের পদ্ধতিকেই দীন প্রচার বা প্রতিষ্ঠার একমাত্র নির্ভুল পদ্ধতি বলে বিশ্বাস করছেন এবং অন্যান্য পদ্ধতির অনুসারিদের প্রতি এ ভ্রাতৃত্ব অনুভব করছেন না। উপরন্তু অবজ্ঞা বা বিদ্বেষভাব অনুভব, লালন ও প্রচার করছেন।[৪০]

পাঁচ. রাজনৈতিক চিন্তা ও দর্শনের অনৈক্য

একগ্রুপ রয়েছে যারা ইসলামী রাজনীতি করেন, তারা আবার বিভিন্ন দলে বিভক্ত। কিছু গ্রুপ রয়েছে তারা শুধু মাত্র দুনিয়ার ক্ষমতা লাভের জন্য রাজনীতি করেন। এদের যে, কী পরিমাণ দল রয়েছে সঠিকভাবে গণনা করা কঠিন। বাংলাদেশসহ বিশ্বময় এর প্রচুর উদাহরণ রয়েছে।

---

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ০৭
৩৮. *প্রাগুক্ত*
৩৯. *কুরআন সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৩
৪০. *জামায়াত ও ঐক্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

ঐক্যের ভিত্তি

ইসলামের মৌলিক প্রতিটি বিধি বিধানই ঐক্যের উৎস ও মূল ভিত্তি। ঐক্যের প্রথম ভিত্তি হল তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস। ঈমান ও ইসলামের স্বার্থেই প্রত্যেক মুসলিম একতাবদ্ধ থাকেন। তাওহীদ ত্যাগ করে এবং দ্বীনের মূলনীতি বিসর্জন দিয়ে মুসলিমদের মাঝে কোনরূপ ঐক্য হয় না এবং হলেও তা গ্রহণযোগ্য নয়।[৪১] একজন মানুষ যখন 'কালিমা তাওহীদ' মুখে উচ্চারণ করেন তখন তিনি স্বাভাবিকভাবেই বৃহত্তর মুসলিম জামায়াতে শামিল হয়ে যান। যে জামায়াতের প্রতিটি সদস্য এক আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখেন। একমাত্র তাঁকেই ভয় করেন। তিনি ছাড়া কাউকেই তারা পরোয়া করেন না। তাঁর জন্য তারা পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসেন। আবার তাঁর সন্তোষ লাভের জন্যই তারা প্রয়োজনে অস্ত্র হাতে তুলে নেন ও যুদ্ধ করেন। তাঁকে ভালবাসার প্রমাণ স্বরূপ কাউকে কিছু দান করেন। আবার কাউকে দান করা থেকে বিরত থাকেন। এজন্যই রাসূলে আকরাম (স.) সুস্পষ্টভাবে বলেছেন:

مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ

"যে আল্লাহর জন্য কাউকে ভালবাসল, আল্লাহর জন্যই কাউকে ঘৃণা করল, আল্লাহর জন্যই কাউকে দান করল আবার আল্লাহর জন্যই কাউকে নিষেধ করল, সেই তার ঈমানকে পূর্ণ করল।"[৪২]

গোটা মুসলিম দুনিয়াই আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী। বিশ্বের সকল মুসলিম জানেন যে, আল্লাহ এক, তাঁর কোন শরীক নেই। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা একটি সূরাই নাযিল করেছেন:-

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

"বলুন তিনি আল্লাহ এক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি, তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি। আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।"[৪৩] শেষ নবী এবং রাসূল হলেন, হযরত মুহাম্মাদ (স.)। ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য এ বোধ বিশ্বাসই মুসলিম দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার।

গোটা পৃথিবীর সকল মুসলিম ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য সহায়ক আরো প্রেরণা ও শক্তিসমূহ; আমাদের সবার এক কিবলা 'মাসজিদে হারাম'। আমরা সবাই একই আসমানী কিতাব আল কুর'আনের অনুসারী, সালাত, সাওম, হজ্জ ও যাকাত সবই এক এবং ঐক্যের

৪১. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক, *উম্মাহর ঐক্য পথ ও পন্থা* (প্রকাশনা বিভাগ, মারকাযুত দাওয়াহ আল ইসলামিয়্যাহ, ঢাকা, প্রকাশকাল, নভেম্বর-২০১৫), পৃ. ২০

৪২. *সূনানু আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৪০৬১

৪৩. আল কুরআন, ১১২:০১-০৪

বার্তাবাহি। মসজিদে নববী একটিই। বদরের প্রান্তর, ওহুদ পাহাড়, হুদায়বিয়ার সন্ধি, বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণ ইত্যাদি সবই আমাদের এক হতে প্রেরণা দেয়।

কবি আব্দুস সালামের ভাষায়

'আমাদের প্রভু এক, এক নবীর উম্মত
জীবন বিধান এক, ঐশী বানী কুর'আন
তবে কেন এক নও হে মুসলমান?
এক হও, এক হও, করি আহবান॥

বাইতুল্লাহ এক, মদীনা শরীফ এক
ওহুদ পাহাড় এক, বদরের মাঠ এক
একটাতো জীবন আর মরনোতো একবার
সকলের তরে আছে, একই স্থান ॥

হাশরের মাঠ এক, মীযানের মাপ এক
লাওহে মাহফুজ এক, পুলসিরাতও এক
একটাতো চাঁদ আর একটাই সূর্য
ধরাতে নিয়ম মেনে, আলো করে দান॥'

মুসলিম ঐক্য সম্ভব!

অনেকে হতাশা ব্যক্ত করেন যে, 'কিয়ামতের আগে আর মুসলিমদের এক হবার সম্ভাবনা নাই।' 'একতাবদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়।' ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু একথা আদৌ সত্য এবং বাস্তবসম্মত নয় বরং স্পষ্টতঃ বলা যায়, 'মুসলিমদের একতাবদ্ধ হওয়া অবশ্যই সম্ভব।' হাজারো বিপর্যয় ও বিভেদের মধ্যেও এক নবী, এক কিতাব, এক বিশ্বাস এখনো উম্মাহর ঐক্য ও সংহতির ভিত্তি উপাদান হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে। সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্জ, ঈদ, কুরবানী প্রভৃতি মৌলিক ইবাদাতের ফরয, ওয়াজিব প্রভৃতি বিশাল অংশে এখনো স্পষ্ট সাদৃশ্য, সংহতি ও সহাবস্থান বিদ্যমান। ভিত্তি যেহেতু ঠিক ও মজবুত রয়েছে সুতরাং ভিত্তিমূল ধরে ঐক্যের পথে পাড়ি জমানো একটু কঠিন মনে হলেও অসাধ্য নয়। বরং অস্তিত্বের প্রয়োজনে, ঈমানের দাবী পূরণে, আদর্শিক স্বার্থে এবং বিজয়ের মানসে মুসলিম সমাজের জন্য ঐক্যের বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদান করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।[৪৪] আর এর জন্য উপরোক্ত প্রেরণাদায়ক বিষয়গুলোই যথেষ্ঠ বলে মনে হয়।

৪৪. *ইসলামে ঐক্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

আহলে কিতাবদের সাথে ঐক্য

শুধু মুসলিম ঐক্য নয় কুর'আন ও সুন্নাহর নীতিমালা মেনে আহলে কিতাবদের সাথেও ঐক্যবদ্ধ হওয়া সম্ভব। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে ইরশাদ করেছেন,

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

"আপনি বলুন! হে আহলে কিতাব! 'একটি বিষয়ের দিকে আস, যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান। (তা এই যে,) আমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা করবো না। কোন কিছুকেই তাঁর সাথে শরীক করবো না এবং আমাদের কিছু লোক আল্লাহকে ছেড়ে অপর কিছু লোককে প্রভুরূপে গ্রহণ করবে না।' অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে বলুন 'তোমরা সাক্ষী থাক! আমরা মুসলিম।"[৪৫]

মুসলিম উম্মাহর ঐক্য অর্থ?

মুসলিম উম্মাহর ঐক্য মানে কয়েক শ্রেণির ঐক্য:-

১. মুসলিম রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ঐক্য
২. মুসলিম সামরিক ঐক্য
৩. মুসলিম সরকারগুলোর ঐক্য
৪. মুসলিম দেশগুলোর ঐক্য
৫. আলিমদের ঐক্য
৬. 'আম (সাধারণ মুসলিম) জনতার ঐক্য

তবে সবগুলোর পাশাপাশি আলিমদের ঐক্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ 'আম জনতা সাধারাণত আলিমদের দিকেই তাকিয়ে থাকে। তাদের ঐক্যই 'আম জনতার ঐক্য। তাদের ঐক্যই উম্মাহর ঐক্যকে তরান্বিত ও নিশ্চিত করতে পারে।

সাধারণ জনতার ঐক্য ও একটি অদ্ভুত আশা

এক্ষেত্রে ১ ও ৫ নং পয়েন্ট নিয়ে হতাশার বিষয় হলো উক্ত গ্রুপ দু'টোর বিরাট একটা অংশ ঐক্যের বিষয়ে তৎপর হয় না এ অদ্ভুত আশায় যে, 'বর্তমান মুসলিমদের পরাজয় এবং দেশে দেশে মুসলিমদের উপর নির্যাতন কিয়ামতের নিদর্শন এবং অতি শীঘ্রই যালেম ইয়াহুদী, মুশরিক ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে মাযলুম মুসলিমদের সহায়তা ও নেতৃত্ব দেয়ার জন্য হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর আবির্ভাব ঘটবে!'

৪৫. আল কুরআন: ০৩:৬৪

তবে এ বিষয়ে এ শ্রেণিসহ সকলের জেনে রাখা উচিৎ যে, অবশ্যই কোন একদিন ইমাম মাহদী (আ) এর আবির্ভাব ঘটবে! একদিন অবশ্যই কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে। এ সব কিছুই এমন বিষয় যা অবশ্যই সংঘটিত হবে, অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। কিন্তু নির্দিষ্ট করে কেউ কি বলতে পারে কখন এসব ঘটবে? একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেউ তা জানে না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا

"লোকেরা তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে বলে দাও, 'এর জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছেই আছে।' তোমার কী জানা থাকবে? হয়তোবা কিয়ামত নিকটেই এসে পড়েছে।"[৪৬]

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَاكَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا

"এরা তোমাকে জিজ্ঞেস করে কিয়ামত সম্পর্কে- 'কখন তা ঘটবে?' এ ব্যাপারে তোমার কী বলার আছে? এর চূড়ান্ত জ্ঞান রয়েছে তোমার প্রতিপালকের নিকটেই। যে একে ভয় করে তুমি কেবল তারই সতর্ককারী। যেদিন তারা তা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন তাদের মনে হবে, যেন তারা পৃথিবীতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক প্রভাতকাল অবস্থান করেছে।"[৪৭]

পরাজয় ও বিপর্যয়ের মুহূর্তে এসব অবান্তর ও ভিত্তিহীন কথা ছড়ানোর কারণ কী? এর কারণ একটাই– তা হলো মানুষ যখন পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়ে তখন শত্রুদের বিরুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে থাকে। মুসলিম উম্মাহর উক্ত শ্রেণি আজকে ভাবছে যে, আজকের পৃথিবীতে যালিম পরাশক্তি ও অত্যাচারি শাসকগুলোর বিরুদ্ধে মুসলিমদের লড়াই করার ক্ষমতা নাই। তাই তারা আরেক পরিত্রাণের পথ অবলম্বন করছে। তারা ইমাম মাহদী (আ.) এর আবির্ভাবের প্রত্যাশায় দিন কাটায়।[৪৮] তাদের একান্ত কামনা তাঁর আগমনকালে এরাও তাঁর সঙ্গে মিলে লড়াই করবে। যেন এর পূর্বে লড়াই করার ক্ষমতা তাদের নেই। আর এরা অলৌকিক কিছু প্রত্যক্ষের জন্যই অপেক্ষা করছে। আর নিজেরা অকর্মণ্য হয়ে বসে আছে।[৪৯]

অথচ অলসতা, অধঃপতন, হতাশা-নিরাশা এর কোনটিই মু'মিনদের গুণাবলী নয়। মু'মিনদের গুণাবলী হবার কথাও নয়! আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না, নিশ্চই জেনো! আল্লাহর রহমত থেকে কেবল তারাই নিরাশ হয় যারা কাফির।"[৫০]

---

৪৬. আল কুর'আন, ৩৩:৬৩
৪৭. আল কুর'আন, ৭৯:৪২-৪৬
৪৮. *তাতারিদের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪
৪৯. *প্রাগুক্ত*
৫০. আল কুর'আন, সূরা ইউসুফ ১২:৮৭

কেউ যদি বর্তমানে এ সংবাদ প্রদান করে যে, 'ইমাম মাহদি (আ.) আগমন করেছেন' তাহলে যে কোন মুসলিমই কি তাঁর দলভুক্ত হতে পারবে? –না। কারণ তাঁর দলবলও মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক নির্বাচিত। এ নির্বাচন ও বাছাই কোন এলোপাতাড়ি নির্বাচন ও বাছাই নয় এ নির্বাচন ও বাছাই হবে ব্যক্তির ঈমান ও আমল অনুযায়ী। সুতরাং সাধ্যের মধ্যে মুসলিম ঐক্য ও মুসলিমদের বিজয়ের জন্য যার যার জায়গা থেকে কাজ করার কোন বিকল্প নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"আর তোমরা নিরাশ হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না, তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা মু'মিন হও।"[৫১]

মুসলিম বিশ্বের সীমানা ও পরিধি

আটলান্টিকের পূর্ব উপকূল থেকে নিউগিনির পশ্চিম সীমান্ত এবং সোভিয়েত সাইবেরিয়ার দক্ষিন সীমান্ত থেকে মধ্য আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ভূ- ভাগকেই প্রধানতঃ আমরা মুসলিম বিশ্ব বলে অভিহিত করতে পারি। এ মুসলিম বিশ্ব প্রায় ষাটটি স্বাধীন জাতি রাষ্ট্রে বিভক্ত। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন জাতি-রাষ্ট্রের অধীন অনেকগুলো পরাধীন মুসলিম এলাকা ও জনপদ।[৫২]

ছয় মহাদেশের ওআইসিভুক্ত মুসলিম দেশগুলোর ছবি সম্বলিত বিশ্বমানচিত্র, (হলুদ বর্ণ দেয়া)

---

৫১. আল কুর'আন, ০৩:১৩৯

৫২. আবুল আসাদ, *একুশ শতকের এজেন্ডা* (মিজান পাবলিশার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, প্রকাশকাল বইমেলা-২০০৫), পৃ. ৭৭

মুসলিম বিশ্বের জনসংখ্যা

সারা পৃথিবীতে আজ প্রায় দুইশত কোটি মুসলিম রয়েছে।[৫৩] এত মুসলিম হওয়া সত্যেও মুসলিমরাই আজ নির্যাতিত-নিপীড়িত, পদে পদে তারা লাঞ্চিত ও বঞ্চিত। বিভিন্ন দেশে মুসলিমদের রক্তই সবচেয়ে বেশি ঝড়ছে। মা-বোনদেরও ইয্যত লুন্ঠন করা হচ্ছে। মুসলিম বিশ্বের- একক জাতি দেহ আজ বহু খণ্ডে বিভক্ত। বিভক্ত শুধু নয়, তারা অনেকে পারস্পরিক সংঘর্ষেও লিপ্ত। মুসলিম উম্মাহ এভাবে দ্বন্দ্বমান জাতি রাষ্ট্রে বিভক্ত হওয়া ছাড়াও অভ্যন্তরীণভাবে বহু মত ও তরিকায় বিভক্ত ও খণ্ড-বিখণ্ড। বিখণ্ডিত মুসলিম বিশ্ব, বিভক্ত উম্মাহ নিজেকে নিয়ে নিজে আজ এতোটাই সংকট কবলিত যে, বিশ্বের প্রতি, মানবতার প্রতি কোন দায়িত্বই পালন করতে পারছে না। পারছে না শুধু নয়, তারা আজ ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও মুশরিকদের করুণার ভিখারী হয়ে পড়েছে। একদিনের তাঁদের সে দাতার হাত আজ নির্লজ্জের গ্রহীতার হাতে পরিণত।

মুসলিম উম্মাহর অনৈক্য ও অধঃপতন আজ এতোটাই ভয়াবহ যে, ঐক্যের প্রয়োজন অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় আজ যেমন বেশি, তেমনি তা আজ এক দুর্লভ বস্তুও। মুসলিম উম্মাহর সার্বিক অধঃপতিত অবস্থা যেমন তাঁর উত্থান ও ঐক্যের পথে একটা অন্তরায় হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে, তেমনি তা আজ কতগুলো চ্যালেঞ্জেরও মুখোমুখি।[৫৪]

ঐক্যের পথে প্রথম চ্যালেঞ্জ

মুসলিম ঐক্যের পথে চ্যালেঞ্জ রয়েছে। প্রথম চ্যালেঞ্জ পশ্চিমা ষড়যন্ত্র। এ ষড়যন্ত্র অত্যন্ত পুরানো।[৫৫] একসময় এ ষড়যন্ত্র চালিত হয়েছিলো মুসলিম উম্মাহর ঐক্য বিনষ্ট করার জন্য, তারপর অধঃপতন যুগের এ ষড়যন্ত্র মুসলিম উম্মাহকে আস্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে তাঁর পতনকে তরান্বিত করেছিলো। তুর্কী খিলাফতকে পশ্চিমা ষড়যন্ত্র কীভাবে যন্ত্রণা দিয়ে গেছে বছরের পর বছর, তাঁর কাহিনী রচিত হলে তা হবে জগতের সবচেয়ে বড় বিয়োগান্ত মহাকাব্য। তুর্কী খিলাফতের অধীন বুলগেরিয়ার কৃষক হত্যা নিয়ে পশ্চিমা শক্তি যে নির্লজ্জ আচরণের পরিচয় দিয়েছিলো তা চিরকাল পশ্চিমা ষড়যন্ত্রের এক দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। ব্রিটেনের গ্ল্যাডস্টোনের মতো দায়িত্বশীল ব্যক্তি এ সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী রচনা করে ইউরোপের ঘরে ঘরে প্রচার করে গোটা ইউরোপকে তুর্কী খিলাফত ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। অথচ ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা বলছেন বুলগেরীয় গণহত্যার জন্য একদিকে বুলগেরিয়ার খ্রিষ্টান কৃষক, অন্যদিকে রাশিয়া ও পশ্চিমা শক্তির ষড়যন্ত্রই

---

৫৩. *মাসিক চেতনার আলো* (ঢাকা, গজারিয়া টাওয়ার ৮৯/১২, আর.কে.মিশন রোড, মানিকনগর, উদ্বোধনী সংখ্যা), পৃ. ৪৪

৫৪. *একুশ শতকের এজেন্ডা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

৫৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯

সম্পূর্ণ দায়ী ছিল। এ পশ্চিমা ষড়যন্ত্র আজ আরো বিস্তৃত ও জোরদার হয়েছে। ফিলিস্তিনিদের ভূমি জবর দখল করে ইসরাইলের প্রতিষ্ঠা, দেশে দেশে ইসলামী নেতৃবৃন্দ ও বিজ্ঞানীদেরকে বিভিন্নভাবে হত্যা, সেকুলারিজমের উত্থান, মুসলিম দেশগুলোর অশান্ত পরিস্থিতি ও পারস্পরিক সংঘাত, প্রভৃতি তাঁদের ষড়যন্ত্রেরই ফল। মুসলিম বিশ্ব ও ইসলামী উম্মাহর ঐক্যের পথে এ ষড়যন্ত্র বলা চলে আজ এক কঠিন বাঁধা।[৫৬]

দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ

মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের পথে দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ বিজাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির অব্যাহত আগ্রাসন। পশ্চিমের শিক্ষা দর্শন ও উপকরণ আমাদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনকে আজও নিয়ন্ত্রণ করছে। তুর্কী খিলাফতের সময় তানযিমাত নেতৃত্বের আমলে আমাদের কার্যকর একক শিক্ষা ব্যবস্থা উসমানী খিলাফতের পতন পরবর্তী দ্বিধা- বিভক্ত হয়ে যায়। দু'টি ধারাকেই পশ্চিমা শিক্ষা দর্শন নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে, কিন্তু প্রধান ধারাটি হয়ে ওঠে ঔপনিবেশিকদের কাছে নিজের মতো লোক তৈরির কারখানা। লর্ড ম্যাকলের ভাষায় এ শিক্ষার লক্ষ্য ছিল, "To form a class who may be interpreters of between us and the millions whom we govern a class of persons Indian in blood and color but English in task, in opinion, in morals and in intellect."

এভাবে পশ্চিমা শিক্ষার এ ধারা জাতির জন্য প্রয়োজনীয় মানুষ তৈরি না করে বিভীষণ বানাল। তার জ্যান্ত উদাহরণ আমাদের বিচার বিভাগ ও এর ভাষা।[৫৭] এত রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীণতা প্রথমত বৃটিশদের থেকে ১৯৪৭ সালে। এরপর ৫২ সালের বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য রক্তক্ষয়ী ভাষা আন্দোলন। যে আন্দোলনে আমাদের প্রাণের ভাষা বাংলার জন্য শাহাদাত বরণ করেছেন সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার, সফিউরসহ দশের অধিক তাজা প্রাণ। এছাড়াও ১৯৭১ সালের লক্ষ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীনতা। কিন্তু এত ত্যাগের পরেও আমাদের সর্বোচ্চ আদালত চলে কোন ভাষায়? জানি, তার জবাব সবার জানা আছে, সবাই জবাব দিবে, তা হল পশ্চিমাদের ভাষায়।

অন্যদিকে তথাকথিত ইসলামী শিক্ষার ধারা যাদের তৈরি করছে তারা যুগের প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে অযোগ্য প্রমাণিত হল। এরা দু'দলই মুসলিম উম্মাহর উত্থান ও ঐক্যের পথে বাঁধা সৃষ্টি করল। এক পক্ষ ভ্রান্তি জনিত শত্রুতা বশতঃ, অন্যপক্ষ অযোগ্যতাজনিত কারণে। এ ধরনের মৌল চ্যালেঞ্জ পাশ কাটিয়ে মুসলিম বিশ্ব ও ইসলামী উম্মাহর ঐক্য সম্ভব নয়।[৫৮]

---

৫৬. *প্রাগুক্ত*
৫৭. *প্রাগুক্ত*
৫৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০

তৃতীয় চ্যালেঞ্জ

মুসলিম বিশ্বের উত্থান ও ইসলামী উম্মাহর ঐক্যের পথে তৃতীয় চ্যালেঞ্জ আমাদের অর্থনৈতিক ও কারিগরি পশ্চাৎপদতা। পশ্চিমারা আমাদের অর্থনৈতিক ও কারিগরি সাহায্য দেয়ার নামে আমাদের শুধু শোষণ নয়, শাসনও করছে। আমরা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে একপাও এগুতে পারি না। দেশে দেশে আমাদের অর্থনীতি, শাসনপদ্ধতি এবং সরকার পদ্ধতি কেমন হবে তা তারাই নির্ধারণ করে দেয়। এমনকি মন্ত্রীসভার গঠন পর্যন্ত তাদেরই মর্জি মোতাবেক হয়।[৫৯] আমাদের রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক আন্দোলন উভয়কেই তারা নিয়ন্ত্রণ করে। এ অবস্থায় হাত-পা বাঁধা মুসলিম রাষ্ট্রগুলো ইসলামের উত্থান ও মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের জন্যে কিছুই করতে পারছে না। হাত-পা এভাবে বাঁধা থাকার কারণেই মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানগণ ইসলামের উত্থানকে মৌলবাদ নামে অভিহিত করে তার বিরোধিতা করতে বাধ্য হচ্ছেন। আর এ কারণেই যেন আল্লাহর ঘর কা'বার ছায়ায় বসে স্বাক্ষর করা তাঁদের ঐতিহাসিক মক্কা ঘোষণাও তারা বাস্তবায়ন করতে পারছেন না। পশ্চিমের উপর নির্ভরতা থেকে সৃষ্ট এ চ্যালেঞ্জ যথাযথ মোকাবেলা করা না গেলে মুসলিম বিশ্বের ঐক্য বিধানের স্বপ্ন কেবল স্বপ্নই থেকে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।[৬০]

চতুর্থ চ্যালেঞ্জ

মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের পথে চতুর্থ চ্যালেঞ্জ হল, পশ্চিমা দুনিয়ার অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ এবং তাদের প্রপাগান্ডা। এ ক্ষেত্রে পশ্চিমা দুনিয়া এতই নিপুন যে, বহু ক্ষেত্রে তাদের ষড়যন্ত্র চিহ্নিত করা যায় না। ইতিহাস থেকে জানা যায়, ইন্দোনেশিয়ায় তারা কম্যুনিস্ট পার্টি ঠেকাবার জন্য কম্যুনিস্ট পার্টি গড়েছিল যাদের বিপ্লবী শ্লোগান আসল কম্যুনিস্ট পার্টিকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। অনুরূপভাবে তারা ইসলামী আন্দোলনকে ঠেকাবার জন্য ইসলামের সাইনবোর্ডে দল গঠন করতে পারে, যারা অতি বিপ্লবী শ্লোগান এবং অতি বিপ্লবী সব কাজ করে ইসলামী আন্দোলনের ক্ষতি সাধন করতে পারে। একটু খুঁজলেই হয়তো আমরা মুসলিম বিশ্বে এর দৃষ্টান্তের দেখা পাবো। পশ্চিমের বিচিত্র ধর্মীয় প্রচার কৌশলের মাধ্যমে ভুয়া তথ্য ছড়িয়ে কাজ হাসিল করে নেয়া তাদের একটা মারাত্মক অস্ত্র। ডঃ সুকর্ণের আমলে ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া যুদ্ধের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল পশ্চিমের ছড়ানো ভুল তথ্যের ওপরে ভিত্তি করেই।[৬১] সোভিয়েত গোয়েন্দা সংস্থা কেজিবি ছদ্ম পরিচয়ে ভুল তথ্য দিয়ে উভয়কেই বুঝিয়েছিল যে, সে আক্রান্ত হতে যাচ্ছে। ফলে উভয় দেশই একে অপরের বুকে বন্দুক তাক করে ধরেছিল। পরে একজন কেজিবি এজেন্ট বিস্ময়ের সাথে এ সম্পর্কে বলেছিল, "আমাদের তথ্য প্রচারণা এমন ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করে যা আমাদেরকেই হতবাক করে দেয়।" পশ্চিমের প্রচার শক্তি

---

৫৯. *প্রাগুক্ত*

৬০. *প্রাগুক্ত*

৬১. *প্রাগুক্ত*

আগের চেয়ে আজ আরো বেড়েছে। তারা সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য করবার ক্ষমতা রাখে। পশ্চিমের এ শক্তি ইসলামের উত্থান ও মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের পথে আজ এক বিপজ্জনক বাঁধা।[৬২]

মুসলিম বিশ্বের ঐক্য বলতে আমরা কী বুঝি?

মুসলিম বিশ্বের ঐক্য বলতে আমরা বুঝি খিলাফতের মতো ব্যবস্থার অধীনে গোটা মুসলিম বিশ্ব যেন একক এক রাষ্ট্র। অথবা মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর একটা ফেডারেশন বা কনফেডারেশন। এমন একটা ঐক্য সৃষ্টির মাধ্যমেই মুসলিমগণ ঘুরে দাঁড়াতে পারে এবং আজ দুনিয়াকে কিছু দান করতে পারে। আর আজকের দুনিয়াও এটাই প্রত্যাশা করে।[৬৩] তবে আশার আলো হল এখন আমরা যদি চোখ মেলে তাকাই তাহলে দেখবো দুনিয়ার মানব সভ্যতা আজ এক পরিবর্তনের দাড় প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে।[৬৪]
পি, এ সরোকিন বলেছেন, “We are living and acting at one of the epoch-making turning points of human culture and society sensate is declining and different form is emerging.”

অর্থাৎ “পুরাতনের বিদায় হচ্ছে, আর নতুন কিছুর আগমন আসন্ন।” কারো কারো মতে, “Mans very survival hings on the emergence of a new order.”
এ ‘নিউ অর্ডার’ টা কী? সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, বস্তুবাদের পক্ষে যা দেবার তা দিয়ে বস্তুবাদ আজ বিলীনের পথে। বস্তুবাদ একদিন বলেছিল, ‘বস্তুর বাইরে কিছু নেই’, সে বস্তুবাদই আজ পরিণত বয়সে পৌঁছার পরে বলছে, বস্তুর অরূপ অস্তিত্বই বেশি বলশালী যা ছিল এতোদিন আধ্যাত্মবাদীদের কথা।[৬৫] এভাবে বিজ্ঞান যেমন আজ অরূপ জগতের যাত্রী, তেমনি বস্তুবাদী মানুষও আজ দৈহিক শান্তির চেয়ে মনের শান্তির জন্যে বেশি আকুল হয়ে ওঠছে। এ অবস্থায় আজ দৈহিক ও মানসিক ভারসাম্যের বিধানকারী ইসলাম মানবতার জন্য একমাত্র বিকল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তাত্ত্বিকভাবে এ কথা বলা যতো সহজ, বাস্তবক্ষেত্রে বিকল্প হিসেবে ইসলামকে দাঁড় করানো তত সহজ নয়। এর জন্য প্রয়োজন মুসলিমদেরই প্রথমে মুসলিম হওয়া, তারপর প্রয়োজন মুসলিম দেশগুলোর ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং নিজের পায়ে দাঁড়ানো। তাহলেই শুধু মুসলিম উম্মাহ বিশ্বের মানুষদেরকে পথ দেখানোর দায়িত্ব পালনে সমর্থ হবে।[৬৬] মুসলিমদের যে সামর্থ্য ও যে চ্যালেঞ্জের কথা ওপরে উল্লেখ করা হল, সেদিক থেকে বিচার করলে আজকের দুনিয়ায় এ কাজ সহজ হওয়ার একমাত্র কারণ বিশ্বের সবাই ইসলামের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন। ইসলামের উত্থান এবং মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের যে কোন উদ্যোগ পশ্চিমের তরফ থেকে

---

৬২. *প্রাগুক্ত*
৬৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১
৬৪. *প্রাগুক্ত*
৬৫. *প্রাগুক্ত*
৬৬. *প্রাগুক্ত*

বাঁধার সম্মুখীন হবে। তাছাড়া মুসলিমদের মুসলিম বানাবার কাজ রাতারাতি করে ফেলা সম্ভব নয়। এজন্য সুকৌশল এবং ধীর পদ্ধতিতে সমাজের তলদেশ থেকে আমাদেরকে ইসলামের উত্থান ও মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের যাত্রা শুরু করতে হবে। প্রথমে ব্যক্তি হবে লক্ষ্য, তারপর পরিবার, সমাজ, জাতি, রাষ্ট্র, সবশেষে মুসলিম বিশ্বের বৃহত্তর অঙ্গন। বিষয়টি আরো একটু বিস্তারিত করে বলা যেতে পারে।

ব্যক্তিগত পর্যায়

ব্যক্তি হল সমাজের মৌল একক। বহু ব্যক্তির সমন্বয়ই হল সমাজ। সুতরাং জাতির সংস্কার এবং সংশোধনের কাজ ব্যক্তি পর্যায় থেকেই শুরু করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা ব্যক্তি জীবন পরিচালনার দিক নির্দেশনা আল কুর'আনে স্পষ্টভাবে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন:

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

"যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে চায় এ (কুর'আন) দ্বারা তিনি তাদের শান্তির পথ দেখান এবং তাদেরকে নিজ ক্ষমতাবলে অন্ধকার হতে আলোর দিকে নিয়ে যান এবং সরল পথে পরিচালিত করেন।"[৬৭]

কেউ বলতে পারেন এ সংস্কারের কাজ ওপর থেকে অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকেও হতে পারে। তবে এর জন্য যারা এ সংশোধনের সংস্কার কাজ করতে চান তাঁদের ক্ষমতা দখল করতে হবে। শুধু ক্ষমতা দখল নয়, ক্ষমতার যারা নিয়ামক বা ভিত্তি সেগুলোকেও আপনার করে নিতে হবে। কিন্তু এটা করার কোন শর্টকার্ট পথ নেই। আর যে চ্যালেঞ্জগুলো মুখিয়ে আছে তারা এটা সহজে হতেও দেবে না। বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে আফগান জিহাদ মুখ থুবড়ে পড়লো কেন? মিশরের হাফিযে কুরআন প্রেসিডেন্ট মরহুম ড. মুরসির নেতৃত্বে গঠিত গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে কেন উৎখাত করা হল? হিজরি পঞ্চদশ শতককে ইসলামের শতক হিসেবে ঢাক- ঢোল পিটানো হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলো কেন? বিভিন্ন মুসলিম দেশে ইসলামী আন্দোলন কেন অনাকাঙ্খিত আচরণের শিকার ? তাঁর জবাবগুলো সামনে আসলেই এর সত্যতা বুঝা যায়। সুতরাং উপর থেকে নয়, ব্যক্তি সংশোধনের মাধ্যমেই সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় সংস্কার ও পরিবর্তনের পথে এগুতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আইয়্যামে জাহিলিয়াতকে দূরীভূত করার জন্য সর্বপ্রথম নাযিলকৃত আয়াতে কারীমাসমূহের মাধ্যমে যে নির্দেশনা দিয়েছিলেন সেখানে ব্যক্তিগঠনের বিষয়টি সামনে চলে আসে। আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে ব্যক্তিকে পড়াশুনার কথা বলেছেন, যে পড়াশুনা হবে তার প্রভুর নামে। আল্লাহ তা'আলার সর্বপ্রথম বানী:

---

৬৭. আল কুরআন, ০৫:১৬

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

"পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আলাক্ব থেকে। পড়, তোমার প্রভু মহামহিমান্বিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে এমন বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না।"[৬৮]

জাতি রাষ্ট্র পর্যায়

ব্যক্তি সংশোধনের উপযুক্ত ও অব্যাহত কাজে নিঃসন্দেহে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৎলোক ও সৎ নেতৃত্বের উত্থান ঘটাবে। এদের সংখ্যা বৃদ্ধি রাজনৈতিক দলগুলো এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে শুভ প্রভাব ফেলবে। সমাজের সব ক্ষেত্রে এ সংশোধন- মুখীতা দেশের শাসনতন্ত্র ও শাসনকাজেও কাঙ্ক্ষিত সংশোধন আনবে।[৬৯]

মুসলিম আন্তঃরাষ্ট্র পর্যায়ে জাতি-রাষ্ট্র পর্যায়ের সংশোধন মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ঐক্যের বাধাগুলোকে অপসারিত করবে এবং মুসলিম বিশ্বের ফলপ্রসূ ঐক্য সম্ভব করে তুলবে।[৭০] মুসলিম দেশগুলোর ঐক্যের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা কেউ এখানে তুলতে পারেন। লিবিয়া- মিশর, মিশর-সিরিয়া, সিরিয়া-ইরাক, মিশর-ইয়েমেন প্রভৃতি ঐক্য টিকে নি। আরব লীগের ঐক্যেরও কোন মূল্য নেই। এমনকি ওআইসি এর ঐক্যও কোন কাজ দিচ্ছে না। এর জবাব খুব সোজা। মুসলিম দেশগুলোর সার্বিক জনমত ইসলামের ভিত্তিতে গড়ে ওঠেনি, মুসলিম রাষ্ট্রের সরকারগুলোও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমলের দিক থেকে ইসলামী নয়, সুতরাং তাঁদের ঐক্য ইসলামী হবে কী করে এবং টিকবে কীভাবে? জাগতিক স্বার্থের কারণে যে ঐক্য হয়, জাগতিক স্বার্থের কারণেই তা ভেঙ্গে যায়। সন্দেহ নেই, ওআইসি এর ঐক্য ইসলামের ভিত্তিতে হয়েছে, কিন্তু সদস্য সরকারগুলোর অধিকাংশ যেহেতু ইসলামের ভিত্তিতে গঠিত নয় এবং যেহেতু ইসলামী আমল তাঁদের নেই, তাই ওআইসি এর মহৎ ঘোষণা এবং প্রতিশ্রুতিগুলো তারা বাস্তবায়ন করতে পারছে না। সরকারগুলো ইসলামী হলেই কেবল দেখা যাবে ওআইসি বিস্ময়কর কাজ দিচ্ছে[৭১] এবং কাজের সে পরিবেশ তৈরী হয়ে আছে।

যদিও মুসলিমদের পতনকাল প্রায় শতাব্দী ছুঁয়েছে, যদিও মুসলিম বিশ্ব খণ্ড-বিখণ্ড এবং বেদনাদায়ক দ্বন্দ-সংঘাতে পূর্ণ, যদিও হতাশার অন্ধকার বড় তীব্র, তবুও আশার আলোকবর্তিকা এর মাঝে দৃশ্যমান। আমরা দেখছি, পতনের ষোলকলা যখন পূর্ণ, আশার প্রদীপ তার পাশে জ্বলে ওঠছে। মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক ঐক্যের প্রতীক খিলাফত ব্যবস্থার অবলুপ্তি ঘটানো হলো ১৯২৩ সালে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার ঐক্য

---

৬৮. আল কুরআন, ৯৬:০১-০৫

৬৯. *একুশ শতকের এজেন্ডা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

৭০. *প্রাগুক্ত*

৭১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩

প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেলো। এ সময়ের দু'টি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রয়াসে ১৯২৬ সালে দু'টি আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।[৭২] প্রথমটি অনুষ্ঠিত হয় কায়রোতে ১৯২৬ সালের ১৩ই মে থেকে ১৯শে মে পর্যন্ত। দ্বিতীয়টি অনুষ্ঠিত হয় মক্কায় ঐ বছরেই ৭ই জুন থেকে ৫ই জুলাই পর্যন্ত। বাদশাহ ইব্ন সৌদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মক্কা সম্মেলনটাই সফল হলো। এ সম্মেলনে গঠিত হয় 'মো'তামা আল-'আলম আল ইসলামী'। মো'তামার ফিলিস্তিন কেন্দ্রিক কিছু কাজ করা ছাড়া মুসলিম উম্মাহর ঐক্য বিধানে বেশি কিছু না করতে পারলেও এর গঠন বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে।[৭৩] মো'তামার সম্পর্কে বলতে গিয়ে H. A. R GIBB লিখছেন, "A new and important element in the structure of Muslim society, by which for the first time the middle classes were organized for the furtherence of Muslim object. They therefor represented the genuine public opinion of Muslim countries and were able to influence opinion to a much greater degree."

মো'তামার আলোড়ন সৃষ্টি করলেও নানা কারণে ফলপ্রসূ সংগঠন হিসেবে গড়ে উঠতে ব্যর্থ হয়। অনেক পরে ১৯৬২ সালে সৌদি আরবের উদ্যোগে মুসলিম বিশ্বের ইসলামী ব্যক্তিত্বদের নিয়ে মক্কায় একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। লক্ষ্য ছিল আরব জাতীয়তাবাদ, ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রের সয়লাবের বিরুদ্ধে একটা ইসলামী প্রতিরোধ সৃষ্টি করা। এ সম্মেলনেই গঠিত হয় 'রাবেতা আল 'আলম আল-ইসলামী'। আর মুসলিম উম্মাহর যুবকদের সংগঠন হিসেবে ১৯৭২ সালে সৌদি আরবের রিয়াদে গঠিত হয় 'ওয়ার্ল্ড এসেম্বলী অব মুসলিম ইয়ুথ'। মুসলিম উম্মাহর যুবকরা যদি জ্ঞান, নিষ্ঠা ও শক্তিতে সজ্জিত হয়, তাহলে তারা ইসলামী রেনেসাঁর ভিত্তি, ক্ষমতার উৎস এবং জাতীয় আশা- আকাঙ্ক্ষার ধারক ও বাহক হতে পারে। এ মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই ওয়ামীর প্রতিষ্ঠা হয়।[৭৪] মুসলিম ছাত্রদের আন্তর্জাতিক ফোরাম হিসেবে গঠিত হয় 'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফেডারেশন অব স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন' (IIFSO)

মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের আর একটা ফোরাম হল 'অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স' (ওআইসি)। ওআইসি এর গঠন মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসের এক অভূতপূর্ব ঘটনা। ইসলামের ভিত্তিতে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর এ ধরনের সংগঠন অতীতে আর কোন সময়ই হয়নি। বিশেষ করে যে পটভূমিতে আর যে উদ্দেশ্য নিয়ে ওআইসি গঠিত হয়েছে, তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।' সমাজবাদ ও ধর্ম নিরপেক্ষতার ঢেউ-এ যখন মুসলিম বিশ্ব বিশেষ করে আরব বিশ্ব সয়লাব হতে চলেছে, তখন সৌদি আরবের বাদশাহ ফয়সাল ইব্ন আব্দুল আযীয ইসলামের ভিত্তিতে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ঐক্যের শ্লোগান তুললেন। তিনি বললেনঃ "It is moments, when Islam is facing many undercurrents

---

৭২. *প্রাগুক্ত*

৭৩. *প্রাগুক্ত*

৭৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪

that are pulling Muslims left and right, east and west, that we need time for more co-operation and closer ties to enable us to face all the problems and difficulties that obstruct our ways as an Islamic nation, believing in God, His Prophet and His laws.”

কিন্তু বাদশাহ ফয়সালের উদ্যোগ তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। সে সময়কার তুরস্ক, সিরিয়া, মিশর এবং লিবিয়ার মতো দেশ ইসলামের ভিত্তিতে এ ধরনের ঐক্য প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে। তাদের মতে ইসলামের ভিত্তিতে কোন রাষ্ট্রীয় ঐক্য সংস্থা গঠন ঠিক হবে না। কিন্তু ১৯৬৯ সালে ইয়াহুদীরা মসজিদে আকসায় আগুন দিলে পরিস্থিতি বাদশাহ ফয়সালের অনুকূলে চলে যায়। শেষে ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বরে মরোক্কর রাজধানী রাবাতে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ইরাক এবং সিরিয়া বৈঠক বয়কট করে। শেষ পর্যন্ত ২৫ জন রাষ্ট্র এবং সরকার প্রধানের উপস্থিতিতে ওআইসি গঠিত হয়।[৭৫] মুসলিম ঐক্যের এই সংস্থাগুলো থেকে আকাঙ্ক্ষিত ফল এখনো পাওয়া যায়নি একথা সত্য, কিন্তু মুসলিম ঐক্যের বিষয়টা যে কোন আকাশকুসুম কল্পনা নয়, তা প্রমাণিত হয়েছে। এমন একদিন ছিল যখন অমুসলিমরা তো বটেই, এমনকি মুসলিম রাজনীতিকরা পর্যন্ত রাবেতা এবং ওআইসির মতো ঐক্য সংগঠন করার কথা কল্পনাও করতে পারেন নি। বরং এমন আইডিয়াকে তারা বিদ্রুপ করতেন। পাকিস্তানের এককালের প্রধানমন্ত্রী জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মুসলিম ঐক্যের চিন্তাকে ‘জিরো’ বলে অভিহিত করে মন্তব্য করেছিলেন, Zero plus, zero plus, zero plus zero is after all equal to zero.

কিন্তু সবার মুখে ছাই দিয়ে সময় প্রমাণ করেছে আজকের চরম আদর্শিক অবক্ষয়ের যুগেও ইসলামের ভিত্তিতে ঐক্য গড়া সম্ভব।[৭৬] এক সময় যা স্বপ্নেরও অতীত ছিল আজ তা বড় বাস্তব। এ বাস্তবতাই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, আমরা মুসলিম উম্মাহ ও মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যে ধরনের ঐক্য চাই তা ভোরের সূর্যোদয়ের মতই তাঁর পূর্ণ অবয়ব নিয়ে সামনে অপেক্ষা করছে।[৭৭]

কিন্তু এজন্য চাই নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সাথে আমাদের জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সদিচ্ছা। আমরা ইসলামের উত্থান এবং মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের জন্যে যে পথ অনুসরণ করবো তা হতে হবে সুবিবেচিত। ইসলামের উত্থান ও মুসলিম ঐক্যের শত্রুরা শুধু সংখ্যায় বেশি নয়, তারা কুশলী এবং শক্তিশালীও। তারা শ্যেন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। আমাদের যে কোন উদ্যোগ তারা নস্যাৎ করে দিতে প্রস্তুত, সেটা কখনো শত্রু হিসেবে, কখনো বিপথে চালনাকারী বন্ধু হিসাবে, কখনো বা আবার ছদ্মবেশী অনুপ্রবেশকারী হিসেবে। সুতরাং ঐক্য ও উত্থানের পথে প্রতিটি পদক্ষেপ আমাদের হতে হবে সুচিন্তিত। আমাদের কথা ও আবেগকে অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার নির্দেশনা।

---

৭৫. *প্রাগুক্ত*

৭৬. *প্রাগুক্ত*

৭৭. *প্রাগুক্ত*

মাক্কী জীবনে মহানবী (স.) যা করছেন সেই বেশি কাজ, কম প্রদর্শনী এবং প্রতিশোধ গ্রহণ না করার শান্তিবাদী নীতিই এখন আমাদের অনুসরণ করতে হবে। বিশ্ব পরিস্থিতির যে পর্যায়ে আমরা অবস্থান করছি তাতে নেতিবাচক নয়, ইতিবাচক কাজই আমাদের সাফল্যের সোনালী পথ।[৭৮]

---

৭৮. *প্রাগুক্ত*

তৃতীয় অধ্যায়

কুর'আন ও হাদীসে ঐক্য ও অনৈক্য প্রসঙ্গ

মহাগ্রন্থ আল-কুর'আন ও বিশ্ব নবী (স.)-এর রেখে যাওয়া সুন্নাহ এ উম্মাহর পথ চলার পাথেয়। সম্মানজনক ও লাঞ্ছনাহীন জীবন যাপন করতে এ দু'টোর পূর্ণ অনুসরণের কোন বিকল্প নেই। বিশ্ব নবী (স.) সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বেই বলে দিয়ে গেছেন:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

"আমি তোমাদের মাঝে দু'টো জিনিস রেখে যাচ্ছি সেগুলোকে আঁকড়ে ধরলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। আর তাহলো আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ।"[৭৯]

গোটা পৃথিবীতে আজকে মুসলিমরা চরম নির্যাতিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত বিভিন্ন দেশে চরম মাযলূম হিসেবে মানবেতর জীবন যাপন করছেন। তবে কেন এ দূরাবস্থা? কেন এ ভয়াবহ পরিণতি? এর একটাই কারণ আর তা হল ঐক্য ছেড়ে অনৈক্যের কবলে পড়ে থাকা। তবে এভাবে আর কতদিন? উম্মাহকে অবশ্যই আবার ঘুরে দাঁড়াতে হবে, যুল্মের মোকাবিলায় শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। আর সে জন্য ঐক্যের বিকল্প নেই। **'ঐক্য'** ব্যতীত নিজেদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল মেটানো, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আগ্রাসন প্রতিরোধ, নিজেদের হারানো সম্পদ উদ্ধার, শক্তি, শান্তি, সম্মান ও সমৃদ্ধি অর্জন কিছুই সম্ভব নয়। আর বিষয়টির গুরুত্ব বুঝাতে আল-কুর'আন ও আল-হাদীসে বিশদ দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। নিম্নে বিস্তারিত তুলে ধরা হলো:-

আল্লাহর রজ্জুকে ঐক্যবদ্ধভাবে ধারণ করার নির্দেশ

আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে ধারণ করে ঐক্যবদ্ধ থাকার মধ্যেই রয়েছে মুসলিম উম্মাহর প্রকৃত কল্যাণ এবং মুক্তি। এ ছাড়া কোন কল্যাণ মুসলিম উম্মাহ চিন্তা করতে পারে না। এ বিষয়ের নির্দেশ আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব নবী (স.) এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বে দিয়ে রেখেছেন। ঐক্যের জন্য প্রথমত দু'টো করণীয় রয়েছে যা ধারাবাহিকভাবে সূরা আলে ইমরানের ১০২ ও ১০৩ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ
جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ

৭৯. ইমাম মালেক (র.), *মু'আত্তা ইমাম মালেক* (আল মাকতাবাতুস শামেলাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, তা. বি.), হাদীস নং-১৩৯৫

إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে সেভাবে ভয় কর, যেভাবে ভয় করা উচিৎ এবং মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। আর তোমরা আল্লাহর রজ্জু (আল-কুর'আন)-কে শক্ত করে ধর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না এবং তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর, তোমরা ছিলে পরস্পরের দুশমন, তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেছেন। ফলে তোমরা তাঁরই অনুগ্রহে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলে। আরো স্মরণ করো তোমরা ছিলে অগ্নিকুণ্ডের কিনারে, তিনিই তোমাদেরকে তা থেকে উদ্ধার করেছেন। এভাবেই আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শন স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা সৎ পথ পাও। তোমাদের মধ্যে একটি দল থাকবে, যারা কল্যাণের দিকে ডাকবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কার্য থেকে নিষেধ করবে; এ সকল লোক হবে সফলকাম।"[৮০] আল্লাহ তা'আলার বক্তব্য,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

"হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিৎ ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক। আর মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।"[৮১]

তাফসীরে আহসানুল বায়ানে উল্লেখ করা হয়েছে, যে "এর অর্থ হল, ইসলামের যাবতীয় বিধান মেনে চলা, তার ওয়াজিব কাজগুলো সম্পূর্ণভাবে পালন করা। যত নিষিদ্ধ বস্তু আছে তার ধারে কাছেও না যাওয়া।" কেউ কেউ বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হলে সাহাবায়ে কিরাম খুব চিন্তায় পড়ে যান এবং বিচলিত হয়ে পড়েন। তাই মহান আল্লাহ তা'আলা

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

'তোমরা তোমাদের সাধ্যমত আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর,'[৮২] আয়াত অবতীর্ণ করলেন। তবে এ আয়াতকে উক্ত আয়াতের 'নাসেখ' মনে না করে বরং ব্যাখ্যা মনে করাই অধিক বিশুদ্ধ। কারণ 'নাসেখ' তখনই মনে করতে হয়, যখন উভয় আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন সম্ভব না হয়। এখানে তো উভয় আয়াতের মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য সাধন করা সম্ভব। যেমন, এভাবে অর্থ করা 'তোমরা আল্লাহকে ঐভাবে ভয় কর, যেভাবে স্বীয় সাধ্যমত তাঁকে ভয় করা উচিৎ।'[৮৩]

---

৮০. আল কুর'আন, ০৩:১০৩-১০৪

৮১. আল-কুর'আন, ০৩:১০২

৮২. আল-কুর'আন, ৬৪:১৬

৮৩. আল্লামা হাফিয সালাহুদ্দীন ইউসুফ, আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী সম্পাদিত, *তাফসীরে আহসানুল বায়ান* (ঢাকা, তাওহীদ পাবলিকেশন, প্রকাশ, জুন-২০১৫), পৃ. ১২২

মুসলিমদের শক্তির প্রথম মূল ভিত্তি ‘তাকওয়া’

উপরোক্ত দু’টো আয়াতের মধ্যে দু’টো মূল ভিত্তি উল্লেখ করা হয়েছে,

প্রথম মূল ভিত্তি: প্রথম মূল ভিত্তি ‘তাকওয়া’ বা আল্লাহ তা‘আলাকে ভয় করা অর্থাৎ তাঁর অপছন্দনীয় কাজ কর্ম থেকে বেঁচে থাকা।[৮৪]

তাকওয়া

তাকওয়া শব্দটি আরবী ভাষায় বেঁচে থাকা ও বিরত থাকার অর্থে ব্যবহৃত হলেও, এর ব্যবহারিক অর্থ ভয় করা। কারণ যেসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেগুলো ভয় করার বিষয়। তাতে আল্লাহর শাস্তির ভয় থাকে। এ তাকওয়া তথা বেঁচে থাকার কয়েকটি স্তর রয়েছে। সেগুলো হলো:-

প্রথম স্তর: কুফর ও শির্ক থেকে বেঁচে থাকা। এ অর্থে প্রত্যেক মুসলিমকে মুত্তাকী (তথা আল্লাহভীরু) বলা যায় যদিও সে গুনাহে লিপ্ত থাকে এর অর্থ বুঝানোর জন্য কুর’আনের অনেক জায়গায় মুত্তাকীন ও তাকওয়া শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।[৮৫]

দ্বিতীয় স্তর: যা আসলে কাম্য তা হলো এমন সব বিষয় থেকে বেঁচে থাকা যা আল্লাহ তা‘আলা ও তাঁর রাসূলের পছন্দনীয় নয়। কুর’আন ও হাদিসে তাকওয়ার যেসব ফযিলত ও কল্যাণ বর্ণিত হয়েছে তা এ স্তরের তাকওয়ার ওপর ভিত্তি করেই হয়েছে।[৮৬]

তৃতীয় স্তর: তাকওয়ার তৃতীয় স্তরটি সর্বোচ্চ স্তর যা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ও তাঁদের বিশেষ উত্তরাধিকারী অলীগণ অর্জন করে থাকেন। অর্থাৎ অন্তরকে আল্লাহ ব্যতীত সবকিছু থেকে বাঁচিয়ে রাখা এবং আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর সন্তুষ্টি কামনার দ্বারা পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ রাখা। উপরোক্ত প্রথম আয়াতে ‘ইত্তাকুল্লাহ’ বলার পর ‘হাক্কা তুক্বাতিহ’ বলা হয়েছে অর্থাৎ তাকওয়ার ঐ স্তর অর্জন করো যা তাকওয়ার হক।[৮৭]

তাকওয়ার হক কী?

এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.), রবী, কাতাদাহ ও হাসান বসরী (র.) বলেন, রাসূল (স.) থেকেও এমনি বর্ণিত হয়েছে যে, তাকওয়ার হক হল প্রত্যেক কাজে আল্লাহর আনুগত্য করা। আনুগত্যের বিপরীতে কোন কাজ না করা। আল্লাহকে সর্বদা স্মরণে রাখা, কখনো বিস্মৃত না হওয়া এবং সর্বদা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা,

৮৪. *তাফসীরে মা’আরেফুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০
৮৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯১
৮৬. *প্রাগুক্ত*
৮৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯১

অকৃতজ্ঞ না হওয়া। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, এ আয়াতটি বাস্তবে তাকওয়ার হকেরই ব্যাখ্যা। উদ্দেশ্য এই যে, পূর্ণ শক্তি ব্যয় করে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। এভাবেই তাকওয়ার হক আদায় হবে। অতএব কোন ব্যক্তি অবৈধ বিষয় থেকে বেঁচে থাকার জন্য পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা সত্ত্বেও কোনো অবৈধ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়লে, তা তাকওয়ার হকের পরিপন্থী হবে না। পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে:

وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

"আর তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।"

এতে বুঝা যায় যে, 'পূর্ণ ইসলামই প্রকৃতপক্ষে তাকওয়া'। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (স.) এর পূর্ণ আনুগত্য করা এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকা।[৮৮]

মুসলিমদের শক্তির দ্বিতীয় ভিত্তি 'পারস্পরিক ঐক্য'

মুসলিমদের শক্তির দ্বিতীয় ভিত্তি 'পারস্পরিক ঐক্য'। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:- وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا 'আর তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জুকে ধারণ কর।' আয়াতে পারস্পরিক ঐক্যের বিষয়টি অত্যন্ত সাবলীল ও বিজ্ঞজনোচিত ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ এতে সর্ব প্রথম মানুষকে পরস্পর ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে নিষেধ করা হয়েছে।[৮৯]

এর ব্যাখ্যা এই যে, ঐক্য ও মৈত্রী যে প্রশংসনীয় ও কাম্য তাতে জাতি, ধর্ম, দেশ-কাল নির্বিশেষে সব মানুষই একমত। এতে দ্বি-মতের কোন অবকাশ নেই। সম্ভবত জগতের কোথাও এমন কোন ব্যক্তি নেই যে যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিবাদ-বিসংবাদকে উপকারী ও উত্তম মনে করে। এ কারণে বিশ্বের সব দল ও গোত্রই জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানায়, কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, ঐক্য উপকারী ও অপরিহার্য হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত হওয়া সত্ত্বেও মানবজাতি বিভিন্ন দল-উপদল ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে রয়েছে।[৯০]

এরপর দলের ভিতরে উপদল এবং সংগঠনের ভিতরে উপ সংগঠন সৃষ্টি করার এমন এক কার্য ধারা অব্যাহত রয়েছে যাতে সঠিক অর্থে দুই ব্যক্তির ঐক্য কল্পকাহিনীতে পর্যবসিত হতে চলেছে। সাময়িক স্বার্থের অধীনে কয়েক ব্যক্তি কোন বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়। স্বার্থ উদ্ধার হয়ে গেলে কিংবা স্বার্থ উদ্ধারে অকৃতকার্য হলে শুধু তাদের ঐক্য বিনষ্টই হয় না বরং পরস্পরের মধ্যে নতুন শত্রুতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এ কারণে কুর'আন শুধু মৈত্রী, একতা, শৃঙ্খলা ও দলবদ্ধ হওয়ার উপদেশই দান করেনি; বরং তা অর্জন করা ও অটুট রাখার জন্য একটি ন্যায়ানুগ মূলনীতিও নির্দেশ করেছে- যা স্বীকার করে নিতে কারো

---

৮৮. *প্রাগুক্ত*
৮৯. *প্রাগুক্ত*
৯০. *প্রাগুক্ত*

আপত্তি থাকার কথা নয়। মূলনীতিটি এই যে, বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত ব্যবস্থা মেনে নেয়া।

আর বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত ব্যবস্থা ও পরিকল্পনায় অবশ্যই সব মানুষের একতাবদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক; একথা কোন জ্ঞানী ব্যক্তিই নীতিগতভাবে অস্বীকার করতে পারে না।

এখন মতভেদের একটিমাত্র ছিদ্রপথ খোলা থাকতে পারে যে, বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত ব্যবস্থা কী এবং কোনটি? ইয়াহুদিরা তাওরাতের ব্যবস্থাকে এবং খ্রিস্টানরা ইঞ্জিলের ব্যবস্থাকে আল্লাহ প্রদত্ত অবশ্যপালনীয় ব্যবস্থা বলে দাবি করে। এমনকি মুশরিকদের বিভিন্ন দলও স্ব স্ব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান বলেই দাবি করে থাকে। এ ধরনের মতানৈক্য ও বিভেদকেই কুর'আন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। বর্তমানে কুর'আনের এ মূলনীতিকে পরিত্যাগ করার কারণেই সমগ্র মুসলিম সমাজ শতধা বিভক্ত হয়ে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। এ বিভেদ মেটানোর অমোঘ ব্যবস্থাই وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا (আর তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে সবাই মিলে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর) আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে। এখানে আল্লাহর রজ্জু বলে কুর'আনকে বোঝানো হয়েছে।[৯১]

যায়েদ ইব্ন আরকাম (রা.) এর রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে "আল্লাহর রজ্জু হচ্ছে কুর'আন"। আরবী বাচন পদ্ধতিতে 'হাবলুন' এর অর্থ অঙ্গীকারও হয় এবং এমন যে কোন বস্তুকেই বলা হয় যা উপায় বা মাধ্যম হতে পারে। কুর'আন অথবা দ্বীনকে রজ্জু বলার কারণ এই যে, এটা একদিকে আল্লাহ তা'আলার সাথে বিশ্বাসী মানুষের সম্পর্ক কায়েম করে এবং অন্যদিকে বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ করে এক দলে পরিণত করে দেয়। মোটকথা কুর'আনের এ বাক্যে বিজ্ঞজনোচিত মূলনীতিই বিধৃত হয়েছে। কেননা,

প্রথমতঃ আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত জীবনব্যবস্থা কুর'আনকে কাজে-কর্মে বাস্তবায়িত করা প্রত্যেক মানুষের জন্য অবশ্য কর্তব্য।[৯২]

দ্বিতীয়তঃ সব মুসলিম সম্মিলিতভাবে একে বাস্তবায়িত করবে। এর অনিবার্য ফলস্বরূপ তারা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ ও সুশৃংখল জাতিতে পরিণত হবে। উদাহরণতঃ একদল লোক একটি রজ্জুকে ধরে থাকলে তারা সবাই এক দেহে পরিণত হয়ে যায়। এছাড়া আয়াতে একটি সূক্ষ্ম দৃষ্টান্তও বর্ণিত হয়েছে যে, মুসলিমরা যখন আল্লাহর গ্রন্থকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকবে, তখন তাদের অবস্থা হবে ঐ ব্যক্তিদের অনুরূপ, যারা কোন উচ্চস্থানে আরোহণ করার সময় শক্ত রজ্জু ধারণ করে নিশ্চিত পতনের সম্ভাবনা থেকে নিরাপদ থাকে। সুতরাং আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সবাই মিলে কুর'আনকে শক্তরূপে ধারণ করে থাকলে শয়তান তার কোন অনিষ্ট সাধনে সক্ষম হবে না এবং ব্যক্তিগত জীবনের মত মুসলিম

---

৯১. *প্রাগুক্ত*
৯২. *প্রাগুক্ত*

জাতির শক্তিও সুদৃঢ় ও অজেয় হয়ে যাবে। বলা বাহুল্য, কুর'আনকে আঁকড়ে থাকলেই ইতস্তততঃ বিক্ষিপ্ত শক্তিও একত্রিত হয় এবং মরোনুখ জাতিও নবজীবন লাভ করে। পক্ষান্তরে কুর'আন থেকে সরে থাকলে জাতীয় ও দলগত জীবনে যেমন বিপর্যয় নেমে আসে, তেমনি ব্যক্তিগত জীবনও সুখকর হয় না।[৯৩]

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا "তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে ধর" এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে ত্ববারিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'সকল মুসলিমের কর্তব্য আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে ধারণ করা। আর সে রজ্জু হল 'আল ইসলাম'। যে বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন।' তবে এ তাফসীরে কয়েকটি হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, حبلُ الله এর অর্থ হচ্ছে মুসলিমদের দল। একটি হাদিস হযরত শা'বী হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।[৯৪] তা নিম্নরূপ,

حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا العوّام، عن الشعبي، عن عبد الله بن مسعود أنه قال في قوله:"واعتصموا بحبل الله جميعا"، قال: الجماعة.

'হযরত ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন হাশিম বলেছেন, আমাদেরকে আওয়াম শা'বী থেকে খবর দিয়েছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেন, আল্লাহর বানী وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا "তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে ধর।" আর তা হলো:- জামাআত।'

আরেক বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'হাবলুল্লাহ' হল আল্লাহর কিতাব, আর সেটা আল কুর'আন। আরেক বর্ণনায় এসেছে, 'হাবলুল্লাহ' হল 'আল্লাহর প্রশারিত রশি।'

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله ، هو حبل الله الممدودُ من السماء إلى الأرض

আর হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (স.) বলেছেন, "আল্লাহর কিতাব, সেটা হল আসমান থেকে জমীন পর্যন্ত আল্লাহর প্রসারিত রশি।"[৯৫]

তাফসীরে তাফহীমুল কুরআনে 'আল্লাহর রজ্জু' বলতে আল্লাহর দীনকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহর দীনকে রজ্জুর সাথে তুলনা করার কারণ হল এই যে, এটি এমন এক সম্পর্ক যা একদিকে তামাম পৃথিবীর সকল মুসলিমকে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জুড়ে দেয় এবং অন্যদিকে সমস্ত ঈমানদারদেরকে পরস্পরের সাথে মিলিয়ে এক জামায়াতবদ্ধ করে দেয়।

---

৯৩. *প্রাগুক্ত*

৯৪. আল্লামা আবূ জা'ফর আত ত্ববারী, *তাফসীরে ত্ববারী* (আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, তা. বি.), পৃ. ৬৩

৯৫. ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনু কাসীর, *তাফসীরে ইব্‌নে কাসীর* (মিশর, কায়রো, মাকতাবাতুস্ সফা, প্রকাশকাল-২০০৪), খণ্ড- ০২, পৃ. ৫৩

এ রজ্জুকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরার মানে হচ্ছে, মুসলিমরা দীনকেই আসল গুরুত্বের অধিকারী মনে করবে, তার ব্যাপারেই আগ্রহ পোষণ করবে, তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালাবে এবং তারই খেদমত করার জন্য পরস্পরের সাথে আন্তরিক সহযোগিতা করবে। যেখানেই মুসলিমরা দীনের মৌলিক শিক্ষা ও দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে এবং তাদের সমস্ত দৃষ্টি ও আগ্রহ ছোটখাট ও খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হবে সেখানেই অনিবার্যভাবে তাদের মধ্যে সেই প্রকারের দলাদলি ও মতভেদ দেখা দিবে, যা ইতোপূর্বে বিভিন্ন নবীর উম্মতদেরকে তাদের আসল জীবন লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করে দুনিয়া ও আখিরাতের লাঞ্ছনার আবর্তে নিক্ষেপ করেছিল।[৯৬] **حبل الله** এর ব্যাখ্যায় ভারতের প্রখ্যাত কুর'আন গবেষক এবং আল কুর'আনের ইংরেজী অনুবাদক অধ্যাপক ইউসুফ আলী বলেন, "আল্লাহ প্রদত্ত রজ্জু একটি উপমা। গভীর পানিতে নিমজ্জিত একদল মানুষ নিক্ষিপ্ত শক্ত রজ্জুকে একত্রে সজোরে আঁকড়ে ধরে মহাবিপদ থেকে বেঁচে যেতে পারে। একই রজ্জুতে আবদ্ধ হওয়া ঐক্যেরও প্রতীক।"[৯৭] আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.)ও **حبل الله** এর ব্যাখ্যা করেছেন **دينه** অর্থাৎ 'তাঁর দীন আল-ইসলামকে একত্র হয়ে সুদৃঢ়ভাবে আকড়ে ধর'।[৯৮]

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

"আর তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর, তোমরা ছিলে পরস্পরের দুশমন, তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেছেন। ফলে তোমরা তাঁরই অনুগ্রহে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলে।"

ইসলাম আগমনের পূর্বে সে সময়কার আরববাসীরা যেসব ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল, আলোচ্য আয়াতাংশে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা, কথায় কথায় ঝগড়া বিবাদ এবং রাত দিন মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি ও যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে সমগ্র আরব জাতিই ধ্বংসের কবলে নিমজ্জিত হয়েছিল। এ আগুনে পুড়ে ভস্মিভূত হওয়া থেকে একমাত্র ইসলামই তাদেরকে রক্ষা করেছিল। এ আয়াত নাযিল হওয়ার তিন চার বছর আগেই মদীনার লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ইসলামের জীবন্ত অবদান তারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিল। তারা দেখতে পেয়েছিল আওস ও খাযরাজ নামক দু'টি গোত্রে কীভাবে বছরের পর বছর থেকে শত্রুতা চলে আসছিল। তারা ছিল পরস্পরের রক্ত পিপাসু। ইসলামের বদৌলতে তারা পরস্পরে মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। এ গোত্র দু'টি মক্কা থেকে আগত মুহাজিরদের সাথে এমন নযীর বিহীন ত্যাগ ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করেছিল, যা সাধারণত একই পরিবারের লোকদের নিজেদের মধ্যে করতে দেখা যায় না।[৯৯]

---

৯৬. সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মুওদূদী (র.) অনু. মাওলানা আব্দুল মান্নান তালিব, *তাফহীমুল কুরআন* (ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, প্রকাশকাল মার্চ-২০১৭), খন্ড-১-২, পৃ. ৪৮

৯৭. আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী, অনু. রফিকুর রহমান চৌধুরী, *পবিত্র কুরআন* (ঢাকা, আহসান পাবলিকেশন, প্রকাশকাল জুলাই-২০১১), পৃ. ১৪৩

৯৮. আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী ও জালালুদ্দীন মহল্লী (র), ইসলামিয়া সম্পাদনা পর্ষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *তাফসীরে জালালাইন* (ঢাকা, বাংলাবাজার, ইসলামিয়া কুতুবখানা, প্রকাশকাল, অক্টোবর-২০১০), পৃ. ৬৮৯

৯৯. *তাফহীমুল কুরআন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮-৪৯

وَلَا تَفَرَّقُوا আবার সুস্পষ্টভাবে তিনি বলে দিয়েছেন যে, "তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" এর মাধ্যমে দলে দলে বিভক্ত হওয়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে। কুর'আন বর্ণিত একতাবদ্ধ হওয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দু'টো মূলনীতিই সূরা আলে ইমরানে তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ উল্লিখিত দু'টো মূলনীতি থেকে যদি তোমরা বিচ্যুত হয়ে পড়, তাহলে তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং ভিন্ন ভিন্ন দলে তোমরা বিভক্ত হয়ে পড়বে। আজকে একথা সকলের জানা যে, মুসলিমগণ বর্তমানে দলে দলে বিভক্ত। আর বিভক্ত হওয়ার দৃশ্য আমাদের সবার সামনেই বিদ্যমান রয়েছে। কুর'আন ও হাদিস বুঝার এবং তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ নিয়ে পারস্পরিক কিছু মত পার্থক্য থাকলেও তা কিন্তু দলে দলে বিভক্ত হওয়ার কারণ নয়। এমনকি বিভক্তির কোন সুযোগও নেই। মতবিরোধ সাহাবা ও তাবেঈনগণের যুগেও ছিল। কিন্তু তারা ফিরকাবন্দী হননি, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাননি। কারণ, তাদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও সকলের আনুগত্য ও বিশ্বাসের মূল কেন্দ্র ছিল একটাই। আর তা হল কুর'আন ও সুন্নাহ। কিন্তু যখন ব্যক্তিত্বের নামে চিন্তা ও গবেষণা কেন্দ্রের আবির্ভাব ঘটল, তখন আনুগত্য ও বিশ্বাসের মূল কেন্দ্র পরিবর্তন হয়ে গেল। বড়ই আপসোসের বিষয় যে, আপন আপন ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের উক্তি ও মন্তব্যসমূহ প্রথম স্থান দখল করল এবং আল্লাহ ও রাসূলের উক্তিসমূহ দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী হল।[১০০] আর এখান থেকেই মুসলিম উম্মাহর মাঝে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা শুরু হল; আজ পযন্ত তা বেড়েই চলল।

নানামত সৃষ্টিকারীদের পরিণতি

ধর্মের বিষয়ে নানামত সৃষ্টিকারীদের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

"নিশ্চই যারা ধর্ম সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করেছে এবং নিজেরা বিভক্ত হয়েছে তাদের কোন কাজের দায়িত্ব তোমার নেই, তাদের বিষয় আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। তিনিই তাদের অবহিত করবেন তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে।"[১০১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণের কেউ কেউ বলেছেন যে, পৃথিবীতে ধর্ম সম্পর্কে সর্বপ্রথম নানামতের সৃষ্টি করেছিল ইয়াহুদী সম্প্রদায় তারপরে খৃষ্টান সম্প্রদায়। তারা বিভিন্নদলে বিভক্ত ছিল। কেউ কেউ এর দ্বারা মুশরিকদের বুঝিয়েছেন। কিছু মুশরিক ফিরিশতাদের, কিছু তারকারাজির এবং কেউ কেউ নিজেদের হাতে তৈরী করা বিভিন্ন মূর্তির পূজা করত। তবে অধিকাংশ মুফাসসির একমত যে, এ আয়াতের অর্থ ব্যাপক।

---

১০০. *তাফসীরে আহসানুল বায়ান, প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২২
১০১. আল কুর'আন, ০৬:১৫৯

কাফির ও মুশরিকসহ সে সমস্ত লোকই এর আওতাভুক্ত যারা আল্লাহর দীন 'আল ইসলাম' ও রাসূল (স.) এর ত্বরীকা 'আস-সুন্নাহ'কে বাদ দিয়ে অন্য দীন বা ত্বরীকা গ্রহণ করে বিচ্ছিন্নতা ও দলাদলির পথ অবলম্বন করে। شِيَعًا এর অর্থ বিভিন্ন দল। আর এ কথা এমন সকল সম্প্রদায়ের জন্যও প্রযোজ্য, যারা দীনের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ ছিল পরে তাদের বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ, নিজেদের নেতা-নেত্রী ও বুজুর্গদের মতকেই সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য এবং সেটাকেই শেষ সিদ্ধান্ত গণ্য করে নিজেদের পথ পৃথক করে নিয়েছে, যদিও সে মত সত্য ও সঠিকের বিপরীত।[১০২] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

"আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর ও নিজেরা বিবাদ করো না, করলে সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিনষ্ট হবে। এক্ষেত্রে তোমরা ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গেই আছেন।"[১০৩]

মুসলিমদের বিজয়ের জন্য অন্যতম শর্ত

মুসলিমদের বিজয়ের জন্য অন্যতম শর্ত সকল কাজে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা। এটা স্পষ্ট কথা যে, যে কোন মুহূর্তে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যাচরণের কারণে বড় ভয়ঙ্কর পরিণতি হতে পারে। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলার স্পষ্ট বক্তব্য أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ "তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.)-এর আনুগত্য কর।" আর যুদ্ধের ময়দানে তাদের আনুগত্য করা আরো অধিকরূপে আবশ্যক হয়ে যায়। আর এ অবস্থায় সামান্য অবাধ্যাচরণও আল্লাহর সাহায্য থেকে বঞ্চনার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। কাফির শক্তির মোকাবিলায় বিজয় লাভের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য হল তৃতীয় আদব। এর আগের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো দু'টো আদব উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কোন (কাফিরদের) দলের মুখোমুখি হবে, তখন অটল-অবিচল থাক এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর। আশা করা যায় তোমরা সফল হবে।"[১০৪]

আলোচ্য আয়াতে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ বিজয়ের জন্য দু'টো করণীয় বিষয় বলে দেয়া হয়েছে,

এক. দৃঢ়পদ ও অবিচল থাকতে হবে। কারণ এ ছাড়া যুদ্ধের ময়দানে টিকে থাকা সম্ভব নয়।

দুই. যুদ্ধ চলাকালিন আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে। এর অসিলায় মুসলিম যোদ্ধার সংখ্যা যদি কাফির শক্তির তুলনায় কমও হয় আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকেই বিজয় দান

---

১০২. *তাফসীরে আহসানুল বায়ান*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৭
১০৩. আল কুর'আন, ০৮:৪৬
১০৪. আল কুর'আন, ০৮:৪৫

করবেন। বদর যুদ্ধ তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। আর যদি সংখ্যা বেশি হয় তাহলে অন্তরে যেন গর্ব ও অহংকারের সৃষ্টি না হয়। কারণ সংখ্যাধিক্যের ওপর নির্ভর করে মুসলিমরা কোন যুদ্ধেই বিজয় লাভ করেননি। বরং বিজয়ও এসেছে আল্লাহর সাহায্যক্রমে।[১০৫] হোনায়েনের যুদ্ধ তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ যে যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা ছিল বার হাজার আর কাফির চার হাজার। শুরুর দিকে সংখ্যাধিক্যের বড়াইয়ের কারণে পরাজয় প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায়। কাফিরদের উপর্যুপরি আঘাতের কাছে মুসলিম বাহিনী পর্যুদস্ত হয়ে দল বেঁধে মাঠ ছাড়া হতে থাকে। অবশেষে মহানবি (স.)-এর আল্লাহর ওপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল ও নির্ভরতা ও বলিষ্ঠতার অসিলা করে মুসলিম বাহিনী আবার ঘুরে দাঁড়ায় এরপর আল্লাহ বিজয় দান করলেন।

ঐক্যের ভিত্তি দীন

মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের ভিত্তি হবে দীন[১০৬] তথা আল ইসলাম। আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট ভাষায় কুর'আনুল কারীমে উল্লেখ করেন:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

"নিশ্চই ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনিত দীন। ইতোপূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা তাদের পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ তাদের কাছে ইল্‌ম আসার পর মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে। আর কেউ আল্লাহর নিদর্শনকে অস্বীকার করলে নিশই আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।"[১০৭] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيب

"তিনি তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন দীন, যার নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন নূহকে। আর যার আমি প্রত্যাদেশ করেছি তোমাকে - যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে, এই বলে যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে মতভেদ করো না। অংশীবাদীদের নিকট সেই বিষয়টি বড়ই দুর্বহ মনে হয়। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা দীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয় তাকে তিনি পথ দেখান।"[১০৮]

এ আয়াতে দীনের মধ্যে দলাদলি, বিভক্তি, বিচ্ছিন্নতাকে এমন একটি ভয়ঙ্কর বিষয় বলা হয়েছে যে, সকল নবীকেই এ বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এখানে দীন

১০৫. *তাফসীরে আহসানুল বায়ান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০-৩৬১
১০৬. *ইসলামে ঐক্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬
১০৭. আল কুর'আন, ০৩:১৯
১০৮. আল কুর'আন, ৪২:১৩

প্রতিষ্ঠার বিপরীতে বিভক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, দীন প্রতিষ্ঠা বলতে দীন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সকলকে একতাবদ্ধ হওয়ার কথাই বলা হয়েছে।[১০৯] এ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা ইবনু কাসীর (র.) বলেন:

أي: وصى الله سبحانه و تعالى جميع الأنبياء عليهم السلام، بالائتلاف والجماعة، ونهاهم عن الافتراق والاختلاف

'আল্লাহ তা'আলা এতে সকল নবীকে ভালোবাসা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে আদেশ করেছেন এবং দলাদলি ও মতপার্থক্য করতে নিষেধ করেছেন।'[১১০] উপরোল্লিখিত আয়াতে কারীমাগুলো থেকে জানা যায়,

১. সকল নবীর জন্যই দীন ছিল এক। সে দীনে কোন বিভেদ ছিল না। সর্বশেষ আমাদের নবীকেও একই দীনের বিষয়ে বিশেষ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। তাই দৃঢ়তার সাথে এ দীন অনুসরণ করতে হবে।[১১১] আর এটাই বিভেদ এরানোর সহজ উপায়।
২. বিভেদের ফায়সালা হবে কিয়ামতের দিন। স্বীয় খেয়াল-খুশিমত চলার কারণেই মানুষ সত্য থেকে বিচ্যুত হয়। অন্যদিকে দীনি জ্ঞানের আলোতে পথ চলতে পারলেই দলাদলি মুক্ত হয়ে সত্যের ওপর টিকে থাকা যায়। অতএব সকল মুসলিমের জন্য দীন ও শারীয়াত মেনে চলার মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ।[১১২]

ইলমে অহীর জ্ঞানই ঐক্যের হাতিয়ার

ইলমে অহীর জ্ঞানই ঐক্যের মূল হাতিয়ার। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক যুগে নবী রাসূল ও অহী পাঠিয়ে মানুষকে হিদায়াতের পথ, একতার পথ দেখিয়েছেন। কিন্তু কিছু মানুষ মাঝে মাঝে হতাশা ব্যক্ত করেন যে, মুসলিমরা একতাবদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়। এটা মূলত ঈমানী দূর্বলতারই বহিঃপ্রকাশ। কারণ আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন শক্ত করে আল্লাহর রজ্জুকে ধরার জন্য। পাশাপাশি তিনি জানিয়ে দিয়েছেন কারা বিদ্বেষবশত মতভেদে লিপ্ত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"আমি তো বানী ইসরাঈলকে কিতাব, শাসন ক্ষমতা ও নবুওয়্যাত দিয়েছিলাম। দিয়েছিলাম উত্তম রিয্ক ও জগতবাসির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব। আরো দিয়েছিলাম দীনের সুস্পষ্ট

১০৯. *ইসলামে ঐক্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮
১১০. আল্লামা আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনু কাসীর, *প্রাগুক্ত*, খন্ড-০৭, পৃ. ১২৯
১১১. *ইসলামে ঐক্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮-১৯
১১২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০

বিধান। কিন্তু তারা ইল্‌ম প্রাপ্তির পরও পারস্পরিক বিদ্বেশবশত মতভেদে লিপ্ত হল। তারা যে বিষয়ে মতভেদ করেছিল সে ব্যাপারে তোমার রব কিয়ামতের দিন ফায়সালা করবেন। এরপর আমি তোমাকে দীনের এক বিশেষ শারীয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি; সুতরাং তা অনুসরণ কর এবং অজ্ঞদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না।”[১১৩]

কিন্তু তারা ইল্‌ম পেয়েও ক্ষতিগ্রস্থ কারণ তারা বিভেদে লিপ্ত হয়েছিল। আজও কাঙ্ক্ষিত ঐক্য গড়ে তোলার কাজ ইল্‌ম অর্থাৎ সর্বশেষ অহীর জ্ঞানের ভিত্তিতেই করতে হবে।

ওপরে দ্বিতীয় আয়াতে উল্লেখিত بَيِّنَاتٍ তথা ‘অকাট্য’ ও ‘সুস্পষ্ট’ দলিল দ্বারা হকের নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হয়। যে তা থেকে বিমুখ হয়ে মতভেদ করে তার মতভেদের ভিত্তি হঠধর্মিতা ও সীমালঙ্ঘন। এ মতভেদ হচ্ছে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা। যা বাতিলপন্থী ফির্কাগুলোর মাঝে হয়ে থাকে। আহলে হক ওলামায়ে কিরামের মাঝে এ ধরনের মতভেদ হয় না।[১১৪] এ বিষয়টিই স্পষ্টতঃ বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে।

রবের ইবাদতই ঐক্যের মূল প্রেরণা

আমাদের আল্লাহ, রাসূল, ফিরিসতা, আসমানী কিতাব, পরকাল ও তাকদীরের প্রতি ঈমান, সালাত, সাওম, হজ্জ ও যাকাত প্রভৃতি এক ও অভিন্ন ইবাদাত। আর এ সূত্রেই মুসলিম সমাজ এক অনন্য বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। পূর্ববর্তী সকল উম্মাত সে একই ইবাদাতের সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ

“নিশ্চই তোমাদের এ জাতি তো একই জাতি (একই দীনের অনুসারী) এবং আমিই তোমাদের রব। অতএব তোমরা আমারই ইবাদাত কর। তারা (পূর্ববতী উম্মতগণ) নিজেদের দীনকে নিজেদের মাঝে টুকরা টুকরা করে ফেলেছে। (মনে রেখ) সকলেই আমার কাছে ফিরে আসবে।”[১১৫]

ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখলে আল্লাহ অনুগ্রহ করবেন

জাগতিক সকল ভেদাভেদ ভুলে নিজেদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখলে আল্লাহ অনুগ্রহ করবেন বলে তিনি কুর'আনে স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন। ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখা আসলেই কঠিন কাজ, তবে সুসংবাদ হল এর বিনিময়ে তিনি অনুগ্রহ করবেন। তাঁর পক্ষ থেকে এ অনুগ্রহের ঘোষণা যে কত বিরাট প্রাপ্তি প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিই তা উপলব্ধি করার কথা।

---

১১৩. আল কুর'আন, ৪৫:১৬-১৮

১১৪. *উম্মাহর ঐক্য পথ ও পন্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

১১৫. আল কুর'আন, ২১:৯২-৯৩

তবে এজন্য কষ্ট স্বীকার করে হলেও সে অনুগ্রহ লাভের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করাই প্রত্যেক বিবেকবানের কাজ। আল্লাহ তা'আলা বলেন:-

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُم وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"নিশ্চই মু'মিনরা পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মাঝে মিমাংসা করে দাও। আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।"[১১৬] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"আর তিনি তাদের অন্তরসমূহে প্রীতি স্থাপন করেছেন। যদি তুমি যমীনে যা কিছু আছে, তার সব কিছু ব্যয় করতে তবুও তাদের অন্তরসমূহে প্রীতি স্থাপন করতে পারতে না; কিন্তু আল্লাহ তাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন। নিশ্চই তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাবান।"[১১৭]

আলোচ্য আয়াতে কারীমাদ্বয় থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, পৃথিবীর সব মু'মিনই পরস্পর ভাই ভাই। মু'মিনদের একে অপরের কর্তব্য হল নিজেদের কল্যাণ কামনা করা। আর মানুষের প্রতি মানুষের হৃদয়ে যে প্রীতি ও ভালবাসা তা আল্লাহর অনুগ্রহ মাত্র। তাঁর রহমত ব্যতীত অন্য কোন কিছুর বিনিময়ে তা অর্জন করা সম্ভব নয়।

ঐক্যবদ্ধ থাকলে আল্লাহ অনুগ্রহ করেন

যারা বিচ্ছিন্ন না থেকে একতাবদ্ধ থাকে আল্লাহ তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন। তাদেরকে সরল-সঠিক পথের ওপর অটল-অবিচল রাখেন। মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেছেন:

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا

"আর যারা ঈমান এনেছে এবং তাঁকে আঁকড়ে ধরেছে তিনি অবশ্যই তাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে দয়া ও অনুগ্রহে প্রবেশ করাবেন এবং তাঁর দিকে সরল পথ দেখাবেন।"[১১৮]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

১১৬. আল কুর'আন, ৪৯:১০
১১৭. আল কুর'আন, ০৮:৬৩
১১৮. আল কুর'আন, ০৪:১৭৫

“আর তোমরা কীভাবে কুফরী কর, অথচ তোমাদের কাছে আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হচ্ছে এবং তোমাদের মধ্যে রয়েছেন তাঁর রাসূল। আর যে ব্যক্তি দৃঢ়ভাবে আল্লাহকে ধারণ করবে তাকে অবশ্যই সরল পথের দিশা দেয়া হবে।”[১১৯]

পারস্পরিক বিদ্বেষ অনৈক্যের কারণ

আল্লাহ তা'আলা পারস্পরিক বিদ্বেষকে অনৈক্যের অন্যতম কারণ বলে বিশ্ববাসিকে জানিয়ে দিয়েছেন, কুর'আনুল কারীমে তিনি উল্লেখ করেছেন:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

“মানুষগণ ছিল একই উম্মতভুক্ত।[১২০] অতঃপর আল্লাহ নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করলেন। আর মতবিরোধ মীমাংসার জন্য তাঁদের সাথে সত্যসহ কিতাব নাযিল করলেন। বস্তুতঃ তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও তারা শুধু নিজেদের মধ্যে বিদ্বেষবশত সে বিষয়ে বিরোধে জড়িয়েছে। অতঃপর মু'মিনদেরকে আল্লাহ হেদায়াত দান করেছেন সে সত্য বিষয়ে, যে ব্যাপারে তারা মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করেন।”[১২১]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ

“আর ওরা সঠিক জ্ঞান পাওয়ার পরও শুধু পারস্পরিক বিদ্বেষবশত নিজেদের মধ্যে বিদ্বেষ ঘটিয়েছে। কিন্তু নির্দিষ্ট মেয়াদে অবকাশ দেয়ার ব্যাপারে তোমার রবের প্রতিশ্রুতি না থাকলে তাদের বিষয়ে দ্রুতই ফায়সালা হয়ে যেত। আর তাদের পরে যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে তারাও এর যথার্থতার ব্যাপারে সংশয়ী, সন্দিগ্ধ ও বিভ্রান্ত।”[১২২] আলোচ্য আয়াতে কারীমায় স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের মতভেদের মূল কারণ পারস্পরিক বিদ্বেষ। তাই ঐক্যের পথে মূল প্রতিবন্ধকতা নিরসন করতে প্রয়োজন নিজেদেরকে বিদ্বেষমুক্ত করা।

ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য যা অনুশীলন করা জরুরী

১১৯. আল কুর'আন, ০৩:১০১
১২০. অর্থাৎ সবাই একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিল।
১২১. আল কুর'আন, ০২:২১৩
১২২. আল কুর'আন, ৪২:১৪

ঐক্য ও সংহতির জন্য কিছু বিষয়ে অনুশীলন করা খুবই জরুরী। আল্লাহ তা'আলা কুর'আনুল কারীমে বর্ণনা করেছেন:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

"আর তোমরা সংগ্রাম কর আল্লাহর পথে যেভাবে সংগ্রাম করা উচিৎ। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন তবে তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি। তোমরাও তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দীনে কায়েম থাক। তিনি (আল্লাহ) তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলিম। পূর্বেও আর এ কিতাবেও (ঐ নামই দেয়া হয়েছে) যাতে রাসূল তোমাদের সাক্ষী হন আর তোমরাও মানব জাতির জন্য সাক্ষী হও। অতএব তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও, আর আল্লাহকে আঁকড়ে ধর (আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা রাখ)। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক ও কতই না উত্তম সাহায্যকারী।"[১২৩]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

"নিশ্চই মুনাফিকরা অবস্থান করবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। আপনি তাদের জন্য কখনো কোন সাহায্যকারী পাবেন না। কিন্তু যারা তাওবা করে ও নিজেদেরকে সংশোধন করে এবং আল্লাহকে মজবুতভাবে ধারণ করে আর নিজেদের দীনকে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করে তারা মু'মিনদের সঙ্গী হিসেবে গণ্য হবে। আর আল্লাহ অচিরেই মু'মিনদেরকে মহা প্রতিফল দান করবেন।"[১২৪] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا

"এরপর যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং সেটাকে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকে আল্লাহ অচিরেই তাদেরকে তাঁর রহমত ও অনুগ্রহে সিক্ত করবেন এবং তাদেরকে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করবেন।"[১২৫]

---

১২৩. আল কুর'আন, ২২:৭৮
১২৪. আল কুর'আন, ০৪:১৪৫-১৪৬
১২৫. আল কুর'আন, ০৪:১৭৫

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوص

"নিশ্চই আল্লাহ তাদের বেশি পছন্দ করেন যারা তাঁর পথে এমনভাবে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা এক সীসাঢালা প্রাচীর।"[১২৬] উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে জানা যায় যে, ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য প্রয়োজন,

১. আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরা
২. দীনকে ইখলাসের সাথে গ্রহণ করা
৩. তাওবা করা ও আত্মসংশোধনে মনোযোগী হওয়া
৪. সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্য ও শৃঙ্খলা বজায় রেখে আল্লাহর পথে সর্বাত্মক সংগ্রাম করা।[১২৭]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"আর মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী পরস্পরের বন্ধু। তারা ভাল কাজের আদেশ করে আর মন্দ কাজের নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এরা ঐসব লোক যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করবেন। নিশ্চই আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।"[১২৮]

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"আর তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ায় একে অপরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ কর্ম ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অন্যকে সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।"[১২৯]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, আর রাসূল ও তোমাদের নেতৃস্থানীয়[১৩০] ব্যক্তিগণের আনুগত্য কর। এরপর কোন বিষয়ে তোমরা মত পার্থক্য করলে বিষয়টি ফায়সালা করার জন্য আল্লাহ ও রাসূলের নিকট ফিরিয়ে দাও; যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে সত্যিকারের বিশ্বাসী হও। এটাই সর্বাধিক কল্যাণকর ও পরিণতির দিক থেকে সর্বোত্তম।"[১৩১]

---

১২৬. আল কুর'আন, ৬১:০৪
১২৭. *ইসলামে ঐক্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫
১২৮. আল কুর'আন, ০৯:৭১
১২৯. আল কুর'আন, ০৫:০২
১৩০. এ শব্দটির দ্বারা ওলামা ও শাসক উভয় শ্রেণিকেই বুঝায়। কারণ, নির্দেশদানের বিষয়টি তাঁদের উভয়ের সাথেই সম্পর্কিত। (তাফসীরে মা'আরিফুল কোরআন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০)
১৩১. আল কুর'আন, ০৪:৫৯

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিৎ যারা কল্যাণের পথে আহবান করবে, সৎ কাজে আদেশ করবে এবং মন্দ কাজে বাধা দিবে। আর এরাই সফলকাম। তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও (বিভিন্ন দলে) বিভক্ত হয়েছে ও নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে। তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।"[১৩২]

উপরোক্ত আয়াতসমূহের নির্দেশনার আলোকে ঐক্য প্রত্যাশীদের ওপর যে দায়িত্ব বর্তায়, তা নিম্নরূপ:-

১. এক মু'মিন আরেক মু'মিনের অলি বা বন্ধু প্রতীম হওয়া
২. ভাল কাজের আদেশ প্রদান করা
৩. মন্দ কাজের প্রতিরোধ গড়ে তোলা
৪. সালাত কায়েম করা
৫. যাকাত আদায় করা
৬. আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও নেতৃস্থানীয় (ইসলামী) ব্যক্তিগণের আনুগত্য করা
৭. পূণ্য ও তাকওয়ামূলক কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করা
৮. পাপ ও সীমালঙ্ঘনমূলক কাজে সহায়তা না করা
৯. বিবাদ, বিভেদ পরিহার করা
১০. ধৈর্য ও সহনশীলতা অবলম্বন করা।[১৩৩]

ঐক্যের স্বার্থে যা পরিহার করা আবশ্যক

মানুষের চিন্তা ও কর্মের মধ্যে এমন কিছু গর্হিত বিষয় রয়েছে যা সমাজে কেবল বিভেদের বীজ বপন করে। তাই আল্লাহ তা'আলা তা থেকে দূরে থাকার জন্য তাঁর প্রিয় লোকদেরকে নসীহত করেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

"হে মু'মিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। আর কোন নারী

১৩২. আল কুর'আন, ০৩:১০৪-১০৫
১৩৩. *ইসলামে ঐক্য*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬-২৭

যেন অপর কোন নারীকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিনী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা একে অপরকে দোষারোপ করো না এবং একে অন্যকে মন্দ উপাধীতে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা খুবই গর্হিত কাজ। যারা এহেন কাজ করে তাওবা করল না তারাই যালিম। হে মু'মিনগণ, তোমরা অনুমান হতে সবসময় দূরে থাক; কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে গুনাহ। তোমরা কারো গোপন ত্রুটি অনুসন্ধান করবে না এবং একে অন্যের গীবত করবে না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? বস্তুত তোমরা এটা ঘৃণা করে থাক। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চই তিনি তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।"[১৩৪]

উপরোক্ত আয়াতমালা দ্বারা জানা গেল ঐক্যের জন্য প্রয়োজন,

১. কাউকে উপহাস না করা
২. দোষারোপ না করা
৩. মন্দ নামে না ডাকা
৪. অনুমান পরিহার করা
৫. কারো গোপন ত্রুটি অনুসন্ধান না করা
৬. গীবত না করা
৭. সকল কাজে আল্লাহকে ভয় করা।
৮. ঐক্যের স্বার্থে সূরা হুমাযাতে আল্লাহ তা'আলা যে বিষয়গুলোকে ধ্বংসের কারণ বলে উল্লেখ করেছেন তা থেকে দূরে থাকা।[১৩৫] সূরা হুমাযা:

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ

অর্থ:- "দুর্ভোগ প্রত্যেকের যে সামনে ও পিছনে লোকের নিন্দা করে। যে ধন সম্পদ জমা করে আর বার বার গণনা করে। সে ধারণা করে যে, তার ধন সম্পদ তাকে অমর করে রাখবে। কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়। হুতামা কী? তা কি তুমি জান? ওটা আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত আগুন। যা হৃদয়কে গ্রাস করবে। নিশ্চই ওটা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে। দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে।"[১৩৬]

বন্ধুত্ব ও শত্রুতার নীতিমালা

কাফির ও মুশরিকরা একে অপরের বন্ধু আর আল্লাহ তা'আলা বন্ধু মুত্তাকীদের। কুর'আনুল কারীমের সূরা জাসিয়ার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা এ তথ্য দিয়ে রেখেছেন:

---

১৩৪. আল কুর'আন, ৪৯:১১-১২
১৩৫. আল কুর'আন, ৪৯:১১-১২
১৩৬. আল কুর'আন, ১০৪:০১-০৯

إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

"নিশ্চই তারা আল্লাহর সামনে আপনার কোন উপকার করতে পারবে না। যালিমরা একে অপরের বন্ধু। আর আল্লাহ মুত্তাকীদের বন্ধু। এ (কুর'আন) মানুষের জন্য জ্ঞানের আলো, আর নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য পথের দিশারী এবং রহমত স্বরূপ।"[১৩৭]

وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ (নিশ্চই যালিমরা একে অপরের বন্ধু আর আল্লাহ মুত্তাকীদের বন্ধু) এ আয়াতে স্পষ্টতঃ বন্ধুত্ব ও শত্রুতার নীতিমালা বলে দেয়া হয়েছে। ইসলামের একটি মৌলিক নীতিমালা এই যে, 'মুওয়ালাত' বা বন্ধুত্বের মানদণ্ড হল ঈমান ও ইসলাম। আর 'মু'আদাত' বা শত্রুতার মানদন্ড হল শিরক ও কুফর। যে কেউ শারীয়াতের দৃষ্টিতে থেকে মুসলিম উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত সে অন্য কোন বৈশিষ্ট্য ছাড়া শুধু মু'মিন ও মুসলিম হওয়ার কারণেই মুওয়ালাত ও বন্ধুত্বের এবং সকল ইসলামী অধিকার পাওয়ার হক রাখে। আর যে এ মানদণ্ডে উত্তীর্ণ নয়, অর্থাৎ যে শিরক ও কুফরে লিপ্ত তার সাথে মুওয়ালাত বা বন্ধুত্ব হারাম; বরং তা কুফরের আলামত।[১৩৮] বিশ্ব নবী (স.) বলেছেন:

مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য কাউকে ভালবাসল এবং আল্লাহর জন্যই কারো সাথে শত্রুতা করল, আল্লাহর জন্যই কাউকে কিছু দান করল এবং আল্লাহর জন্যই কাউকে নিষেধ করল সেই তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করল।"[১৩৯]

বিভেদ নিরসনে কুর'আনের দিক নির্দেশনা

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধভাবে চলতে গিয়ে যদি মুসলিমদের মাঝে কোন ধরনের বিভেদ দেখা দেয় সে বিভেদ নিরসনের জন্য আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট দিক নির্দেশনা দিয়ে রেখেছেন। তিনি বলেছেন:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"বিশ্বাসীদের দু'টো দল কখনো পরস্পর দ্বন্দ্ব সংঘাতে লিপ্ত হলে তোমরা বিরোধ মিমাংসা করে দিবে; কিন্তু তাদের একদল যদি অপর দলের প্রতি বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন করে, যারা বাড়াবাড়ি করবে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যে পর্যন্ত না

---

১৩৭. আল কুর'আন, ৪৫:১৯-২০
১৩৮. *উম্মাহর ঐক্য পথ ও পন্থা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭
১৩৯. *সুনানু আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৯৬১

তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে তবে ন্যায়ের সাথে তাদের মাঝে আপোস-মিমাংসা করে দিবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চই আল্লাহ সুবিচারকারীদের পছন্দ করেন।"[১৪০]

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা:

আল্লাহ তা'আলা একথা বলেননি, যখন ঈমানদারদের মধ্যকার দু'টি গোষ্ঠী পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয় বরং বলেছেন, "যদি ঈমানদারদের দু'টি দল একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়।" একথা থেকে স্বতঃই বুঝা যায় যে, পরস্পরে লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়া মুসলিমদের নীতি ও স্বভাব নয় এবং হওয়া উচিতও নয়। মু'মিন হয়েও তারা পরস্পর লড়াই করবে এটা তাদের কাছ থেকে আশাও করা যায় না। তবে কখনো যদি এরূপ ঘটে তাহলে সেক্ষেত্রে এমন কর্মপন্থা অবলম্বন করা উচিত যা পরে বর্ণনা করা হচ্ছে। তাছাড়া দল বুঝাতেও فرقة শব্দ ব্যবহার না করে طائفة শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় فرقة বড় দলকে এবং طائفة ছোট দলকে বুঝায়। এ থেকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে এটি একটি চরম অপছন্দনীয় ব্যাপার। মুসলিমদের বড় বড় দলের এতে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকাও উচিত নয়।[১৪১]

এ নির্দেশ দ্বারা এমন সমস্ত মুসলিমকে সম্বোধন করা হয়েছে যারা উক্ত বিবদমান দল দু'টিতে শামিল নয় এবং যাদের পক্ষে যুদ্ধমান দু'টি দলের মধ্যে সন্ধি ও সমঝোতা করে দেয়া সম্ভব। অন্য কথায় আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে মুসলিমদের দু'টি দল পরস্পর লড়াই করতে থাকবে আর অন্য মুসলিমরা নিষ্ক্রিয় বসে তামাশা দেখবে আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে সেটা মুসলিমের কাজ নয়। বরং এ ধরনের দুঃখজনক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটলে তাতে সমস্ত ঈমানদার লোকদের অস্থির হয়ে পড়া উচিত এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের স্বাভাবিকীকরণে যার পক্ষে যতটুকু চেষ্টা করা সম্ভব তাকে তা করতে হবে। উভয় পক্ষের লড়াই থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিতে হবে। তাদেরকে আল্লাহর ভয় দেখাতে হবে। প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ উভয় পক্ষের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাত করবে। বিবাদের কারণসমূহ জানবে এবং নিজ নিজ সাধ্যমত তাদের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠার সব রকম প্রচেষ্টা চালাবে।[১৪২]

অর্থাৎ এটাও মুসলিমের কাজ নয় যে, সে অত্যাচারীকে অত্যাচার করতে দেবে এবং যার প্রতি অত্যাচার করা হচ্ছে তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবে কিংবা অত্যাচারীকে সহযোগিতা করবে। তাদের কর্তব্য হচ্ছে, যুদ্ধরত দু'পক্ষের মধ্যে সন্ধি করানোর সমস্ত প্রচেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়ে যায় তাহলে দেখতে হবে সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী কে এবং অত্যাচারী কে? যে সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী তাকে সহযোগিতা করবে। আর যে অত্যাচারী তার বিরুদ্ধে লড়াই করবে। যেহেতু এ লড়াই করতে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ

---

১৪০. আল কুর'আন, ৪৯:০৯

১৪১. সাইয়্যেদ আবুল আলা, *তাফহীমুল কুরআন* (ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, মে-২০১৭), খণ্ড-১৫, পৃ. ৬৬-৬৭

১৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

দিয়েছেন তাই তা ওয়াজিব এবং জিহাদ হিসেবে গণ্য হবে। এটা সেই ফিতনার অন্তর্ভুক্ত নয় যার সম্পর্কে নবী ﷺ বলেছেন:

الْقَائِمِ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِى وَالْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ

"ফিতনার সময় দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি চলতে থাকা ব্যক্তির চেয়ে এবং বসে থাকা ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তির চেয়ে উত্তম।" কারণ, এই ফিতনার দ্বারা মুসলিমদের নিজেদের মধ্যকার সে লড়াইকে বুঝানো হয়েছে যা উভয় পক্ষের মাঝে গোত্র প্রীতি, জাহেলী সংকীর্ণতা এবং পার্থিব স্বার্থ অর্জনের প্রতিযোগিতা থেকে সংঘটিত হয় এবং দু'পক্ষের কেউই ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে না। তবে অত্যাচারী দলের বিরুদ্ধে সত্য ও ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত দলের সহযোগিতার জন্য যে যুদ্ধ করা হয় তা ফিতনায় অংশ গ্রহণ করা নয়। বরং তা আল্লাহর আদেশ মান্য করার জন্য। এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে সমস্ত ফিকাহবিদগণ একমত এবং ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে রাসূল ﷺ এর সাহাবীদের মধ্যে কোন মতানৈক্য ছিল না। এমনকি কিছু সংখ্যক ফকীহ একে জিহাদের চাইতেও উত্তম বলে আখ্যায়িত করেন। তাদের যুক্তি হলো, হযরত আলী (রা.) তাঁর গোটা খেলাফতকাল কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার পরিবর্তে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে কাটিয়ে দিয়েছেন। এ ধরনের লড়াই ওয়াজিব নয় বলে কেউ যদি তার সপক্ষে এই বলে যুক্তি পেশ করে যে, হযরত আলীর (রা.) এসব যুদ্ধে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এবং আরো কতিপয় সাহাবী অংশ গ্রহণ করেননি তাহলে সে ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত আছে। ইবনে উমর (রা.) নিজেই বলেছেন:-

ما وجدت فى نفسى من شئ ما وجدت من هذه الاية انى لم اقاتل هذه الفئة الباغية كما امرنى الله تعالى

"কোন বিষয়ে আমার মনে এতটা খটকা লাগেনি যতটা এ আয়াতের কারণে লেগেছে। কেননা, আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে আমি ঐ বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিনি।" সীমালজ্ঘনকারী দলের বিরুদ্ধে লড়াই করার অর্থ এটাই নয় যে, তার বিরুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লড়াই করতেই হবে এবং তাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে তার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করা এবং এর মূল উদ্দেশ্য তার অত্যাচার নিরসন করা। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে ধরনের শক্তি প্রয়োগ অনিবার্য তা ব্যবহার করতে হবে এবং যতটা শক্তি প্রয়োগ উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে যথেষ্ট তার চেয়ে কম শক্তিও প্রয়োগ করবে না আবার বেশীও প্রয়োগ করবে না। এ নির্দেশে সেই লোকদের সম্বোধন করা হয়েছে যারা শক্তি প্রয়োগ করে অত্যাচার ও সীমালজ্ঘন নিরসন করতে সক্ষম।[১৪৩]

১৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮ -৬৯

তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসলিমদের দুই দলের যুদ্ধ কয়েক প্রকার হতে পারে। বিবাদমান উভয়দল ইমামের শাসনাধীন হবে কিংবা উভয় দল শাসনাধীন হবে না। কিংবা একদল শাসনাধীন হবে এবং অন্য দল শাসন বহির্ভূত হবে। প্রথমোক্ত অবস্থায় সাধারণ মুসলিমদের কর্তব্য হবে উপদেশ এর মাধ্যমে উভয়দলকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখা। যদি উপদেশে বিরত না হয় তবে ইমামের পক্ষ থেকে মীমাংসা করা ওয়াজিব। যদি ইসলামী সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে উভয় পক্ষ যুদ্ধ বন্ধ করে তবে কেসাস ও রক্ত বিনিময় এর বিধান প্রযোজ্য হবে। অন্যথায় উভয়পক্ষের সাথে বিদ্রোহীর ব্যবহার করা হবে। এক পক্ষ যুদ্ধ থেকে বিরত হলে এবং অপরপক্ষ যুল্ম নির্যাতন অব্যাহত রাখতে দ্বিতীয় পক্ষকে বিদ্রোহী মনে করা হবে এবং প্রথম পক্ষকে আদেল বলা হবে। বিদ্রোহীদের প্রতি প্রযোজ্য বিস্তারিত বিধান ফিক্হ গ্রন্থসমূহে বিস্তরিত রয়েছে। সংক্ষিপ্ত বিধান এই যে যুদ্ধের আগে তাদের অস্ত্র ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং তাদেরকে গ্রেফতার করে তওবা না করা পর্যন্ত বন্দি রাখা হবে। যুদ্ধরত অবস্থায় কিংবা যুদ্ধের পর তাদের সন্তান-সন্ততিকে গোলাম অথবা বাদী করা হবে না এবং তাদের ধন-সম্পদ যুদ্ধলব্ধ ধন সম্পদ বলে গণ্য হবে না। তবে তওবা না করা পর্যন্ত ধনসম্পদ আটক রাখা হবে। তওবা করার পর প্রত্যর্পণ করা হবে।

আয়াতে বলা হয়েছে, فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا অর্থাৎ যদি বিদ্রোহী দল বিদ্রোহ ও যুদ্ধ থেকে বিরত হয় তবে শুধু যুদ্ধবিরতিই যথেষ্ট হবে না বরং যুদ্ধের কারণ ও পারস্পরিক অভিযোগ দূর করার চেষ্টা কর, যাতে কোনো পক্ষের মনে বিদ্বেষ ও শত্রুতা অবশিষ্ট না থাকে এবং স্থায়ী ভাতৃত্বের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তারা যেহেতু ইমামের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেছে তাই তাদের ব্যাপারে পুরোপুরি ইনসাফ না হওয়ার সম্ভাবনা ছিল তাই মহাগ্রন্থ আল কুরআন উভয় পক্ষের অধিকারের ব্যাপারে ইনসাফের তাগিদ করেছে।[১৪৪]

যদি মুসলিমদের কোনো শক্তিশালী দল ইমামের বশ্যতা স্বীকার করে তবে ইমামের কর্তব্য হবে সর্বপ্রথম তাদের অভিযোগ শ্রবণ করা তাদের কোনো সন্দেহ কিংবা ভুল বুঝাবুঝি থাকলে তা দূর করা। তারা যদি তাদের বিরোধিতার শরীয়ত সম্মত বৈধ কারণ উপস্থিত করে, যদ্দ্বারা খোদ ইমামের অন্যায়, অত্যাচার ও নিপীড়ন প্রমাণিত হয় তবে সাধারণ মুসলিমদের কর্তব্য হবে এ দলের সমর্থন ও সাহায্য করা, যাতে ইমাম যুল্ম থেকে বিরত হয়। এক্ষেত্রে ইমামের যুল্ম নিশ্চিত ও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়া শর্ত। পক্ষান্তরে তারা যদি তাদের বিদ্রোহ ও আনুগত্য বর্জনের পক্ষে কোনো সুস্পষ্ট ও সঙ্গত কারণ পেশ করতে না পারে এবং ইমামের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মুসলিমদের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া হালাল। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তারা যুদ্ধ শুরু না করা পর্যন্ত মুসলিমদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ শুরু করা জায়েয হবে না। এই বিধান তখন যখন এদেশের বিদ্রোহী ও অত্যাচারী হওয়া নিশ্চিতরূপে জানা

১৪৪. *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮০

যায়। যদি উভয় পক্ষ কোন শরীয়তসম্মত প্রমাণ রাখে এবং কে বিদ্রোহী ও কে আদেল, তা নির্দিষ্ট করা কঠিন হয় তবে প্রত্যেক মুসলিমই নিজের প্রবল ধারণা অনুযায়ী যে পক্ষকে আদেল মনে করবে সে পক্ষকে সাহায্য সমর্থন করতে পারে। যার এরূপ কোন প্রবল ধারণা নেই, সে নিরপেক্ষ থাকবে যেমন সিফফীনের যুদ্ধে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল।[১৪৫]

আর বর্ণিত আয়াতের নির্দেশনা হচ্ছে,
১. মু'মিনদের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তিতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করা ফরয
২. বাড়াবাড়িতে লিপ্ত দলকে প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগে দমন করতে হবে
৩. আপোস-মিমাংসার ক্ষেত্রে অবশ্যই ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে হবে
৪. বাড়াবাড়ি পরিহার করতে হবে।

অনৈক্যের পরিণতি

ঐক্যই শক্তি, অনৈক্যই পরাজয়। বর্তমান মুসলিম উম্মাহর কোন কিছুরই অভাব নেই। অভাব একটাই আর তা হল 'একতা'। মুসলিমদের সব কিছু থাকার পরও শুধু এর অভাবে আজকে গোটা পৃথিবীতে মুসলিম জাতি মার খাচ্ছে। অনবরত প্রচণ্ড যুল্‌ম নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ জীবন হারাচ্ছে, ঘর-বাড়ী, সহায়-সম্পদ হারাচ্ছে, মা-বোনরা ইয্‌যত হারা হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে সাড়ে চৌদ্দশত বছর আগেই মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করেছেন:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

"আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর পরস্পর ঝগড়া বিবাদ করো না, করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের প্রতিপত্তি খতম হয়ে যাবে। তোমরা ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"[১৪৬]

এ আয়াত থেকে জানা যায় বিভেদের পরিণতিতে মুসলিমরা,
১. শক্তিহীন ও দূর্বল হয়ে পড়বে এবং
২. তাদের প্রতিপত্তি শেষ হয়ে যাবে। আর আজকে হয়েছেও তা-ই।

হাদীসের আলোকে ঐক্য

আমাদের ঐক্যের মডেল আমাদের প্রিয় নবী ও রাসূল, প্রিয় নেতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মহামানব, বিশ্ব নবী মুহাম্মাদ (স.)। তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা কুর'আনুল কারীমে বর্ণনা করেছেন:

১৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮০-১২৮১
১৪৬. আল কুর'আন, ০৮:৪৬

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

"নিশ্চই আপনি মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত।"

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিষয়ে আমাদের উদ্দেশ্যে আরো বলেছেন:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

"অবশ্যই তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলের জীবনীতে রয়েছে সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ।"[১৪৭]

সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করা ফরয

সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করতে মহান আল্লাহ তা'আলা সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন। সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করা ফরয। বিশ্ব নবী (স.) বলেছেন:

إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ

"নিশ্চই আল্লাহ তা'আলা তিনটি কাজে সন্তুষ্ট হন এবং তিনটি কাজে অসন্তুষ্ট হন। যে তিনটি কাজে সন্তুষ্ট হন তাহলো, এক. তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না। দুই. তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ করবে এবং বিচ্ছিন্ন হবে না। তিন. তোমরা মুসলিম শাসকদের সহায়তা করবে। আর যে তিনটি কাজ আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ তাহলো, এক. অন্যায় কথা বলা, দুই. সম্পদ নষ্ট করা, তিন. বেশি প্রশ্ন করা।"[১৪৮] বিশ্ব নবী (স.) আরো বলেন:

فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ

"সুতরাং তোমাদের কর্তব্য হল জামা'আতবদ্ধ (একতাবদ্ধ) থাকা। নিশ্চই জামা'আতের ওপর আল্লাহর (কুদরতের) হাত রয়েছে।"[১৪৯]

জান্নাতের আনন্দ উপভোগ

বিশ্ব নবী (স.) একতাবদ্ধ জীবন যাপনকারীদের জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَطَبَنَا عُمَرُ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قُمْتُ فِيكُمْ كَمَقَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا فَقَالَ أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ

---

১৪৭. আল কুর'আন, ৩৩:২১

১৪৮. *মুসনাদু আহমাদ* (আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ, *প্রাগুক্ত*), হাদীস নং-৮৪৪৪

১৪৯. *আল মু'জামুল কাবীর লিত-ত্ববারানী* (আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ, *প্রাগুক্ত*), হাদীস নং-১৩৪৪৮

يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنْ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمْ الْجَمَاعَةَ مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَذَلِكُمْ الْمُؤْمِنُ

হযরত ইব্ন ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওমর (রা.) একটি জলাধারের কাছে বক্তব্য দিতে গিয়ে বললেন, 'হে মানুষেরা! আমি তোমাদের সামনে দাঁড়িয়েছি, যেমনিভাবে নবী (স.) আমাদের মাঝে দাঁড়িয়েছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন', 'আমি আমার সাথীদেরকে অসীয়ত করছি, তারপর তারপরবর্তীদেরকে তারপর তার পরবর্তীদেরকে। এরপর মিথ্যার সয়লাব হবে, এমনকি লোকেরা (মিথ্যা) শপথ করে কথা বলবে অথচ তার কাছে শপথ চাওয়া হবে না। লোকেরা সাক্ষ্য দিবে অথচ তার কাছ থেকে সাক্ষ্য চাওয়া হবে না। সাবধান কোন পুরুষ যেন কোন নারীর সাথে একাকী না হয় কারণ (সেখানে) তৃতীয় আরেকজন উপস্থিত হয় আর সে হল শয়তান। আর তোমাদের ওপর কর্তব্য হল ঐক্যবদ্ধ থাকা, বিভেদ-বিচ্ছিন্নতার বিষয়ে সাবধান থেকো। কারণ শয়তান একাকী ব্যক্তির সাথে থাকে, দুইজন থেকে দূরে থাকে। যে ব্যক্তি জান্নাতের স্বাচ্ছন্দ কামনা করে তার উচিৎ জামা'আতবদ্ধ থাকা। যার ভাল কাজ তাকে আনন্দ দেয় এবং মন্দ কাজ কষ্ট দেয় সে-ই মু'মিন।'[১৫০]

সর্বাবস্থায় রাসূল (স.) ও সাহাবায়ে কিরামই অনুসরণীয়

হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, বিশ্ব নবী (স.) বলেছেন:

وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

"নিশ্চই বানী ইসরাঈল বিভক্ত হয়েছে বাহাত্তর দলে। আর আমার এ উম্মত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে তিহাত্তর দলে। এর সবই জাহান্নামে যাবে; কেবল একটি দল মুক্তি পাবে। প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহর রাসূল (স.)! 'সে মুক্তি প্রাপ্ত দল কোনটি?' তিনি বললেন, 'আমি এবং আমার সাহাবায়ে কিরামের অনুসৃত পথে যারা চলবে।"[১৫১] অন্য বর্ণনায় আছে, সেটি হল 'আল জামা'আত'।

ঐক্য ও সংহতি রক্ষা

১৫০. *সুনানু আততিরমিযি* (আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ, *প্রাগুক্ত*), হাদীস নং-২১৯১
১৫১. *সুনানুত তিরমিযি*, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং-২৫৬৫

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا قَالَ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ

হযরত আবূ যার (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স.) আমাকে বললেন, "যখন তুমি দেখবে তোমাদের আমীরগণ নির্দিষ্ট সময় থেকে দেরী করে সালাত আদায় করছে অথবা সালাতকে তার সময়কাল থেকে মেরে ফেলছে তখন তুমি কী করবে? তিনি বললেন, 'আপনি আমাকে কী আদেশ করেন?' তিনি বললেন, 'তুমি সময় মত সালাত আদায় করবে।' যদি তাদেরকে আবার জামা'আতে পেয়ে যাও, তবে আবার পড়। এটি তোমার জন্য হবে নফল।"[১৫২] এরপরও তিনি তাঁকে জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার অনুমতি দেননি। নবী কারিম (স.) আরো বলেছেন:

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

"মু'মিন মু'মিনের জন্য দেয়ালের মত, যার একাংশ আরেক অংশকে শক্তিশালী করে।"[১৫৩]

পাঁচটি বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ

হযরত হারিস আল আশ'আরি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে আকরাম (স.) বলেছেন:

وأنا آمركم بخمس أمرني الله تعالى بهن : الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فمن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام أو الإيمان من عنقه ، أو الإيمان من رأسه إلا أن يراجع ، ومن دعا دعوى جاهلية فهو من جثا جهنم قيل : يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ قال وإن صام وصلى

'আর আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা আমাকে ওগুলোর নির্দেশ দিয়েছেন। বিষয়গুলো হচ্ছে- আল জামা'আহ (সংঘবদ্ধ থাকা), আমিরের নির্দেশ শ্রবণ ও পালন, হিজরত এবং আল্লাহর পথে জিহাদ। যে ব্যক্তি সংঘবদ্ধ জীবন ত্যাগ করে এক বিঘৎ পরিমাণ দূরে সরে গেছে সে নিজের গর্দান থেকে ইসলামের অথবা ঈমানের রজ্জু খুলে ফেলেছে। অথবা ঈমানের রজ্জুকে তার মাথা থেকে খুলে ফেলে দিল যতক্ষন না সে ফিরে আসে। আর যে জাহিলিয়াতের দিকে মানুষকে আহবান করল সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নিল। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি সে সালাত কায়েম এবং সাওম পালন করে? এর উত্তরে রাসূল (স.) বললেন, সালাত কায়েম এবং সাওম পালন করা সত্ত্বেও।'[১৫৪]

---

১৫২. *সহীহ মুসলিম*, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং-১০২৭

১৫৩. *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং-৪৬৮৪, *সুনানুত তিরমিযি*, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং-১৮৫১

১৫৪. ইমাম বায়হাকী, *শু'আবুল ঈমান লিলবায়হাকী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৭২৩৬, *মুসনাদু আহমাদ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৬৫৪২

সংঘবদ্ধ জীবন যাপন শয়তানের হাত থেকে বাঁচার উপায়

রাসূলে আকরাম (স.) বলেছেন, 'তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে জীবন-যাপন কর, সংঘবদ্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবন-যাপন করো না, কারণ বিচ্ছিন্ন জীবন-যাপন করলে শয়তানের কু-প্ররোচনায় আকৃষ্ট হয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।'

عن أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ لَا يُؤَذَّنُ وَلَا تُقَامُ فِيهِمْ الصَّلَاةُ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ الذِّئْبَ يَأْكُلُ الْقَاصِيَةَ

হযরত আবুদ্দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স.)-কে বলতে শুনেছি, রাসূল (স.) বলেছেন:- 'তিনজন লোক কোনো গ্রামে থাকলে যদি সেখানে আযান দেয়া না হয় এবং সালাত কায়েম না করা হয় তাহলে শয়তান তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং তোমাদের কর্তব্য হল তোমরা সংঘবদ্ধ থাকা। কারণ নিশ্চই নেকরে বিচ্ছিন্ন বকরীকে খেয়ে পেলে।"[১৫৫] ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে আরো বর্ণিত, রাসূলে আকরাম (স.) বলেছেন:

وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ مَفَارِقٌ لِلْجَمَاعَةِ فَإِنَّهُ يَمُوتُ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

'আর যে ব্যক্তি সংঘবদ্ধ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়াতের মৃত্যু।'[১৫৬] হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেছেন:

وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ

'আর তিনজন লোক কোনো নির্জন প্রান্তরে থাকলেও একজনকে আমির না বানিয়ে থাকা হালাল বা বৈধ নয়।'[১৫৭]

প্রকৃত মু'মিন ও মুসলিমের পরিচয়

বিশ্ব নবী (স.) প্রকৃত মু'মিন এবং মুসলিমের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন:

تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

'পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়া, অনুগ্রহ, মায়া-মমতার দৃষ্টিকোণ থেকে তুমি মু'মিনদের দেখবে একটি দেহের মতো। যদি দেহের কোনো একটি অংশ আহত

১৫৫. *মুসনাদু আহমাদ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২০৭১৯
১৫৬. *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫২৯২
১৫৭. *মুসনাদু আহমাদ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৬৩৬০

হয়ে পড়ে তবে অন্যান্য অংশও তা অনুভব করে, নিদ্রাহীনতা ও জ্বরের মাধ্যমে।'[১৫৮] নবীজী (স.) আরো বলেছেন:

المؤمن مألف، ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف

"মুমিনগণ মিত্রতা প্রবণ। আর ঐ ব্যক্তির মাঝে কোন কল্যাণ নেই, যে মিত্র হয় না এবং যাকে মিত্র বানানো যায় না।"[১৫৯] প্রিয় নবী (স.) আরো বলেছেন:

الْمُسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنْ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ وَإِنْ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّه

'মুসলিমগণ একটি দেহের মতো, যার চোখ আক্রান্ত হলে সমস্ত শরীর আক্রান্ত হয়; আর তার মাথা আক্রান্ত হলে সমস্ত শরীর আক্রান্ত হয়।'[১৬০]

মুসলিম ঐক্যে ফাটল ধরালে ভয়াবহ শাস্তি রয়েছে

কোন ব্যক্তি মুসলিম ঐক্যে ফাটল ধরাতে চাইলে মহানবী (স.) তার জন্য কঠিন শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন। আর এরূপ জঘন্য কাজ ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। এ ধরনের নোংরা কাজ কোন বোধ সম্পন্ন মানুষ করতে পারে না। যে ব্যক্তি মুসলিম ঐক্যে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করবে, সে হত্যাযোগ্য। এ সম্পর্কে বিশ্ব নবী (স.) বলেছেন:

عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ

"হযরত আরফাযা (রা.)-কে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স.) কে বলতে শুনেছি, তোমাদের এক নেতার অধীনে একতাবদ্ধ থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তি এসে তোমাদের শক্তি খর্ব করতে উদ্যত হয় অথবা তোমাদের ঐক্য বিনষ্ট করতে চায়, তাকে তোমরা হত্যা করবে।"[১৬১] আরেক বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ

"হযরত যায়েদ ইবনু ইলাকা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরফাযা (রা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স.) কে বলতে শুনেছি, অচিরেই নানা প্রকার ফিতনা ফাসাদের উদ্ভব হবে। যে বক্তি সংঘবদ্ধ উম্মতের মধ্যে বিশৃংঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করবে, তোমরা তরবারী দিয়ে তার গর্দান উড়িয়ে দিবে। চাই সে যে কেউ হোক না কেন।"[১৬২]

---

১৫৮. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫৫৫২
১৫৯. *মুসান্নাফ ইবনু আবি শাইবাহ*, প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, হাদীস নং-৯১, পৃ. ১৬১
১৬০. *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৬৮৭
১৬১. *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং-৩৪৪৩
১৬২. প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩৪৪২

বর্তমানে দ্বিধা-বিভক্ত ও দুর্দশাগ্রস্থ মুসলিম উম্মাহকে রক্ষায় কুর'আন ও সুন্নাহর আলোকে ঐক্য ও সংহতি রক্ষার কোন বিকল্প নেই। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এ বিষয়টিই ওপরে উল্লেখ করা হল।

চতুর্থ অধ্যায়

ঐক্যের গুরুত্ব

মুসলিম জীবনে ঐক্যের গুরুত্ব অপরিসীম। ঐক্য ছাড়া একজন মুসলিম কোন শক্তিই নয়। বরং তারা বিচ্ছিন্ন শক্তি তথা পরাজিত শক্তি। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.) ঐক্যের বিষয়ে খুবই গুরত্বারোপ করেছেন। আর ঐক্য মানেই মাযলূমের বিজয় যালিমের পরাজয়। সবলের বিরুদ্ধে দূর্বলের বিজয়। দূর্বলরা যদি ঐক্যবদ্ধ হয় এবং নিজেদের মাঝে কার্যকর ঐক্য গড়ে তুলতে পারে তাহলে যালিম যতই শক্তিশালী হোক না কেন তাদের বিরুদ্ধে দূর্বলের বিজয় সুনিশ্চিত।

'মহিষের দল একত্রিত হয়ে সিংহকে তাড়ানোর কারণে সিংহ পালিয়ে গাছে উঠে কোন মতে জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করছে!'

ঐক্য একমাত্র ইসলামের ভিত্তিতেই সম্ভব

ঐক্যের বিশেষ একটি কেন্দ্র বা ভিত্তি থাকা অত্যাবশ্যক। এ সম্পর্কে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন মত ও পথ রয়েছে। কোথাও বংশগত সম্পর্ককে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছে। উদাহরণতঃ আরব গোত্রসমূহ এর মধ্যে কোরাইশকে এক জাতি ও বনু তামিমকে অন্য জাতি মনে করা হতো। কোথাও বর্ণগত পার্থক্যই ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। ফলে কৃষ্ণাঙ্গদের এক জাতি এবং শ্বেতাঙ্গদের অন্য জাতি মনে করা হয়েছে। কোথাও দেশগত ও ভাষাগত একত্বকে কেন্দ্রবিন্দু মনে করা হয়েছে। ফলে হিন্দুরা এক জাতি আর আরবরা অন্য জাতি হয়ে গেছে। আবার কোথাও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কিছু নিয়ম-প্রথাকে ঐক্যের কেন্দ্র বানানো হয়েছে। যারা এসব নিয়ম প্রথা

পালন করে না, তারা ভিন্ন জাতি। উদাহারণতঃ ভারতের হিন্দু ও আর্য সমাজের কথা বলা যায়।[১৬৩]
মহাগ্রন্থ আল কুর'আন এগুলোকে বাদ দিয়ে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু 'হাবলুল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর প্রেরিত মযবুত জীবন ব্যবস্থাকে সাব্যস্ত করেছে এবং দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছে যে, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসীরা সবাই মিলে এক জাতি-যারা আল্লাহর রজ্জুর সাথে জড়িত এবং কাফিররা ভিন্ন জাতি- যারা এ শক্ত রজ্জুর সাথে জড়িত নয়।[১৬৪]

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (আর তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে সবাই মিলে ধরো, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আলোচ্য আয়াতে মুসলিমদেরকে দু'টো নির্দেশ দেয়া হয়েছে:-

প্রথমত: সবাই আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত জীবন ব্যবস্থার অনুসারী হয়ে যাও।

দ্বিতীয়ত: একে সবাই মিলে শক্তভাবে ধারণ কর। যাতে মুসলিম জাতির সুশৃঙ্খল ঐক্যবন্ধন স্বাভাবিকভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে একবার তা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করা গেছে।

মুসলিমদের পারস্পরিক ধনাত্মক দিক ফুটিয়ে তোলার পর বলা হয়েছে, (**وَلَا تَفَرَّقُوا**) আর পরস্পর বিভেদ সৃষ্টি করো না। আল কুর'আনের বিজ্ঞজনোচিত বর্ণনাভঙ্গি এই যে, যেখানে ধনাত্মক দিক ফুটিয়ে তোলা হয় সেখানে ঋণাত্মক দিক উল্লেখ করে বিপরীত রাস্তায় অগ্রসর হওয়া থেকে বাধা দেয়া হয়, বারণ করা হয়।[১৬৫] এছাড়া কুর'আন বিভিন্ন নবীগণের উম্মতদের ঘটনাবলি বর্ণনা করে দেখিয়েছে যে, তারা কীভাবে পারস্পরিক মতবিরোধ ও অনৈক্যের কারণে জীবনের উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক লাঞ্ছনায় পতিত হয়েছে। হযরত রাসূলে কারীম (স.) বলেন: 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য তিনটি বিষয় পছন্দ করেছেন এবং তিনটি বিষয় অপছন্দ করেছেন।' পছন্দনীয় জিনিসগুলো হলো:

০১। তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না।
০২। আল্লাহর কিতাব আল কুর'আনকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করবে এবং অনৈক্য থেকে বেঁচে থাকবে।
০৩। শাসনকর্তাদের প্রতি শুভেচ্ছার মনোভাব পোষণ করবে।

অপছন্দনীয় বিষয়গুলো হলো:
০১। অনাবশ্যক কথাবার্তা ও বিতর্ক অনুষ্ঠান।
০২। বিনা প্রয়োজনে কারো কাছে হাত পাতা বা ভিক্ষা চাওয়া এবং
০৩। সম্পদ বিনষ্ট করা।[১৬৬]

---

১৬৩. *তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২
১৬৪. *প্রাগুক্ত*
১৬৫. *প্রাগুক্ত*
১৬৬. *প্রাগুক্ত*

এখন প্রশ্ন এই যে, প্রত্যেক মতভেদই কি নিন্দনীয়? এবং মতভেদের কোনো দিকই কি অনিন্দনীয় নেই? উত্তর এই যে, প্রত্যেক মতভেদই নিন্দনীয় নয়। বরং যে মতভেদ প্রবৃত্তির তাড়নার ভিত্তিতে কুর'আন থেকে দূরে সরে চিন্তা করা হয়, তাই নিন্দনীয়। কিন্তু যদি কুর'আনের নির্ধারিত সীমার ভিতর থেকে রাসূল (স.)-এর ব্যাখ্যা স্বীকার করে নিজের যোগ্যতা ও মেধার আলোকে শাখা-প্রশাখায় মতভেদ করা হয়, তবে সে মতভেদ অস্বাভাবিক নয়। ইসলাম তা নিষেধও করে না। সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন এবং ফিক্‌হবিদ আলেমগণের মধ্যকার মতভেদ ছিল এমনই ধরনের। এমন মতভেদকে 'রহমত' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অবশ্য যদি এসব শাখা বিষয়কেই দীনের মূল সাব্যস্ত করা হয়, তবে তা অবশ্যই নিন্দনীয় এবং পরিত্যাজ্য।[১৬৭]

পারস্পরিক ঐক্যের উভয় দিক ব্যাখ্যা করার পর আয়াতে ঐ অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যাতে ইসলাম পূর্বকালে আরবরা লিপ্ত ছিল। গোত্রসমূহের পারস্পরিক শত্রুতা, কথায় কথায় অহরহ খুনখারাবী ইত্যাদির কারণে গোটা আরব জাতি বিলীন হওয়ার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। একমাত্র ইসলামরূপ আল্লাহর বিশেষ রহমতই তাদেরকে এহেন অশান্তির আগুন থেকে উদ্ধার করেছে।[১৬৮]

মুসলিমদের ঐক্য আল্লাহর আনুগত্যের ওপর নির্ভরশীল

فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا (অতঃপর তিনি তোমাদের অন্তরগুলোকে মিলিয়ে দিয়েছেন ফলে তোমরা তাঁরই অনুগ্রহে পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে গেলে) কুর'আনের এ উক্তি থেকে আরো একটি সত্য প্রতিভাত হয়েছে যে, অন্তরের মালিক প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তা'আলা। সম্প্রীতি বা ঘৃণা সৃষ্টি হওয়া তাঁরই ইচ্ছা। কোন দলের লোকদের অন্তরে পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্প্রীতি আল্লাহর তা'আলারই বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহের দান। আর এ কথা সবারই জানা যে, আল্লাহর অনুগ্রহ একমাত্র তাঁর আনুগত্যের দ্বারাই অর্জিত হতে পারে। অবাধ্যতা ও গুনাহ দ্বারা এ অনুগ্রহ অর্জিত হওয়া সুদূর পরাহত। এর ফলশ্রুতি এই যে, মুসলিমরা যদি শক্তিশালী সংগঠন ও ঐক্য কামনা করে, তবে এর একমাত্র উপায় হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যকে অঙ্গের ভূষণ করে নেয়া।[১৬৯] এ দিকে ইশারা করার জন্যই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে:

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

অর্থাৎ "এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য সত্যাসত্য সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন-যাতে তোমরা সঠিক পথে থাক।"

---

১৬৭. *প্রাগুক্ত*
১৬৮. *প্রাগুক্ত*
১৬৯. *প্রাগুক্ত*

মুসলিমদের জাতীয় ও সমষ্টিগত কল্যাণ

মুসলিমদের জাতীয় ও সমষ্টিগত কল্যাণ দু'টো বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। **প্রথমত** আল্লাহ ভীতি ও আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার মাধ্যমে আত্মসংশোধন। **দ্বিতীয়ত** নিজের স্বীয় কাজ কর্ম ও চরিত্র আল্লাহ প্রেরিত আইন অনুযায়ী সংশোধন করা এবং অন্যান্য ভাইদের কাজ-কর্ম সংশোধন করারও চিন্তা করা। এ বিষয়টিই সূরা আল আসরে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

অর্থাৎ "ধ্বংসের হাত থেকে তারাই মুক্ত যারা নিজেরা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে এবং পরস্পর পরস্পরকে সৎকাজের ও ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিয়েছে।" [১৭০]

জাতীয় ও সমষ্টিগত জীবনের জন্য একটি শক্তিশালী ঐক্য-সম্পর্ক থাকা অপরিহার্য। উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর বলে তা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এমনিভাবে এ ঐক্য সম্পর্ককে স্থিতিশীল রাখার জন্য দ্বিতীয় কাজটিও অপরিহার্য। আলোচ্য আয়াতে তাই বলা হয়েছে। অর্থাৎ অপরাপর ভাইদেরকেও কুর'আন সুন্নাহর নির্দেশ অনুযায়ী ভাল কাজে আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করাকে প্রত্যেকেই আপন কর্তব্য মনে করবে যাতে আল্লাহর রজ্জু তার হাত থেকে ফসকে না যায়। ওস্তাজ মরহুম শায়খুল ইসলাম মাওলানা শাব্বির আহমাদ ওসমানী বলতেন, 'আল্লাহর এ রজ্জু ছিঁড়ে যেতে পারে না। অবশ্য হাত থেকে ফসকে যেতে পারে। তাই এ রজ্জুটি ফসকে যাওয়ার আশঙ্কার পরিপ্রেক্ষিতে আল কুর'আন নির্দেশ জারি করেছে যে, প্রত্যেক মুসলিম নিজে সৎকর্ম করা ও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাকে জরুরী মনে করবে, তেমনি অপরকেও সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করাকে নিজের একটি কর্তব্য বলে মনে করবে।'[১৭১]

সরল সঠিক পথে চলার উপায়

ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপন সঠিক পথে চলার উপায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

"আর তোমরা কীরূপে অবিশ্বাস করবে? অথচ তোমাদের নিকট আল্লাহর আয়াত পাঠ করা হয় এবং তাঁর রাসূল তোমাদের মধ্যে রয়েছে। সুতরাং আল্লাহকে যে সুদৃঢ়ভাবে গ্রহণ করে, সে সরল পথ পাবেই।"[১৭২] আল্লাহকে সুদৃঢ়ভাবে গ্রহণ করার অর্থ হল, আল্লাহর দীনকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করা এবং তাঁর আনুগত্যে গড়িমসি না করা।[১৭৩]

---

১৭০. *প্রাগুক্ত*

১৭১. *প্রাগুক্ত*

১৭২. আল-কুরআন, ০৩:১০১

১৭৩. *তাফসীর আহসানুল বায়ান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

আল্লাহ ঐক্যবদ্ধ লোকদের ভালোবাসেন

যারা একতাবদ্ধ হয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করেন আল্লাহ তাঁদেরকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوص

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন যারা তাঁর রাস্তায় সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত সংগ্রাম করে।"[১৭৪] এখানে সংগ্রামকে একটি বড় মাহাত্মপূর্ণ নেক কাজ বলা হয়েছে; যা আল্লাহর নিকট অনেক প্রিয় আমল।[১৭৫]

আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ পাওয়ার নিশ্চয়তা

যারা একতাবদ্ধ হয়ে থাকে সব কিছুর ওপর ঐক্যকে প্রাধান্য দেয় তারাই কেবল আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত প্রাপ্ত হয়।

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا

"সুতরাং যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে ও তাঁকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরে অচিরেই তিনি তাদের তাঁর রহমত ও অনুগ্রহের মধ্যে দাখিল করবেন এবং হেদায়াতের সরল পথ দেখাবেন।"[১৭৬]

মহা পুরস্কার ও সফলতার সুসংবাদ

ঐক্যবদ্ধ থাকা মুসলিমদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে মহা পুরস্কারের সুসংবাদ রয়েছে। তিনি বলেছেন:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

"কিন্তু যারা তাওবা করে, নিজেদের সংশোধন করে, আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাদের ধর্মকে নির্মল করে তারা বিশ্বাসীদের সঙ্গে থাকবে এবং বিশ্বাসীগণকে আল্লাহ্ মহা পুরস্কার দেবেন।"[১৭৭] মুনাফিকদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি এ চারটি কর্মের প্রতি ঐকান্তিকতার সাথে যত্নবান হবে, সে

---

১৭৪. আল-কুরআন, সূরা আস-সফ ৬১:০৪
১৭৫. *তাফসীর আহসানুল বায়ান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১৩
১৭৬. আল-কুরআন, ০৪:১৭৫
১৭৭. আল-কুরআন, ০৪:১৪৬

জাহান্নামে যাওয়ার পরিবর্তে ঈমানদারদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১৭৮] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

"হে বিশ্বাসীগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দেব যা তোমাদের মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে রক্ষা করবে! তা এই যে, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করবে তোমাদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা, এটিই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে। আল্লাহ্ তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদের প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; প্রবেশ করাবেন স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। এটিই মহা সাফল্য।"[১৭৯]

ঐক্যবদ্ধ রাখা নবীগণের বৈশিষ্ট্য

জাতিকে ঐক্যবদ্ধ রাখা নবীগণের বৈশিষ্ট্য ছিল। হযরত মূসা (আ.) এর বড় ভাই এবং নবী হযরত হারুন (আ.) দেখতে পেলেন যে, মূসা (আ.) এর অবর্তমানে তাঁর জাতি তথা বানীইসরাঈল গরু বাছুরের পূজা শুরু করেছে। তিনি মূসা (আ.) এর অবর্তমানে শুধু ঐক্য বিনষ্ট হবার আশঙ্কায় শিরক করতে দেখেও তাদেরকে বাধা দেননি। মূসা (আ.) ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। কুর'আনুল কারীমের কয়েক সূরায় কয়েক আয়াতে এ বিষয়ে বিশদ বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

নিশ্চিত সফলতা

ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে সাধারণত তারাই সফল হন যারা উক্ত অঙ্গনগুলোতে সকলকে একতাবদ্ধ করে রাখতে পারেন। আর চূড়ান্ত ব্যর্থ হন তারাই যারা উক্ত অঙ্গনগুলোতে সকলকে এক রাখতে পারেন না বরং বিচ্ছিন্ন করে রাখেন।

বিচ্ছিন্নতাবাদিদের পরিণতি

যে কোন কাফির মুসলিমকে ভয় পাবেই। নবী কারীম (স.)-এর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে, কাফিররা তাঁকে প্রচন্ড ভয় পেত। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন

১৭৮. *তাফসীর আহসানুল বায়ান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭
১৭৯. আল-কুরআন, ৬১:১০-১৩

আমি রাসূল (স.) কে বলতে শুনেছি যে, "আমাকে অন্য সব নবীগণের চাইতে ছয়টি বিশেষ মর্যাদা দান করা হয়েছে।
ক) আমাকে সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবোধক কথা বলার ক্ষমতা দান করা হয়েছে।
খ) ভীতি সঞ্চারকারী প্রভাব দিয়ে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে।
গ) আমার জন্য গণীমতের অর্থ (যুদ্ধলব্ধ মাল) হালাল করা হয়েছে।
ঘ) আমার জন্য গোটা পৃথিবীর মাটিকে মসজিদ ও পবিত্র করে দেয়া হয়েছে।
ঙ) আমাকে সমগ্র সৃষ্টির জন্য (নবী করে) পাঠানো হয়েছে।
চ) আর আমার মাধ্যমে নবীগণের আগমনের ধারা বন্ধ করা হয়েছে।"[১৮০]

যারা বিচ্ছিন্ন থাকে তাদের কোন শক্তি সাহসই থাকে না। তারা যে কোন শত্রুকেই ভয় পায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

"হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা শত্রু দলের সম্মুখীন হলে অবিচল থাকবে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সফলকাম হও। আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে ও নিজেরা বিবাদ করবে না, করলে সাহস হারাবে এবং শক্তি নষ্ট হবে। তোমরা ধৈর্য-ধারণ করিও। নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্য্যশীলদের সঙ্গেই আছেন।"[১৮১]

বিচ্ছিন্নদের জন্য আল্লাহর আযাবের হুঙ্কার

যারা মুসলিম উম্মাহকে বিভক্ত করে দেয় তাদের জন্য আল্লাহ আযাবের হুঙ্কার দিয়েছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"আর তুমি বল, আমিতো প্রকাশ্য সতর্ককারী। যেমন আমি অবতীর্ণ করেছি বিভক্তকারীদের ওপর, যারা কুর'আনকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করেছে। অতএব আপনার পালনকর্তার শপথ, আমি ওদের সকলকেই জিজ্ঞাসাবাদ করবো। সে বিষয়ে যা তারা করতো।"[১৮২]

কিছু কিছু মুফাসসিরের নিকট أَنْزَلْنَا (আমি নাযিল করেছি) ক্রিয়ার কর্মকারক উহ্য রয়েছে। আর তাহলো আল্লাহর আযাব। যার পূর্ণ অর্থ হলো "আমি তোমাদেরকে সেরূপ আযাব থেকে প্রকাশ্য সতর্ককারী, যেরূপ আযাব আল্লাহ বিভক্তকারীদের ওপর অবতীর্ণ

১৮০. *সহীহ বুখারী* (ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল, এপ্রিল-২০০৪), হাদীস নং- ১০৪৮
১৮১. আল-কুরআন, সূরা আনফাল ০৮:৪৫-৪৬
১৮২. আল-কুরআন, সূরা আল হিজর ১৫:৯০-৯৩

করেছিলেন। এ বিভক্তকারী কারা? যারা কুর'আনকে বিভক্ত করে নিয়েছিল। কেউ কেউ বলেছেন, তারা কুরাইশ যারা আল্লাহর কিতাবকে বিভক্ত করেছিল। তারা তার কিছু অংশকে বলত যাদু। কিছু অংশকে বলত গণকের কথা। আবার কিছু অংশকে বলত উপকথা। পক্ষান্তরে কোন কোন মুফাসসির বলেছেন, "বিভক্তকারী বলতে আহলে কিতাব এবং কুর'আন বলতে তাওরাত ও ইঞ্জিলকে বুঝানো হয়েছে। তারা ঐ সকল কিতাবকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করে রেখেছিল।" আবার কেউ কেউ বলেন, 'এর অর্থ-আপসে শপথ বা প্রতিজ্ঞা গ্রহণকারী। এখানে সালেহ (আ.) এর জাতিকে বুঝানো হয়েছে। যারা আপসে শপথ করেছিল যে, তারা সালেহ (আ.) ও তাঁর পরিবারের সকল সদস্যকে রাতের অন্ধকারে হত্যা করে ফেলবে। আর তারা আসমানী কিতাবকে টুকরো টুকরো করেছিল। আর عِضِينَ শব্দের অর্থ কিছু গ্রহণ করা ও কিছু বর্জন করা। কিছু অংশকে বিশ্বাস ও কিছু অংশকে প্রত্যাখান করা।'[১৮৩]

কিতাবের কিছু অংশ মানা আর কিছু অংশ না মানার পরিণতি

মহাগ্রন্থ আল কুর'আনুল কারীমের কিছু অংশ মানা আর কিছু অংশ না মানা দুনিয়াতে অপমান ও আখিরাতে ভয়ংকর শাস্তির কারণ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

"তোমরা কি কিতাবের কিছু বিশ্বাস কর। আর কিছু প্রত্যাখ্যান কর? সুতরাং তোমাদের যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা বৈ কিছুই নয় এবং কিয়ামতের দিনে তারা কঠিনতম শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত হবে। তারা যা করে আল্লাহ সে সম্বন্ধে গাফেল নন।"[১৮৪]

---

১৮৩. *তাফসীর আহসানুল বায়ান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৩
১৮৪. আল কুরআন, ০২:৮৫

পঞ্চম অধ্যায়

উম্মাহর ঐক্যের গৌরবোজ্জল ইতিহাস

আদম থেকে নূহ (আ.)

প্রথমে সমস্ত আদম সন্তান এক আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী একতাবদ্ধ একই উম্মত ও একই জাতি ছিল। বিচ্ছিন্ন কোন দুর্ঘটনা ছাড়া কোন শিরক ও কুফরের নাম গন্ধও ছিল না। পরে একত্ববাদে মতবিরোধ সৃষ্টি করে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যায়। একই উম্মাত এবং সবার মুসলিম থাকার সময়কাল কতদিন ছিল তা বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, নূহ (আ.) পর্যন্ত এমনি অবস্থা ছিল।

হযরত ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, 'আদম ও নূহ (আ.)-এর মধ্যে দশ প্রজন্ম অতিবাহিত হয়েছে যারা সবাই তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এরপর মানুষের মধ্যে মতভেদও সৃষ্টি হয় এবং ঈমানের বিরুদ্ধে কুফরী ও শিরক বিস্তার লাভ করে।'

হযরত মূসা ও হারূন (আ.) এর যুগ

ইতিহাস থেকে জানা যায় এ যুগে মাযলূম বানীইসরাঈল এক চিন্তায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুক্তির পথ খুঁজছিলেন। অবশেষে আল্লাহ মূসা (আ.)-এর মাধ্যমে তাদেরকে লোহিত সাগর পার করে ফিরাউনকে তার দলবলসহ তাতে ডুবিয়ে দিয়ে চির মুক্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

ঐক্যের সার্থে জাতীয় ভুলও এড়িয়ে যাওয়া

উম্মাহর বৃহত্তর ঐক্যের স্বার্থে প্রয়োজনে জাতীয় ভুল ভ্রান্তিও উপেক্ষা করতে হয়। এ ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন হযরত হারূন (আ.) যেটা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ও বিশ্ব নবী (সা.)। হযরত হারূন (আ) এর সামনে মূসা (আ.) এর অবর্তমানে বানী ইসরাঈল যখন গো-বৎসের পূজা শুরু করলো হযরত হারূন (আ.) শুধুমাত্র ঐক্য বিনষ্ট হবে এ কারণে তাদেরকে সে সময় বাধা দেননি।[১৮৫]

---

১৮৫. এ বিষয়ে অন্য শিরোনামে পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে।

আর বিশ্ব নবী (স) এর সময়কার কা'বার মূল ভিত্তি ইবরাহীম (আ.) এর নির্মিত কা'বার ভিত্তির ওপরে নির্মিত ছিল না। তিনি আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) এর সাথে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, আয়িশা! "তোমার কাওম যদি তাদের কুফরির সময়কালের নিকটবর্তী না হত তাহলে আমি কা'বাকে ভেঙ্গে আবার ইবরাহিমের ভিত্তির ওপর নির্মাণ করতাম।"[১৮৬]

যেহেতু সাধারন আরববাসী সদ্য ইসলাম গ্রহণ করেছে এমতাবস্থায় নতুন করে কা'বাগৃহ নির্মাণ করলে তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠতে পারে, এ আশংকায় তিনি তা করেননি। এ হাদিস থেকে জানা যায় যে, অধিকতর কোন কল্যাণের ভিত্তিতে যদি শারীয়াতের কোন কোন কাজের বস্তবায়নে বিলম্ব করা হয় তাহলে তা তিরস্কার যোগ্য হবে না। তবে শর্ত হচ্ছে সে কাজটির বাস্তবায়ন যদি শরীয়াত তাৎক্ষনিক দাবী না করে।

হযরত আয়েশা (রা.) এর এ বর্ণনার ভিত্তিতে তাঁর ভাগ্নে হযরত আব্দুল্লাহ ইবন যুবায়ের (রা.) স্বীয় খিলাফতকালে কা'বা ঘরের পরিধি বাড়িয়ে ইবরাহীম (আ.) এর মূল ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করেন। আর এ ইস্যুকে কেন্দ্র করে তাঁকে নির্মমভাবে শহীদ করা হয়। তাঁর শাহাদাতের পর খলীফা আব্দুল মালেক যখন পুনরায় মক্কার ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তিনি সে ভিত্তি ভেঙ্গে দিয়ে আগের মতো করে কা'বা পূনঃনির্মাণ করেন। শুধু এ ধারণার ভিত্তিতে যে আব্দুল্লাহ (রা.) একাজ তাঁর নিজের ইজতেহাদের ভিত্তিতে করেছেন। কিন্তু তিনি যখন জানতে পারলেন যে, আব্দুল্লাহ (রা.) নিজের ইজতেহাদ থেকে নয় বরং উম্মুল মু'মিনিন এর বর্ণনার ভিত্তিতে করেছেন, তখন তিনি নিজের এ কাজের জন্য ভীষণ লজ্জিত ও অনুতপ্ত হন।

বিশ্ব নবীর যুগ

বিশ্ব নবী (স.) হলেন আখিরী পয়গম্বর। তাঁর পর আর কোন নবী কিংবা রাসূল পৃথিবীতে আসবেন না। এজন্য তাঁর গোটা জীবনীই পৃথিবীবাসির জন্য আদর্শ, অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। আল্লাহ তা'আলা কুর'আনুল কারীমে বলেন:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

> "অবশ্যই তোমাদের যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলের জীবনীতে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।"[১৮৭]

যুগে যুগে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ রাখার বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা রয়েছে। তবে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের গৌরবোজ্জল অধ্যায় শুরু হয়েছিল বিশ্বনবী (স.)-এর সময়কাল থেকে।

---

১৮৬. ড. আব্দুল মা'বুদ, *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা* (ঢাকা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, প্রকাশকাল, নভেম্বর-২০০৫), খন্ড-০৫, পৃ. ১৫৫-১৫৬

১৮৭. *প্রাগুক্ত*

তিনিই ছিলেন এ উম্মাহর ঐক্যের প্রথম মূর্ত প্রতীক ও প্রেরণার বাতিঘর। তাঁর নবুওয়্যাত লাভের পূর্ব থেকেই তিনি এ বিষয়ের উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। আর নবুওয়্যাত লাভের পর তা চূড়ান্ত প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে।

হিলফুল ফুযুল গঠন

হিলফুল ফুযুল অর্থ কল্যাণের শপথ (হলফ অর্থ শপথ আর ফুযুল অর্থ কল্যাণ)।[১৮৮] মক্কার শান্তি প্রিয় সাহসী যুবকদের একতাবদ্ধ করে মানবকল্যাণমূলক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে আঞ্জাম দেয়ার জন্য তিনি হিলফুল ফুযুল গঠন করেন। এর উদ্দেশ্য ছিলঃ-
১. পীড়িত ও অসহায়দের সাহায্য করা।
২. সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা।
৩. বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রি ও প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করা।
৪. পথিক ও মুসাফিরের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
৫. কোন যালেমকে মক্কায় প্রবেশ করতে না দেয়া এবং দুস্কৃতকারীদের অন্যায় আগ্রাসন প্রতিরোধ করা।[১৮৯]

হাজারে আসওয়াদ স্থাপন

কা’বা পূনঃনির্মাণ করতে গিয়ে হাজরে আসওয়াদকে নির্ধারিত স্থান থেকে সড়ানো হয়। নির্মাণ শেষে তা আবার যথাস্থানে রাখতে গিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয় কে তা যথাস্থানে রাখবেন ? অবস্থা এমন হয় যে, সব গোত্রই চাচ্ছিল এ পূণ্যের কাজটি একমাত্র তারা করতে। আর এ নিয়ে চরম উত্তেজনা দেখা দেয়। অবশেষে তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হন যে, যিনি আগামীকাল প্রথমে হারাম এলাকায় প্রবেশ করবেন তিনিই এ পাথর স্ব-স্থানে রাখবেন। দেখা গেল বিশ্ব নবী মুহাম্মাদ (স.)-ই পরদিন প্রথম হারাম এলাকায় প্রবেশ করলেন। প্রত্যেকে তাঁকে মীমাংসাকারী মেনে নিলেন। তিনি নিজের গায়ের চাদর বিছিয়ে দিয়ে, নিজের হাতে তার মধ্যে হাজরে আসওয়াদ রেখে প্রত্যেক গোত্রপতিদের ডাকলেন তাদের সাথে নিয়ে তাকে স্ব-স্থানে রাখার মধ্য দিয়ে তিনি ভয়াবহ গোত্র সংঘর্ষের হাত থেকে মক্কাবাসিকে রক্ষা করতে সক্ষম হলেন। আর এ পদ্ধতিতেই তিনি হাজরে আসওয়াদকে যথাস্থানে স্থাপন করে একজন মহান বিবেকবান মীমাংসাকারীর মর্যাদা লাভ করেন।[১৯০]

---

১৮৮. *উইকিপিডিয়া*
১৮৯. সফিউর রহমান মোবারকপুরী, *আর রাহীকুল মাখতুম* (মিশর, আল মাকতাবাতু আল হাদি আল মুহাম্মাদি, মানসূরা, প্রকাশকাল-২০১২), পৃ. ৬০
১৯০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১-৬২

নবুওয়্যাতের যুগ

বিশ্ব নবী (স.) এর নবুওয়্যাত যুগের একতা ছিল তাওহীদ কেন্দ্রিক একতা, কালেমা গ্রহণকারী প্রতিটি মুসলিমের মাঝে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় মজবুত ঐক্য গড়ে উঠেছিল। আর নবীজির নবুওয়্যাতের সূচনা হয়েছিল 'পড়' এ আদেশ দানের মধ্য দিয়ে। এ কথা সর্বজন বিধিত যে, মানুষ সাধারণত যত শিক্ষিত হয় তত সামাজিক হয়। শিক্ষার হার যত বাড়ে জাতি তত একতাবদ্ধ হয় ও তত উন্নতি লাভ করে। বিশ্বনবী (স.) নবুওয়্যাতের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে কালেমাধারী তথা তাওহীদে বিশ্বাসী প্রতিটি মুসলিমকে তাওহীদের ভিত্তিতে পরস্পর ভাই ভাই এ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুললেন। এ কারণে একজন আরেকজনের দুঃখ-বেদনার সাথী হয়ে গেলেন। এক মুসলিম আরেক মুসলিমের সহায়তার জন্য তৈরী হয়ে গেলেন। বিশ্ব নবী (স.) ঘোষণা দিলেন:

الْمُسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنْ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ وَإِنْ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ

"মুসলিমগণ হলেন একটা দেহের মত। যখন তার চক্ষু ব্যাথাতুর হয় তখন তার গোটা দেহ ব্যাথাতুর হয়। যখন তার মাথা ব্যাথাতুর হয় তখন তার গোটা শরীরই ব্যাথাতুর হয়ে ওঠে।"[১৯১]

মতবিরোধ মুক্ত সোনালী যুগ

আমাদের সময়কালের মত বিশ্বনবী (স.) এর যুগে ফিকহী মাসআলা-মাসায়েল নিয়ে গবেষণা করা হতো না। তাঁর সময়ে ফিক্‌হ নামে আলাদা কোন বিষয়েরও অস্তিত্ব ছিল না। বর্তমানে আমাদের ফকীহগণ যেভাবে দলিল প্রমাণসহ পৃথক পৃথকভাবে প্রতিটি বিষয়ের গুরুত্ব, মর্যাদা, বিধি-বিধান, শর্ত-শারায়েত ও প্রয়োগরীতি বর্ণনা করেন, সে সময় বিধি-বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে এ ধরনের কোন পদ্ধতি চালু ছিল না। এখন যেমন কোন একটি সমস্যা (মাসআলা) কল্পনা করে নিয়ে তার ওপর গবেষণা চালানো হয়; যে সব জিনিসের সংজ্ঞা প্রদান করা যায় সেগুলোর যুক্তি ভিত্তিক সংজ্ঞা প্রদান করা হয়। যেসব জিনিসের সীমা ও পরিধি নির্ণয় করা যায় সেগুলোর সীমা-পরিধি স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়– সে সময় এমন কোন পদ্ধতি তখন ছিল না।[১৯২]

রাসূল (স.) এর পদ্ধতি ছিল এর চেয়ে ভিন্নতর। তাঁর তরীকা ছিল এরূপ, যেমন তিনি অযু করতেন। সাহাবাগণ তা প্রত্যক্ষ করতেন, তিনি কী নিয়মে অযু করছেন। তাঁরা তাঁর অযু দেখে দেখে তাঁর নিয়মেই অযু করতেন। এটি অযুর রুকন, এ অংশ অযুর নফল কিংবা এটা অযুর আদব– এভাবে বিশ্লেষণ করে তিনি বলতেন না। একইভাবে তিনি

---

১৯১. *প্রাগুক্ত*

১৯২. শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবী, অনু. আব্দুস শহীদ নাসিম, *মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়* (ঢাকা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, প্রকাশকাল- জুন ২০১৬), পৃ. ০৯

সালাত আদায় করতেন। সাহাবায়ে কিরাম তাঁর সালাত দেখতেন। তাঁর সালাত আদায় দেখে দেখে তাঁরাও তাঁর তরীকা অনুযায়ী সালাত আদায় করতেন।[১৯৩] তিনি বলেছেন: وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي 'আর তোমরা সেভাবে সালাত পড় যেভাবে আমাকে পড়তে দেখ।'[১৯৪]

বিশ্ব নবীর যুগে সাহাবায়ে কিরামগণের বৈশিষ্ট্য

বিশ্ব নবী (স.) জীবনে একবার মাত্র হজ্জ পালন করেন। সাহাবায়ে কিরামগণ তাঁর হজ্জের রীতি-পদ্ধতি অবলোকন করে সে অনুযায়ী নিজেরা হজ্জ পালন করা শুরু করেন। সাধারণতঃ এটাই ছিল নবী কারীম (স.)-এর শিক্ষাদান পদ্ধতি।
পবিত্রতা অর্জনের জন্য ও সালাত আদায়ের জন্য তিনি অযু করতেন কিন্তু তিনি কখনো ব্যাখ্যা করে বলেননি যে, অযুতে চার ফরয কিংবা ছয় ফরয। অযু করার সময় কখনো ব্যক্তি যদি অযুর অঙ্গসমূহ পরপর ধৌত না করে তবে তার অযু হবে কি হবে না? এমন কোন ঘটনা আগে থেকে ধরে নিয়ে সে বিষয়ে আগাম কোন বিধান জারি করা উচিৎ বলে তিনি কখনো মনে করতেন না। এরূপ ধরে নেয়া এবং অসংঘটিত অবস্থার বিধানের ক্ষেত্রে তিনি কদাচিতই কিছু বলেছেন।[১৯৫]

অপরদিকে সাহাবায়ে কিরামগণও এ ধরনের ব্যাপারে নবী কারিম (স.) কে খুব কমই প্রশ্ন করতেন। হযরত ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথীগণের চাইতে উত্তম কোন মানব দল কখনোই দেখিনি। রাসূল (স.)-এর জিন্দেগীতে তাঁরা তাঁকে মাত্র তেরটি প্রশ্ন করেছেন। এর সবগুলোই কুর'আনুল কারীমে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, 'হে নবী! এরা তোমাকে হারাম মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে প্রশ্ন করছে।' অথবা হে নবী! তারা তোমার নিকট হায়েয সংক্রান্ত বিধান জানতে চায়' প্রভৃতি।" অতঃপর ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, "সাহাবীগণ কেবল সেসব প্রশ্নই করতেন, যা ছিল তাদের জন্য উপকারী।"[১৯৬]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন ওমর (রা.) বলেন, 'তোমরা এমন কোন বিষয়ে প্রশ্ন করো না যা বাস্তবে সংঘটিত হয়নি। কারণ আমি ওমর ইবন খাত্তাব (রা.) কে এ ধরনের প্রশ্নকর্তাদের অভিসম্পাত করতে দেখেছি।"[১৯৭]
উমার ইবন ইসহাক (র.) বলেছেন, "রাসূল (স.)-এর অর্ধেকের বেশি সাহাবির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। আমি তাদের চেয়ে অধিক জটিলতামুক্ত এবং কঠোরতা বর্জনকারী মানবগোষ্ঠীর সাক্ষাৎ পাইনি।"[১৯৮]

---

১৯৩. *প্রাগুক্ত*
১৯৪. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৬৩১, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৬৮৩
১৯৫. *মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৯
১৯৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০
১৯৭. *প্রাগুক্ত*

উবাদা ইবন বসরকান্দি (র.) থেকে এ ফতোয়া চাওয়া হয়েছিল যে, "কোন নারী যদি এমন কোন স্থানে মৃত্যু বরণ করে, যেখানে তার কোন ওলী পাওয়া যাবে না, সে অবস্থায় তাকে গোসল দেয়া হবে কীভাবে?" জবাবে তিনি বলেছিলেন, "আমি এমন লোকদের সাক্ষাৎ করেছি যারা তোমাদের মত কঠোরতা এবং জটিলতা অবলম্বন করতেন না। তারা তোমাদের মত (ধরে নেয়া বিষয়ে) প্রশ্ন করতেন না।[১৯৯]

মোটকথা নবী (স.)-এর যুগে ফতোয়া চাওয়া ও ফতোয়া দেয়ার রীতি ছিল এই যে, লোকেরা বাস্তবে সংঘটিত বিষয়ে প্রশ্ন করতেন আর নবী (স.) সে বিষয়ে বিধান বলে দিতেন। একইভাবে পারস্পরিক বিষয়াদি এবং মোকাদ্দামাসমূহ তাঁর সম্মুখে পেশ করা হত, তিনি সেগুলোর সমাধান করে দিতেন। কাউকে ভালো কাজ করতে দেখলে প্রশংসা করতেন আর মন্দ কাজ করতে দেখলে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন।[২০০]

আওস ও খাযরাজের মাঝে সম্প্রীতি স্থাপন

বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ (স.)-এর আগমনের মধ্য দিয়ে মদীনার আওস ও খাযরাজ গোত্রের দীর্ঘ দিনের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের শান্তিপূর্ণ ও সম্মানজনক অবসান ঘটেছিল। এরপর আর কোন দিন তাদের মাঝে রেষারেষি কিংবা মারামারির ঘটনা ঘটেছে ইতিহাসে এমনটি পাওয়া যায় না।

মহানবী (স.) এর বিদায় হজ্জের ভাষণ

মহানবী (স.)-এর বিদায় হজ্জের ভাষণে যে দিকগুলো ফুটে ওঠেছে তার মধ্যে অন্যতম হল মুসলিম উম্মাহর একতা ও সংহতি। সহীহ মুসলিমের বর্ণনানুযায়ী বিদায় হজ্জের ভাষণ ছিল নিম্নরূপ:

أيّهَا النّاس، اسْمَعُوا منّي أُبّينْ لَكُمْ، فَإنّيَ لاَ أَدْرِي، لعَليّ لاَ أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامي هَذَا، في مَوْقِفي هذا، أَيُهَا النَّاس، إنّ دِمَاءَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليكُمْ حَرَامٌ إلى أنْ تَلْقَوْا رَبَّكُمْ، كَحُرمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا في شَهْرِ كُمْ هَذَا في بَلَدِكُم هَذَا وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت ، فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانةٌ فليؤُدِّها إلى مَنْ ائْتمَنَهُ عَلَيها، وإن كل ربا موضوع ولكن لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ، و قضى الله أنه لا ربا ، وإن ربا عمي العباس بن عبد المطلب موضوع كله وأن كل دم كان في الجاهلية موضوع

---

১৯৮. *প্রাগুক্ত*
১৯৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০-১১
২০০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১

وإن أول دمائكم أضع دم عامر ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ، فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية ، وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية والعمد قَوَدٌ ، وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر وفيه مائة بعير فمن ازداد فهو من الجاهلية. أما بعد أيها الناس فإن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به بما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم أيها الناس ﴿ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ﴾ إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض و﴿ إِنَ عِدَّةَ الشهور عند اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً ﴾ منها أربعة حرم ثلاثة متوالية ورجب مضر ، الذي بين جمادى وشعبان. أما بعد أيها الناس ، إن لِنسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حقاً، ولَكُمْ عَلَيْهِنّ حقّ، لَكُمْ عَليِنّ ألا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ غيرَكم وَلا يُدْخِلْنَ أحَداً تكرَهُونَهُ بيوتَكُمْ، ولا يأتينَ بِفَاحِشَة فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف واستوصوا بالنساء خيرا ، فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا ، وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله فاعقلوا أيها الناس قولي ، أَيهَا النّاسُ، إنّما المُؤمِنُونَ إخْوةٌ ، فَلاَ يَحِلُّ لامْرِىءٍ مَالُ أَخيهِ إلاّ عَنْ طيبِ نفْسٍ منهُ، أَلاَ هَلْ بلّغْتُ، اللّهُم اشْهَدْ، فلا تَرْجِعُنّ بَعْدِي كُفاراً يَضرِبُ بَعْضُكُمْ رقابَ بَعْض فَإنّي قَدْ تَركْتُ فِيكُمْ مَا إنْ أَخَذتمْ بِهِ لَمْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ، كِتَابَ اللهِ وَ سُنَّة نبيّه ، أَلاَ هَلْ بلّغتُ، اللّهمّ اشْهَدْ. أيها النّاسُ إن رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وإنّ أَبَاكُمْ واحِدٌ ، كُلكُّمْ لآدمَ وآدمُ من تُراب، إن أَكرمُكُمْ عندَ اللهِ أتْقَاكُمْ وليس لعربيّ فَضْلٌ على عجميّ إلاّ بالتّقْوى، أَلاَ هَلْ بلَّغْتُ، اللّهُمّ اشهد" قَالُوا: نَعَمْ قَال: فلْيُبَلِّغِ الشاهدُ الغائبَ والسلامُ عليكم ورحمة الله!

"হে মানব মন্ডলী!

তোমরা হৃদয়ের কর্ণে ও মনোযোগ সহকারে আমার বক্তব্য শ্রবণ কর। আমি জানি না, আগামী বছর এ সময়ে, এ- স্থানে, এ-নগরীতে তোমাদের সাথে আমার আর সাক্ষাৎ হবে কি না? "হে মানব সকল! সাবধান! সকল প্রকার জাহেলিয়াতকে আমার দু'পায়ের নিচে পিষ্ঠ করে যাচ্ছি। নিরাপরাধ মানুষের রক্তপাত চিরতরে হারাম ঘোষিত হল। প্রথমে আমি আমার বংশের পক্ষ থেকে 'রবিয়া বিন হারেস বিন আবদুল মোত্তালিবের' রক্তের দাবি প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। সে বনি লাইস গোত্রে দুধ পান করেছে, হুযাইল তাকে হত্যা করেছে।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে ‘সুদ’ কে চিরদিনের জন্য হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। আমি আজ আমার চাচা ‘আব্বাস ইবনে আব্দুল মোত্তালিবের’ যাবতীয় সুদের দাবি প্রত্যাহার করে নিচ্ছি।

হে লোক সকল! বল আজ কোন দিন? সকলে বলল “আজ মহান আরাফার দিন, আজ হজ্বের বড় দিন” সাবধান! তোমাদের একের জন্য অপরের রক্ত, তার মাল-সম্পদ, তার ইয্যত-সম্মান আজকের দিনের মত, এ হারাম মাসের মত, এ সম্মানিত নগরীর মত পবিত্র আমানত। সাবধান! মানুষের আমানত প্রকৃত মালিকের নিকট পৌঁছে দেবে।

হে মানব সকল! নিশ্চই তোমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ একজন, তোমাদের সকলের পিতা হযরত আদম (আ.)। আরবের ওপর অনারবের এবং অনারবের ওপর আরবের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, সাদার ওপর কালোর আর কালোর ওপর সাদার কোন মর্যাদা নেই। ‘তাকওয়াই’ শুধু পার্থক্য নির্ণয় করবে।

হে লোক সকল! পুরুষদেরকে নারী জাতীর ওপর নেতৃত্বের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। তবে নারীদের বিষয়ে তোমরা আল্লাহ তা’আলাকে ভয় কর। নারীদের ওপর যেমন পুরুষদের অধিকার রয়েছে তেমনি পুরুষদের ওপর রয়েছে নারীদের অধিকার। তোমরা তাদেরকে আল্লাহর যামিনে গ্রহণ করেছ। তাদের ওপর তোমাদের অধিকার হচ্ছে নারীরা স্বামীর গৃহে ও তার সতীত্বের মধ্যে অন্য কাউকেও শরিক করবে না, যদি কোন নারী এ ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করে, তবে স্বামীদেরকে এ ক্ষমতা দেয়া হচ্ছে যে, তারা স্ত্রীদের থেকে বিছানা আলাদা করবে ও দৈহিক শাস্তি দেবে, তবে তাদের চেহারায় আঘাত করবে না। আর নারীগণ স্বামী থেকে উত্তম ভরণ পোষণের অধিকার লাভ করবে, তোমরা তাদেরকে উপদেশ দেবে ও তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করবে।

হে উপস্থিতি! “মু’মিনেরা পরস্পর ভাই ভাই।” আর তারা সকলে মিলে এক অখণ্ড মুসলিম ভ্রাতৃ সমাজ। এক ভাইয়ের ধন-সম্পদ তার অণুমতি ব্যতিরেকে ভক্ষণ করবে না। তোমরা একে অপরের উপর যুল্ম করবে না।

হে মানুষেরা! শয়তান আজ নিরাশ হয়ে পড়েছে। বড় বড় বিষয়ে সে তোমাদের পথভ্রষ্ট করতে সমর্থ হবে না, তবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে তোমরা সর্তক থাকবে ও তার অনুসারী হবে না। তোমরা আল্লাহর বন্দেগী করবে, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, রমজান মাসের সিয়াম পালন করবে, যাকাত আদায় করবে ও তোমাদের নেতার আদেশ মেনে চলবে, তবেই তোমরা জান্নাত লাভ

করবে। সাবধান! তোমাদের গোলাম ও অধীনস্তদের বিষয়ে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর। তোমরা যা খাবে তাদেরকে তা খেতে দেবে। তোমরা যা পরবে তাদেরকেও সেভাবে পরতে দেবে। হে লোক সকল! আমি কি তোমাদের নিকট আল্লাহ তা'আলার পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি? লোকেরা বলল, "হ্যা" তিনি বললেন "আমার বিষয়ে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে, সে দিন তোমরা কী সাক্ষ্য দিবে? সকলে একবাক্যে বললেন, "আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 'আপনি আমাদের নিকট রিসালাতের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছেন, উম্মতকে সকল বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন, সমস্ত গোমরাহির আবরণ ছিন্ন করে দিয়েছেন এবং অহীর আমানত পরিপূর্ণভাবে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব পালন করেছেন।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স.) নিজ শাহাদাত আঙ্গুলি আকাশের দিকে তুলে তিনবার বললেন, "হে আল্লাহ তা'আলা আপনি সাক্ষী থাকুন, আপনি স্বাক্ষী থাকুন, আপনি সাক্ষী থাকুন"।

হে মানুষেরা! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সম্পদের মিরাস নির্দিষ্টভাবে বণ্টন করে দিয়েছেন। তার থেকে কম বেশি করবে না। সাবধান! সম্পদের তিন ভাগের এক অংশের চেয়ে অতিরিক্ত কোন অসিয়ত বৈধ নয়। সন্তান যার বিছানায় জন্ম গ্রহণ করবে, সে তারই হবে। ব্যভিচারের শাস্তি হচ্ছে প্রস্তরাঘাত। (অর্থাৎ সন্তানের জন্য শর্ত হলো তা বিবাহিত দম্পতির হতে হবে। ব্যভিচারীর সন্তানের অধিকার নেই)। যে সন্তান আপন পিতা ব্যতীত অন্যকে পিতা এবং যে দাস নিজের মালিক ব্যতীত অন্য কাউকে মালিক বলে স্বীকার করে, তাদের ওপর আল্লাহ তা'আলা, ফেরেশতাকুল এবং সমগ্র মানব জাতির অভিশাপ এবং তার কোন ফরয ও নফল ইবাদত কবুল হবে না। হে কুরাইশ সম্প্রদায়ের লোকেরা! তোমরা দুনিয়ার মানুষের বোঝা নিজেদের ঘাড়ে চাপিয়ে যেন কিয়ামতে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ না কর। কেননা আমি আল্লাহর আযাবের মোকাবিলায় তোমাদের কোন উপকার করতে পারবো না। তোমাদের দেখেই লোকেরা আমল করে থাকবে। মনে রেখ! সকলকে একদিন আল্লাহ তা'আলার নিকট হাজির হতে হবে। সে দিন তিনি প্রতিটি কর্মের হিসাব গ্রহণ করবেন। তোমরা আমার পরে গোমরাহিতে লিপ্ত হবে না, পরস্পর হানাহানিতে মেতে ওঠবে না। আমি আখেরী নবী, আমার পরে আর কোন নবী আসবে না। আমার সাথে অহীর পরিসমাপ্তি হতে যাচ্ছে। হে মানুষেরা! 'আমি নিঃসন্দেহে একজন মানুষ। আমাকেও আল্লাহ তা'আলার ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যেতে হবে। আমি তোমাদের জন্য দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি যতদিন তোমরা এ দু'টি বস্তু আঁকড়ে থাকবে, ততদিন তোমরা নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহর কিতাব ও অপরটি রাসূলের সুন্নাহ।'

হে মানব মন্ডলী! তোমরা আমির বা নেতার আনুগত্য করো এবং তাঁর কথা শ্রবণ করো যদিও তিনি হন হাবশী ক্রীতদাস। যতদিন পর্যন্ত তিনি আল্লাহর কিতাব অনুসারে তোমাদের পরিচালিত করেন, ততদিন অবশ্যই তাঁর কথা শুনবে, তাঁর নির্দেশ মানবে ও তাঁর প্রতি আনুগত্য করবে। আর যখন সে আল্লাহর কিতাবের বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করবে, তখন থেকে তাঁর কথাও শুনবে না এবং তাঁর আনুগত্যও করা যাবে না। সাবধান! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি থেকে বিরত থাকবে। জেনে রেখো, তোমাদের পূর্ববর্তীগণ এই বাড়াবাড়ির কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। (এ নির্দেশনাটি হচ্ছে অমুসলিমদের ক্ষেত্রে অর্থাৎ কোন বিধর্মীকে বাড়াবাড়ি বা জোরজবরদস্তি করে ইসলামে দীক্ষা দেয়া যাবে না। তবে একজন মুসলিমকে অবশ্যই পরিপূর্ণ ইসলামী জিন্দেগী অবলম্বন করে জীবন যাপন করতে হবে। এক্ষেত্রে সুবিধাবাদের কোন সুযোগ নেই)। আবার বললেন, আমি কি তোমাদের নিকট আল্লাহর দ্বীন পৌঁছে দিয়েছি? সকলে বললেন, "নিশ্চয়ই"। হে উপস্থিতগণ! অনুপস্থিতদের নিকট আমার এ পয়গাম পৌঁছে দেবে। হয়তো তাদের মধ্যে কেউ এ নসিহতের ওপর তোমাদের চেয়ে বেশি গুরুত্বের সাথে আমল করবে। "তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।"[২০১]

ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা

বিশ্ব নবী (স.) সামাজিক সম্প্রীতির পদক্ষেপ হিসেবে আল কুর'আনের মাধ্যমে মুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের সৃদৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করলেন। এতে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি মযবুত হল, প্রশাসন সুদৃঢ় হল। আর এ ভ্রাতৃত্ব যতদিন কোন সমাজে প্রতিষ্ঠিত থাকবে, ততদিন সে সমাজ বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি থেকে মুক্ত থেকে সম্প্রীতির বারিধারায় পরিণত হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"নিশ্চই মু'মিনরা পরস্পর ভাই ভাই। কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ- মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আশা করা যায় তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে।"[২০২] মহানবী (স.) বলেছেন:

---

২০১. *সহীহ মুসলিম* (ঢাকা,বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, প্রকাশকাল, মে-২০০১), খন্ড-০৪, হাদীস নং-২৮১৫
২০২. *আল কুর'আন*, প্রাগুক্ত

لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ

"তোমরা পরস্পরে হিংসা-বিদ্বেষ করবে না, প্রতারণামূলক দালালি করবে না, শত্রুতা করবে না, পরোক্ষ নিন্দাবাদে একে অন্যের পিছনে লাগবে না, একজনের দরের ওপর অন্যজন মাল দর করবে না। আর তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। এক মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাই। কেউ কারো প্রতি যুল্ম করবে না, কেউ কাউকে অপদস্ত করবে না, তুচ্ছ ভাববে না।" অতঃপর রাসূল (স.) নিজ হাত দিয়ে বুকের দিকে ইশারা করে তিনবার বললেন, "পরহেজগারী বা আল্লাহ ভীতি এখানে। মানুষের অনিষ্ট হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ঠ যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ ভাববে। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য পরস্পরের রক্ত, অর্থ ও মর্যাদা খর্ব করা হারাম।"[২০৩]

মহানবী (স.) আরো বলেছেন:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার প্রতি যুল্ম বা অবিচার করবে না এবং তাকে অকল্যাণের পথে ছেড়ে দেবে না। যে ব্যক্তি তার ভাই-এর প্রয়োজন পূরণে এগিয়ে আসল, আল্লাহ তা'আলা তার প্রয়োজন পূরণ করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের সঙ্কট দূর করবে আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে তার কিয়ামতের দিনের সঙ্কট দূর করে দেবেন, আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ গোপন রাখে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন।"[২০৪]

---

২০৩. *সহীহ মুসলিম*, বাবু তাহরীমি যুলমিল মুসলিমি ও খুয্লিহি (আল মাকতাবাতস শামিলাহ, প্রাগুক্ত), হাদিস নং- ৪৬৫০

২০৪. *সহীহ মুসলিম*, বাবু তাহরীমিজ যুল্মি, প্রাগুক্ত, হাদিস নং- ৪৬৭৭

ঐক্যের স্বার্থে ফিতনা এড়ানোর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

স্বয়ং বিশ্ব নবী (স.) ঐক্যের স্বার্থে ফিতনা এড়ানোর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। পবিত্র কা'বাকে জাহেলি যুগে সংস্কার করে হাতিমে কা'বাকে মূল ভবনের বাইরে রাখা হয়েছে। অথচ জাতির পিতা ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক নির্মিত কা'বায় হাতিম মূল ভবনের মধ্যেই ছিল। আর বিশ্ব নবী (স.) তা জানতেন। মক্কা বিজয়ের পর পবিত্র মক্কা নগরীর সর্বময় ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব নবী (স.) ও মুসলিমদের হাতে তুলে দেন। এরপরও বিশ্ব নবী (স.) ফিতনার আশংকায় কা'বার হাতিমকে আগের জায়গায়ই রেখে দিলেন। ইবরাহীম (আ.)-এর নকশায় পুনর্নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। বরং তিনি বলেছিলেন, "হে আয়শা তোমার জাতির পক্ষ থেকে যদি বিরুদ্ধাচরণের আশংকা না থাকতো তাহলে আমি কা'বাকে হযরত ইবরাহীম (আ.) এর নকশায় পুনর্নির্মাণ করতাম।"[২০৫]

---

২০৫. *প্রাগুক্ত*

যুগে যুগে মতৈক্যের সোনালী ঘটনাবলী

যুগে যুগে মতৈক্যের ঐতিহাসিক বহু সোনালী ঘটনাবলী রয়েছে, এর কয়েকটি মাত্র নমুনাস্বরূপ নিম্নে তুলে ধরা হলঃ-

প্রথম ও দ্বিতীয় খলিফা নির্বাচন

বিশ্বনবী (স.)-এর ইন্তেকালের পর প্রথম খলিফা হিসেবে আবু বকর আসসিদ্দীক (রা.)-কে খলিফা হিসাবে নির্বাচিত করা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। মুসলিম জাহানের খলিফা নির্বাচনে না ছিল কোন দলাদলি না ছিল কোন মারামারি ও হতাহতের ঘটনা। স্বতঃস্ফূর্তভাবে হযরত আবু বকর আসসিদ্দীক (রা.)-কে খলিফা নির্বাচন করা হয়। তিনি প্রথমত খলীফা হতে চাননি, বলা চলে সাহাবায়ে কিরাম তাঁকে খলীফা হতে বাধ্য করেছেন। তাঁর ইন্তেকালের পর হযরত ওমর ইবন খাত্তাব (রা.)-কেও খলিফা নির্বাচনের ঘটনা ছিল তেমনি স্বর্ণোজ্জ্বল ঘটনা। যেখানে ছিল সকলের মতৈক্য।

হিজরী সন প্রবর্তনের বিষয়ে ঐক্যমত্য

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, যখন আমীরুল মু'মিনিন হযরত ওমর ইবনু খত্তাব (রা.) সন প্রবর্তন এর সিদ্ধান্ত নেন তখন তিনি পরামর্শ সভার আহবান করেন। সভায় হযরত সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস (রা.) রাসূল (স.)-এর ওফাতকালীন সময় থেকে সন গণনা প্রস্তাব দেন। হযরত তালহা নবুওয়্যাতের বছর থেকে গণনার জন্য অভিমত ব্যক্ত করেন। কেউ কেউ বিশ্ব নবীর জন্ম তারিখ থেকে গণনার প্রস্তাব করেন। হযরত আলী (রা.) হিজরতের ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে বর্ষ গণনার প্রস্তাব দেন। তারপর তাঁরা দীর্ঘ আলোচনা পর্যালোচনা করে হযরত আলী (রা.)-এর প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেন। এরপর কোন মাস থেকে শুরু হবে এ নিয়েও মতপার্থক্য দেখা দেয়, হযরত আব্দুর রহমান ইবন আউফ (রা.) রজব মাস থেকে শুরু করার প্রস্তাব দেন, কেননা এটি চারটি সম্মানিত মাসের মধ্যে প্রথমে আসে। হযরত তালহা (রা.) রমযান থেকে শুরু করার কথা বলেন, কেননা তা কুর'আন নাযিলের মাস। হযরত আলী ও হযরত ওসমান (রা.) মহররম মাস থেকে শুরু করার পরামর্শ দেন। অবশেষে সর্বসম্মতিক্রমে মহররম মাস ধরে হিজরী সন প্রবর্তন করা হয়।

নবী (স.) এর যুগে সাহাবায়ে কিরাম

নবী কারীম (স.) সাধারণত মাসায়েল এবং আহকামে শরীয়াহ সাহবায়ে কিরামের সাধারণ মজলিশে বর্ণনা করতেন। একেকজন সাহাবী নবী কারীম (স.) কে যে তরীকায়

ইবাদাত করতে দেখেছেন এবং তাঁর কাছ থেকে যেভাবে ফতোয়া ও ফায়সালা শুনেছেন, তিনি তা আয়ত্ত করে নেন এবং সেভাবে আমল করতে থাকেন। অতঃপর তিনি নবী কারীম (স.) এর এসব বক্তব্য ও আমলকে অবলম্বন করে পরিবেশ পরিস্থিতি ও অবস্থার বিচারে সেগুলোর উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব নির্ণয় করতেন। এ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই কাজ করত 'ঐকান্তিক নিষ্ঠা'। এভাবে তারা কোনো হুকুমকে নির্ণয় করেন 'মুবাহ'। কোনটিকে 'মুস্তাহাব' ও কোনটিকে 'মানসূখ' হিসেবে। এ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দার্শনিক দলিল প্রমাণ নয়, বরঞ্চ তাদের মনের প্রশান্তি ও প্রসন্নতাই ভূমিকা পালন করে।[২০৬] যেমন, আমরা সরল সোজা গ্রাম্য লোকদের অবস্থা দেখতে পাচ্ছি। তারা অতি সহজেই পরস্পরের কথা বুঝে ফেলেন। অনুরূপভাবে তাঁরা একজন অপরজনের কথার মধ্যকার ইশারা-ইঙ্গিত, উপমা-উদাহরণ এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দ্বারা তাঁর বক্তব্য বিষয়কে নির্দ্বিধায় বুঝে নিতে পারতেন। রাসূলে আকরাম (স.)-এর যুগ পর্যন্ত এভাবেই লোকেরা আমল করতেন।[২০৭]

খেলাফতে রাশেদার শাসনকাল

খিলাফতে রাশেদার যুগ ছিল মানুষের অধিকার বাস্তবায়নের সোনালী যুগ। খিলাফতে রাশেদা মহানবী (স.) এর প্রতিষ্ঠিত শাসননীতি এবং শাসন কার্যক্রমেরই একনিষ্ঠ উত্তরাধিকার। নববী শাসনে মানুষের ইহজাগতিক কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যাভিসারী জীবন নীতি ও শাসন ব্যবস্থার যে কুঁড়ি প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল, খিলাফতে রাশেদার শাসনে সে ফুলই পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে। শাসন কার্যক্রমের একটা মূল বিষয় হলো অধিকার, যেমন নাগরিকদের ওপর রাষ্ট্রের অধিকার, রাষ্ট্রের ওপরে নাগরিকদের অধিকার। রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধর্মের লোক থাকতে পারে, বিদ্রোহীও থাকতে পারে। রাষ্ট্রের ওপর তাদের কী অধিকার থাকবে এবং তাদের ওপর রাষ্ট্রের কী অধিকার থাকবে, এসবও শাসন কার্যের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাছাড়া দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ ও শান্তিকালীন পারস্পরিক কী অধিকার থাকবে? তাও রাষ্ট্রের শাসন নীতির একটা অংশ। এসব অধিকারের ভিত্তিতেই একটি রাষ্ট্র তার অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন করে থাকে। কিন্তু ইসলামে এ অধিকারসমূহ ও আইনের উৎস শাসক বা সরকার নয়। সরাসরি আল্লাহর ওহী আল কুর'আন এবং মহানবী (স.) এর সুন্নাহ হলো এসব অধিকার নির্ধারণ ও আইনগত মূলনীতির উৎস। খিলাফতে রাশেদার শাসননীতি ও শাসন কার্যক্রমের মূল উৎস ছিল এ আল কুর'আন ও সুন্নাহ। আইন বড় কথা নয়। তার চেয়ে বড় কথা হল আইনের অনুসরণ ও বাস্তবায়নের ওপরই অধিকারসমূহের সংরক্ষণ নির্ভর করে থাকে। আর আইনের অনুসরণ ও বাস্তবায়ন নির্ভর করে জবাবদিহিতার ওপর। এ ক্ষেত্রে ইসলামি

---

২০৬. *মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিকপন্থা অবলম্বনের উপায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
২০৭. *প্রাগুক্ত*

রাষ্ট্র ও মুসলিমরা অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার সদা জাগরুক অনুভূতি এবং পরকালে পুরস্কারের আশা ও শাস্তির ভয় মুসলিমদেরকে আইনের অনুসরণ ও বাস্তবায়নে সঠিক পথে পরিচালিত করে। ধর্মহীন, ধর্মনিরপেক্ষ এবং নামমাত্র ধর্মানুসারীদের এ সুযোগ নেই বলে আইনের প্রণয়ন, অনুসরণ ও বাস্তবায়নে তারা চরম স্বেচ্ছাচারী হয়ে থাকে। ইসলামী রাষ্ট্র কল্যাণধর্মী হওয়ার এবং অনৈসলামিক রাষ্ট্র নিপীড়নমুখী হওয়ার এটাই মূল কারণ। খেলাফতে রাশেদার যুগ ছিল ইসলামের স্বর্ণযুগ, তাই নাগরিক অনাগরিক, মুসলিম অমুসলিম, শত্রু মিত্র নির্বিশেষে মানবাধিকার বাস্তবায়নেরও স্বর্ণযুগ ছিল খিলাফতে রাশেদার যুগ।[২০৮]

মহান রব্বুল 'আলামীনের গোটা সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু মানুষ। সৃষ্টির সব আয়োজন মানুষকে কেন্দ্র করেই। আকাশ-বাতাস, তৃণলতা, পশু-পাখি, রোদ-বৃষ্টি, গাছ-পালা সব মানুষেরই প্রয়োজনে। আল্লাহ তা'আলা কুর'আনুল কারীমে ঘোষণা করেছেন:- هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا "তিনি এমন সত্ত্বা যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব সৃষ্টি করেছেন।"[২০৯] এ কারণেই মানুষ আল্লাহর খলিফা, আল্লাহর প্রতিনিধি, আল্লাহর পক্ষ হতে সৃষ্টি জগতের শাসক। খিলাফতের এ দায়িত্ব কোন বিশেষ মানুষের নয়, কোন বিশেষ গ্রুপের নয়, প্রতিটি মানুষের ওপরে খিলাফতের এ দায়িত্ব ন্যস্ত। খলিফা হিসেবে প্রত্যেকে একে অপরের সমান। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"আর স্মরণ কর যখন তোমার রব ফিরিশতাদেরকে বললেন, 'আমি যমীনে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি।' তারা বলল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে অশান্তি সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে? আমরাইতো আপনার প্রশংসামূলক তাসবীহ পাঠ ও পবিত্রতা ঘোষণা করি।' তিনি বললেন, 'আমি যা জানি তোমরা তা জান না'।"[২১০]

সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনে এবং যোগ্যতা ও সুযোগের অসমতার কারণে মানুষের মধ্যে কেউ শাসক, কেউ শাসিত, কেউ ধনী, কেউ গরীব হতে পারে। কিন্তু মানুষ হিসেবে তার মৌলিক অধিকারগুলো পাওয়া এবং সকল ব্যাপারে সুবিচার লাভ করা তার অলঙ্ঘনীয়

---

২০৮. *প্রাগুক্ত*
২০৯. আল কুরআন, ০২:২৯
২১০. আল কুরআন, ০২:৩০

অধিকার। ইসলামি ব্যবস্থাতেই মাত্র মানুষের এ অধিকার নিশ্চিত হয়েছে। এ নিশ্চয়তার স্বর্ণযুগ খিলাফতে রাশেদার শাসনকাল।[২১১]

শায়খাইনের সময়কাল

রাসূলুল্লাহ (স.) সাধারণত সাহাবাগণের সভাতেই দ্বীনি কথাবার্তা বলতেন এবং শিক্ষা প্রদান করতেন। সে কারণেই দেখা যায়, শায়খাইন [হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত ওমর (রা.)] তাঁদের খিলাফতকালে কোন বিষয়ের শরয়ী সমাধান জানা না থাকলে তা অন্যান্য সাহাবাদের নিকট থেকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতেন। তাঁরা জিজ্ঞেস করতেন 'তোমরা কেউ এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর কোন বক্তব্য শুনেছো'?

হযরত আবু বকর (রা.)-এর সম্মুখে যখন ওয়ারিশী পাওয়া সংক্রান্ত মাস'আলা উপস্থাপিত হল, তখন তিনি বললেন, 'দাদীর অংশ পাওয়া সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে কোন বানী শুনিনি। তাই এ বিষয় সম্পর্কে আমি অন্যদের কাছে জিজ্ঞেস করে নেব।' অতঃপর যোহর সালাতের পর তিনি সমবেত লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কেউ দাদীর ওয়ারিশী পাওয়া সম্পর্কে রাসূল (স.) থেকে কোন বক্তব্য শুনেছ কি?'

মুগিরা ইবন শো'বা (রা.) বললেন, 'হ্যাঁ, আমি শুনেছি।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কী শুনেছ?' মুগীরা (রা.) বললেন, 'রাসূল (স.) দাদীকে মৃতের রেখে যাওয়া সম্পদের এক ষষ্ঠাংশ প্রদান করেছেন।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'বিষয়টি তুমি ব্যতীত আর কারো জানা আছে?' মুহাম্মাদ ইবন মাসলামা (রা.) বললেন, ' মুগীরা যথার্থই বলেছেন।'

তাদের বক্তব্য শুনার পর হযরত আবু বকর (রা.) আবেদনকারী মহিলাকে তার মৃত নাতির রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ দিয়ে দেন।[২১২]

এরূপ দু'একটি নয়, অসংখ্য ঘটনা হাদীসের গ্রন্থাবলীতে উল্লেখ আছে। যেমন, হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট গর্ভস্থ সন্তানের দিয়্যতের (রক্তমূল্য) বিষয়টি উত্থাপিত হলে এ বিষয়ে তার কোনো বিধান জানা না থাকায় তিনি এ প্রসঙ্গে সাহাবায়ে কিরামের নিকট প্রশ্ন করেন। জবাবে মুগীরা ইবন শু'বা (রা.) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা.) এর রক্তমূল্য নির্ধারণ করেছেন 'গুররাহ'।[২১৩] তাঁর নিকট এ বিষয়ে নবী কারীম (স.)-এর হাদীস শুনার পর হযরত ওমর (রা.) সে মুতাবিক ফায়সালা প্রদান করেন।[২১৪]

---

২১১. *প্রাগুক্ত*
২১২. *মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিকপন্থা অবলম্বনের উপায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
২১৩. 'গুররা' একজন দাস মুক্ত করা কিংবা মৃতের ওলীকে পঞ্চাশ দিনার বা পাঁচশ দিরহাম প্রদান করা।
২১৪. *মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিকপন্থা অবলম্বনের উপায়*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩

মহামারী আক্রান্ত অঞ্চলের ওপর দিয়ে সফর করা যাবে কিনা এ বিষয়ে হযরত ওমর (রা.) আব্দুর রহমান ইবন আউফ (রা.) বর্ণিত হাদীসের ওপর আমল করেন।

ঘটনাটি হলো, 'সিরিয়া অভিযানের সময় হযরত ওমর (রা.) মুসলিম বাহিনী নিয়ে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে কোনো এক স্থানে গিয়ে জানতে পারেন সম্মুখের অঞ্চলগুলো ব্যাপক মহামারীতে (প্লেগ) আক্রান্ত। যাত্রা অব্যাহত রাখা না রাখার ব্যাপারে তিনি উপস্থিত লোকদের পরামর্শ চাইলেন। হযরত আব্দুর রহমান ইবন আউফ (রা.) এসে বললেন, 'নবী কারিম (স.) মহামারী আক্রান্ত অঞ্চলে যেতে নিষেধ করেছেন।' এ হাদীস শুনে তিনি বাহিনীকে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেন।[২১৫]

মাজূসীদের (অগ্নিপূজারী) ব্যাপারেও তিনি হযরত আব্দুর রহমান ইবন আউফ (রা.) এর বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী ফায়সালা করেন।[২১৬]

হযরত ওমর (রা.) তাঁর খিলাফত আমলে মাজূসীদের থেকে জিযিয়া আদায় করছিলেন না। অতঃপর আব্দুর রহমান ইবন আউফ (রা.) বললেন, 'নবী কারীম (স.) হিজরের মাজূসীদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায় করতেন।' এ হাদীস শুনার পর তিনি তাদের ওপর জিযিয়া ধার্য করে দিলেন।[২১৭]

আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) মা'কাল ইবন ইয়াসার (রা.) বর্ণিত হাদীস স্বীয় রায়ের সম্পূর্ণ সমার্থক পেয়ে সীমাহীন খুশী হন। এ রায় ছিলো এমন একজনের ব্যাপারে যার স্বামী এমন অবস্থায় মারা গিয়েছেন যে, এখনো তিনি স্ত্রী-এর সান্নিধ্যে আসেননি এবং তার মোহরও ধার্য করেননি।[২১৮]

হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা.) কোনো প্রয়োজনে ওমর ফারুক (রা.)-এর কাছে আসেন। দরজায় তিনবার আওয়াজ দেবার পরও কোনো জবাব না পেয়ে তিনি প্রত্যাবর্তন করছিলেন। অতঃপর ওমর (রা.) দরজা খুলে দূর থেকে তাঁকে ডেকে আনেন এবং ফিরে যাবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বললেন, নবী কারীম (স.) বলেছেন, "তিনবার আওয়াজ দেওয়ার পরও অনুমতি পাওয়া না গেলে দরজা থেকে ফিরে যাবে।" ওমর (রা.) বললেন, 'তোমার বর্ণনার স্বপক্ষে আরেকজন সাক্ষী লাগবে। অতঃপর আবূ সায়ীদ খুদরী (রা.) আবূ মূসা (রা)-এর বর্ণিত হাদীসের সত্যতা স্বীকার করলে হযরত ওমর (রা.) তা গ্রহণ করেন।[২১৯]

---

২১৫. *প্রাগুক্ত*
২১৬. *প্রাগুক্ত*
২১৭. *প্রাগুক্ত*
২১৮. *প্রাগুক্ত*
২১৯. *প্রাগুক্ত*

হাজ্জাজের পিছনে ইব্ন ওমর (রা.) এর সালাত আদায়

ঐক্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করেই যালিম শাসক হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফের পিছনে আব্দুল্লাহ ইব্ন ওমর (রা.) সালাত আদায় করেছিলেন। একজনের প্রশ্নের জবাবে ইব্ন ওমর (রা.) বলেছিলেন, "এ উম্মাহ হল একটি শরীরের মত, একে আমি টুকরা টুকরা করতে পারি না। আমি ঘরে গিয়ে সে সালাত পুনরায় পড়ে থাকি।"

হযরত ইমাম শাফেয়ী (র.) এর ঘটনা

ইমাম শাফেয়ী (র.) যখন কুফায় আসেন তখন একই সালামে বিতরের তিন রাকাআত নামাজ পড়েন এবং ইমামের পিছনে সালাত আদায় করার সময় সূরায়ে ফাতিহা পড়া থেকে বিরত থাকেন। নিজের মাযহাবের বিপরীতে সালাত আদায়ের কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, "ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর কবরের কাছে তাঁর মতের বিরোধীতা করতে আমার লজ্জা হয়।"

আল্লামা হোসাইন আহমাদ মাদানী ও আল্লামা আশরাফ আলী থানভী (র.)

ঢাকাস্থ জামেআ এমদাদিয়া মাদরাসার মহাপরিচালক মাওলানা আবু তাহের জিহাদী পূর্বেকার ভারত বর্ষের আলেমদের মাঝে চিন্তার কেমন একতা এবং একজনের প্রতি আরেকজনের কেমন শ্রদ্ধাবোধ ছিল তা উল্লেখ করতে গিয়ে খ্যাতিমান দু'জন আলেমের কথা উল্লেখ করেন। একবার এক লোক আল্লামা হোসাইন আহমাদ মাদানী সাহেবকে এসে বললেন, 'হুজুর আপনি কিস্তি টুপি পরিধান করেন অথচ মাওলানা আশরাফ আলী থানভী পাঁচ কল্লি টুপি পরিধান করেন, যা দেখতেও ভাল দেখায় না!' তাতক্ষনিক তিনি বললেন, 'আসলে পাঁচ কল্লি টুপিটাই সুন্দর কিন্তু আমি ছোট বেলা থেকেই এ টুপি পরিধান করে অভ্যস্থ হবার কারণে এটাই পরিধান করি।' সে একই ব্যক্তি আল্লামা আশরাফ আলী থানভীর কাছে গিয়েও বলল, 'আপনি পাঁচ কল্লি টুপি পরিধান করেন, আর হোসাইন আহমাদ মাদানী কিস্তি টুপি পরিধান করেন!' তিনি বলে উঠলেন, মাওলানা হোসাইন আহমাদ মাদানির কিস্তি টুপিই সুন্দর, কিন্তু আমি ছোট বেলা থেকে এ টুপি পরিধান করে অভ্যস্থ হবার কারণে এটাই পরিধান করছি।'

পশ্চিমা অমুসলিমদের দ্বি-মূখী নীতি

বাংলা ভাষায় 'মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশি' বলে একটা প্রবাদ আছে। হঠাৎ মায়ের চেয়ে যখন মাসী বেশি দরদী হয়ে যান, তখন তার পেছনে একটা মতলব থাকে-এ কথা

বলাই এ প্রবাদের লক্ষ্য। প্রবাদের এ বক্তব্যের সাথে পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদ্যাবিদদের আচরণের একটা মিল আছে। ওরা এখন গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের সাংঘাতিক প্রবক্তা সেজেছে। আর ইসলামকে মানবতাবিরোধী ও মধ্যযুগীয় এবং চরমপন্থী ও অসহিষ্ণু বলা হচ্ছে। অথচ এই সেদিন মাত্র ১৯৪৮ সালে ওরা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে মানবাধিকার আইন পাস করায়। অন্যদিকে সেই ৬১০ খ্রিস্টাব্দে মহানবী (স.) ঘোষণা করেছেন যে, বংশ, জাতি, নির্বিশেষে সব মানুষই সমান। শুধু ঘোষণা করা নয়, তাঁর এবং খিলাফতে রাশেদার আমল এ ঘোষণা বাস্তবায়নের স্বর্ণযুগ ছিল। অহঙ্কারে অন্ধ প্রাচ্যবিদরা যুদ্ধবন্দীদের অধিকার সম্পর্কে বিশ শতকের মাঝামাঝি আইন বিধিবদ্ধ করে, অথচ ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে মহানবী (স.) বদর যুদ্ধের পর যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে বিধিনিয়ম নির্ধারণ করেন যে, বিজয়ী সৈনিকরা না খেয়ে হলেও যুদ্ধবন্দীদের খাওয়াবেন।[২২০]

মাত্র ১৮৬৩ সালে এসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাসত্ব প্রথা বন্ধ হয়। এ প্রথাবন্ধ করার আইন পাস করতে যে গৃহযুদ্ধ লেগেছিল, তাতে সোয়া ৬ লাখ মানুষ নিহত হয়। অথচ তাদের সাড়ে তেরশ বছর আগে প্রিয় নবী (স.) দাসপ্রথা বিলুপ্তির সূচনা করেন এবং দাসরা মুক্ত হতে থাকে। ইসলাম এও বিধান করে যে, একজন দাস মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তার খাওয়া, পরা ইত্যাদি সংক্রান্ত অধিকার তার মালিকের সমপর্যায়ে হবে। এমনকি কোন যুদ্ধবন্দী যদি শিক্ষিত হত তাহলে কয়েকজন মুসলিম বাচ্চাকে অক্ষর জ্ঞান শিক্ষা দেয়ার বিনিময়ে তাকে মুক্তি দিয়ে দেয়া হত।

১৮৩৫ সালে মার্কিন মেয়েরা তাদের জন্য প্রথম স্কুলে যাবার সুযোগ পায়। অন্যদিকে ইসলাম ১৪শ বছর আগেই মেয়েদের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে।

১৮৪৮ সালে মার্কিন মেয়েরা সম্পত্তি ভোগের অধিকার লাভ করে। আর ইসলাম তার শুরুতেই পিতা, স্বামী প্রমুখ আত্মীয়ের সম্পত্তিতে নারীর অধিকার সুনির্দিষ্ট করে দেয়। আল্লাহ তা'আলা সূরা আন নিসার ১১ ও ১২ নং আয়াতে এ বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। ভোটাধিকারও মার্কিন মেয়েরা পায় মাত্র ১৯২০ সালে। আর মুসলিম মেয়েরা এ রাজনৈতিক অধিকার পেয়েছে পুরুষদের সাথে সাথেই। এ হতচ্ছাড়া অবস্থা যে পাশ্চাত্যের, সে পাশ্চাত্য আজ ইসলামকে মানবাধিকার শেখাতে চায়। পাশ্চাত্যের এ অজ্ঞতার কারণ পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিজীবিদের সত্য গোপন। ওদের আন্তর্জাতিক আইন রচনার ইতিহাস শুরু গ্রিসের নগর রাষ্ট্র দিয়ে। তারপর রোমান সভ্যতার বর্ণনা দিয়ে তারা লাফ দিয়ে চলে আসে আধুনিক যুগে। মাঝখানের ইসলামি

---

২২০. আবুল আসাদ, *একুশ শতকের এজেন্ডা* (ঢাকা, আইসিএস অনলাইন লাইব্রেরী, প্রকাশকাল-ফেব্রুয়ারী ২০০৫), পৃ.০৫

সভ্যতার অবদানের কথা তারা ভুলে যান অথবা সেদিক হতে তারা চোখ ফিরিয়ে রাখেন। অথচ ইতিহাস সাক্ষী, গ্রীক ও রোমান সভ্যতায় ইসলামের মত আন্তর্জাতিক আইনের গণতান্ত্রিক ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ছিল না। পাশ্চাত্যের এ অন্ধত্বতাড়িত প্রোপাগান্ডার কারণেই এবং মুসলিম দেশসমূহে ইসলামের পূর্ণ অনুশীলন না থাকার ফলেই ইসলামের মানবাধিকার ও অন্যান্য বিষয়ে বার বার আমাদেরকে নতুন করে কথা বলার জন্য চেষ্টা করতে হয়। চেষ্টা করতে হয় মানুষের জন্য স্রষ্টার মনোনীত শেষ জীবন বিধান ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরতে। অন্যান্য সব দিকের মত মানবাধিকার প্রশ্নেও ইসলাম মানুষকে সর্বোচ্চ আসন দিয়েছে।[২২১]

---

২২১. *প্রাগুক্ত*

ষষ্ঠ অধ্যায়

অনৈক্যের সূত্রপাত ও তার ইতিহাস

অনৈক্য বনাম মতপার্থক্য

ঐক্যের বিপরীত কর্মই অনৈক্য। অনৈক্য সব সময়ই ক্ষতিকর। কোন মহৎ কাজ সম্পাদনের জন্য ঐক্যের বিকল্প নেই। কিন্তু সেখানে যদি অনৈক্যের সৃষ্টি হয় তবে সে মহৎ কাজ আর সম্পাদন হয়ে ওঠে না। মুসলিম উম্মাহর সৃষ্টি মানবতার কল্যাণের জন্য, কিন্তু আজ সে মানবতার কাঙ্ক্ষিত কল্যাণ করতে পারছে না শুধু মাত্র অনৈক্যের কারণে। নিম্নে ইখতেলাফ, ইফতেরাক্বসহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করা হল:-

ইখতেলাফ (মতপার্থক্য)

ইখতেলাফ শব্দটি আরবী। এর প্রকৃত অর্থ ভিন্নতা, পার্থক্য, অসঙ্গতি ও বৈপরীত্য প্রভৃতি।[২২২] ফিক্‌হ শাস্ত্রে 'ইখতেলাফ বলতে দীনের যে কোন ব্যবহারিক বিষয়ে শর'য়ী দলীলের ভিত্তিতে মুজতাহিদ ইমামগণের পরস্পর ভিন্নমত পোষণ করাকে বুঝানো হয়। সে ভিন্নমত তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের কারণে হতে পারে, কিংবা দলীলের দ্ব্যর্থকতা বা প্রচ্ছন্নতার কারণে হতে পারে অথবা দলীল সংক্রান্ত জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণেও হতে পারে।[২২৩]

ইসলামে মতপার্থক্যের বিধান

কুর'আনের বহু আয়াত ও বিশ্ব নবী (স.)-এর বহু হাদিসে সকল মু'মিনকে একত্রিত থাকতে এবং পরস্পর মতপার্থক্য না করতে দ্ব্যর্থহীনভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কোন কোন আয়াত ও হাদীসে মতপার্থক্যে লিপ্ত হবার কঠিন পরিণতি সম্পর্কেও লোকদের সতর্ক করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا
كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

---

২২২. ড. আহমদ আলী, *তুলনামূলক ফিকহ* (ঢাকা, বাংলাদেশ ল'রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড, প্রকাশকাল- অক্টোবর ২০১৮), খন্ড-০১, পৃ. ৯২

২২৩. *প্রাগুক্ত*

“তোমরা বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁর অভিমুখী হও এবং তাঁকেই ভয় কর। সালাত কায়েম কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। যারা তাদের দ্বীনকে বিভক্ত করে ফেলেছে এবং বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে গেছে। আর প্রত্যেক দল নিজদের কাছে যা আছে তাই নিয়ে উল্লসিত।”[২২৪] এর ব্যাখ্যায় তাফসীরে আহসানুল বায়ানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সত্য ধর্ম পরিত্যাগ করে অথবা নিজেদের মনমত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করে তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। যেমন কেউ ইহুদী, কেউ খ্রিষ্টান, কেউ অগ্নিপূজক ইত্যাদী। তাদের প্রত্যেক দল ধারণা করে যে, তারাই সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত আছে, আর অন্যরা আছে ভ্রান্ত পথে। আর যে যুক্তি তারা খাড়া করে রেখেছে এবং যাকে তারা প্রমাণ বলে আখ্যায়িত করে, তা নিয়ে তারা হর্ষোৎফুল্ল ও সন্তুষ্ট আছে। দুঃখের বিষয় যে, বর্তমানে মুসলিমদের অবস্থাও অনুরূপ হয়ে পড়েছে। তারাও বিভিন্ন মাযহাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং প্রত্যেক মাযহাব ঐ বাতিল ধারণানুযায়ী নিজেকে হকপন্থী মনে করে খোশ আছে। অথচ হকপন্থী শুধু একটি দলই আছে; যার পরিচয় দিয়ে মহানবী (স.) বলেছেন, ‘তারা আমার ও আমার সাহাবীদের তরীকা অনুসারী হবে।’[২২৫] আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ

“সেটা এজন্য যে, আল্লাহ সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছেন এবং যারা কিতাব সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করেছে তারা গভীর বিরোধের মধ্যে (লিপ্ত) রয়েছে।”[২২৬] নবীজী (স.) বলেছেন:

وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ

“আর তোমরা মতবিরোধ করো না। কেননা এতে তোমাদের অন্তরগুলোর মধ্যেও দূরত্ব তৈরী হবে।”[২২৭] নবী (স.) আরো বলেছেন:

وَلَا تَخْتَلِفُوا فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا

“তোমরা ইখতেলাফ করো না, কারণ তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির লোকেরা (কিতাব নিয়ে) ইখতেলাফ করেছে এবং ধ্বংস হয়েছে।”[২২৮] নবী (স.) আরো বলেছেন:

إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ فِي الْكِتَابِ

“নিশ্চই তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো কেবল এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে যে, তারা (আল্লাহর) কিতাব নিয়ে মতবিরোধ করত।”[২২৯] উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ থেকে জানা যায় যে, ইসলামে যে কোন বিষয়ে- চাই তা আক্বীদা সংক্রান্ত ব্যাপার হোক কিংবা আমল সংক্রান্ত ব্যাপার- মতভেদ করার কোন নীতিগত ভিত্তি নেই।

---

২২৪. আল কুর'আন, ০২:১৭৬
২২৫. *তাফসীর আহাসানুল বায়ান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯৮
২২৬. আল কুর'আন, ৩০:৩১-৩২
২২৭. *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খন্ড-০২, হাদীস নং-৬৫৪
২২৮. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩২১৭
২২৯. *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৮১৮

বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা এবং স্বার্থপ্রণোদিত কংবা প্রবৃত্তিতাড়িত যে কোন বিরোধিতা ইসলামের দৃষ্টিতে চরমভাবে নিন্দনীয়।[২৩০]

তবে একথাও অনস্বীকার্য যে, মানুষে মানুষে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য থাকা স্বভাবগত ব্যাপার। সকলের মূল্যায়ন ক্ষমতা, পর্যবেক্ষণ যোগ্যতা ও বুদ্ধি বিবেচনাও এক নয়। কাজেই ক্ষেত্র বিশেষে যে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিবে- একথা বলাই বাহুল্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

"এবং যদি তোমার রবের ইচ্ছা হত তাহলে তিনি সকল মানুষকে একই মতাবলম্বী করে দিতেন, কিন্তু সর্বদা তারা মতভেদ করতেই থাকবে। তবে যাদের প্রতি তোমার প্রতিপালক দয়া করেন তাদের কথা আলাদা, তিনি তাদেরকে এজন্যই সৃষ্টি করেছেন। আর 'আমি জিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবই', আপনার রবের এ কথা পূর্ণ হয়েছে।"[২৩১]

উক্ত আয়াত থেকে জানা যায় যে, দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য ও বুদ্ধি-বিবেচনাগত তারতম্যের কারণে বিভিন্ন বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে যে মতভিন্নতা দেখা দেয়, তা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি নৈপুণ্যের একটি নিদর্শন এবং স্বাভাবিক নিয়মেই তা তৈরী হয়। এরূপ মতভিন্নতা অবশ্যই দোষণীয় নয়। যদি তা বিশুদ্ধ দলীল ও যুক্তিনির্ভর হয় এবং শিষ্টাচার ও নীতিবির্বজিত না হয়। ক্ষেত্রবিশেষ তা উপকারীও বটে।[২৩২]

ইফতেরাক বা দলাদলি

ইসলামে ইফতেরাক বা দলাদলি হারাম। দ্বীনের মধ্যে বিভক্তি ও দলাদলি এমন একটি ভয়ঙ্কর বিষয় যে, এ সম্পর্কে সকল নবী এবং রাসূলকেই সতর্ক করা হয়েছে। বিশ্ব নবী (স.) বলেছেন:

دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعَرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَفَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِمَا يُثَبِّتُ ذَاكُمْ لَكُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ

"তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের রোগ তোমাদের মধ্যেও সংক্রমিত হচ্ছে। তা হল পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ও ক্রোধ। আর এ রোগ মুণ্ডন করে দেয়। আমি বলছি না যে, চুল মুণ্ডন করে দেয়, বরং এটা দ্বীনকে মুণ্ডন (ধ্বংস) করে দেয়। সে মহান

---

২৩০. ড. আহমদ আলী, *তুলনামূলক ফিকহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩
২৩১. আল কুর'আন, ১১:১১৮-১১৯
২৩২. ড. আহমদ আলী, *তুলনামূলক ফিকহ*, প্রাগুক্ত

সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন! তোমরা ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তোমরা যদি পরস্পরকে না ভালবাস তাহলে ঈমানদার হতে পারবে না। আমি কি তোমাদেরকে বলবো না যে, পারস্পরিক ভালবাসা কোন কাজের মাধ্যমে মযবুত হয়? তোমরা পরস্পরের মাঝে সালামের বিস্তার ঘটাও।"[২৩৩]

এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, দ্বীনি বিষয়ে বিভক্তি, দলাদলি ও বিচ্ছিন্নতা একটা ভয়াবহ রোগ। পারস্পরিক বাড়াবাড়ি সীমালঙ্ঘন ও একে অপরের উপর জয়ী হবার বা প্রাধান্য পাবার আকাঙ্ক্ষা বা পারস্পরিক হিংসাই বিভক্তির মূল কারণ।

এগুলো আজ মুসলিম জাতিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। বিশ্বময় বর্তমান মুসলিম জাতির পরাজয়ের অন্যতম কারণ এগুলোই। এর থেকে বাঁচার জন্য আমাদেরকে সম্মিলিত প্রয়াস চালাতে হবে। সকলকে তৎপর হতে হবে এবং আন্তরিকতার পরিচয় দিতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

"নিশ্চই যারা ধর্ম সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করেছে এবং নিজেরা বিভক্ত হয়েছে তাদের কোন কাজের দায়িত্ব তোমার নেই, তাদের বিষয় আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। তিনিই তাদের অবহিত করবেন তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে।"[২৩৪]

আদম (আ.) এর সৃষ্টির সূচনা থেকেই শয়তানের হিংসা ও অনৈক্য

আল্লাহ তা'আলা যখন আদম (আ.) কে তাঁর খলীফা হিসেবে সৃষ্টি করে ফিরিশতাদের চেয়েও সম্মানিত করলেন, ইবলিশ তা মেনে নিতে পারেনি। আল্লাহ তা'আলা সকলকে আদেশ করলেন 'তোমরা আদমকে সিজদাহ কর।' সবাই সিজদাহ করলো শয়তান ব্যতীত। সে সিজদাহ দিতে অস্বীকার করল এবং অহঙ্কার বশতঃ বলল, 'আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।' কুর'আনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ

"সে বলল, আমি তার চেয়ে সেরা। আমাকে তুমি সৃষ্টি করেছো আগুন থেকে আর তাকে সৃষ্টি করেছো মাটি থেকে"।[২৩৫]

এর দ্বারা সে বুঝাতে চেয়েছে সে-ই সেরা। অবশেষে যুগে যুগে যত নাফরমান, কাফির, মুশরিক হবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

---

২৩৩. *সুনানুত তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৪৩৪
২৩৪. আল কুর'আন, ০৬:১৫৯
২৩৫. আল কুর'আন, ০৬:১৫৯

আদম (আ.) কে সম্মান দেয়ার কারণ

কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে আল্লাহ তা'আলা কর্দমাক্ত মাটির তৈরী আদম (আ.)-কে সিজদাহ করার জন্য নূরের তৈরী ফিরিশতাদেরকে কেন আদেশ করলেন? এর কয়েকটি জবাব রয়েছে, তার অন্যতম হল-আল্লাহ তা'আলা আদম (আ.)-কে মূলত তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁকে সব কিছুর নাম শিখিয়ে দেয়া হয়েছে। এজন্য ফিরিশতাকূলসহ সকলকে আদম (আ.)-কে সিজদাহ করার আদেশ দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

"আর স্মরণ করুন, যখন আপনার প্রভু ফিরিশতাদের বলেছিলেন, 'নিশ্চই আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি সৃষ্টিকারী।' তারা বলেছিল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকেও সৃষ্টি করবেন! যে সেখানে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? অথচ আমরাই তো আপনার প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাসবিহ করছি আর আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি।' তিনি বললেন, 'আমি যা জানি তোমরা তা জান না।' আর তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, তারপর সেগুলো উপস্থাপন করলেন ফিরিশতাদের সামনে এবং বললেন, 'তোমরা এগুলোর নাম আমাকে বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' তারা বলল, 'আপনি পবিত্র। আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন, তা ছাড়া আমাদের তো অন্য কোন জ্ঞানই নাই। নিশ্চই আপনি জ্ঞানময় প্রজ্ঞাময়।' তিনি বললেন, 'হে আদম, এদের নাম সম্পর্কে তাদের অবহিত কর।' অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে সেসবের নাম বলে দিলেন, তখন তিনি বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আকাশও পৃথিবীর অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে আমি অবহিত এবং তোমরা যা ব্যক্ত কর বা গোপন কর, নিশ্চিতভাবে আমি তা জানি।"[২৩৬]

কবির ভাষায়:-

"তুমি মাটির আদমকে প্রথম সৃষ্টি করিয়া
ঘোষণা করিয়া দিলে শ্রেষ্ঠ বলিয়া।

২৩৬. *আল কুর'আন*, ০২:৩০-৩৩

তাই নূরের ফেরশেতা করেন আদমকে সিজদাহ,
সবার চেয়ে দিলে মাটির মানুষকে সম্মান॥”[২৩৭]

হাবিল ও কাবিলের দ্বন্দ্ব

হাবিল ও কাবিল আদি পিতা আদম ও আদি মাতা হাওয়া (আ.)-এর দুই পুত্র। তাঁরা যখন পৃথিবীতে আগমন করলেন এবং সন্তান প্রজনন ও বংশবিস্তার আরম্ব হল, তখন মা হাওয়া (আ.)-এর প্রতিগর্ভ থেকে একটি পুত্র ও একটি কন্যা এরূপ যমজ সন্তান জন্ম গ্রহণ করত। তখন ভ্রাতা-ভগ্নি ছাড়া আদম (আ)-এর আর কোন সন্তান ছিল না। অথচ ভ্রাতা-ভগ্নি পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না। তাই আল্লাহ তা'আলা সে সময়ের প্রয়োজনের খাতিরে আদম (আ.)-এর শারীয়াতে বিশেষভাবে এ নির্দেশ জারি করেন যে, একই গর্ভ থেকে এক সাথে যে যমজ পুত্র ও কন্যা জন্ম গ্রহণ করবে তারা পরস্পর সহোদর ভাই বোন হিসেবে গণ্য হবে। তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক চিরতরে হারাম। কিন্তু পরবর্তী গর্ভ থেকে জন্ম গ্রহণকারি পুত্রের জন্য প্রথম গর্ভ থেকে জন্ম গ্রহণকারিনী কন্যা সহোদরা বোন গণ্য হবেন না। তাদের মধ্যে পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ হবে। কিন্তু ঘটনাচক্রে কাবিলের সহজাত সহোদরা বোনটি ছিল পরমা সুন্দরী এবং হাবিলের সহজাত বোন ছিল অপেক্ষাকৃত কম সুন্দরী। বিবাহের সময় হলে নিয়মানুযায়ী হাবিলের সহজাত বোনটি কাবিলের ভাগে পড়ে। এতে কাবিল অসন্তুষ্ট ও ক্রোধান্বিত হয়ে হাবিলের শত্রু হয়ে গেল। সে জিদ ধরল যে 'আমার সহজাত বোনকেই আমার সাথে বিবাহ দিতে হবে। আদম (আ.) তাঁর শারীয়াতের স্পষ্ট আইনের পরিপ্রেক্ষিতে কাবিলের অন্যায় আবদার প্রত্যাখ্যান করলেন। অতঃপর তিনি হাবিল ও কাবিলের মতভেদ দূর করার উদ্দেশ্যে বললেন, 'তোমরা উভয়েই আল্লাহর জন্য নিজ নিজ কুরবানী পেশ কর। যার কুরবানী গৃহীত হবে সে কন্যার পানি গ্রহণ করবে।' আদম (আ.)-র নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে, যে সত্য পথে আছে তার কুরবানিই কবুল হবে। তৎকালে কুরবানি গৃহীত হবার একটি নমুনা ছিল এই যে, 'আকাশ থেকে একটি অগ্নিশিখা এসে কবুলকৃত কুরবানিকে ভস্মীভূত করে আবার অন্তর্হিত হয়ে যেত।' যে কুরবানি অগ্নি ভস্মিভূত করতো না, তাকে প্রত্যাখ্যাত মনে করা হত। হাবিল ভেড়া দুম্বা ইত্যাদি পশু পালন করত। সে একনিষ্ঠ চিত্তে একটি উৎকৃষ্ট দুম্বা কুরবানী করল। কাবিল কৃষি কাজ করত। সে কিছু শস্য, গম ইত্যাদি কুরবানির জন্য পেশ করল। অতঃপর নিয়মানুযায়ী আকাশ থেকে অগ্নিশিখা এসে হাবিলের কুরবানিটি ভস্মীভূত করে দিল এবং কাবিলের কুরবানি যেমন ছিল, তেমনি পড়ে রইল। এ অকৃতকার্যতায় কাবিলের দুঃখ ও ক্ষোভ বেড়ে গেল। সে আত্মসংবরণ করতে পারলো না। প্রকাশ্যে ভাইকে হুমকি দিয়ে বলল, 'আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব।' হাবিল তখন ক্রোধের জবাবে ক্রোধ প্রদর্শন না করে একটি মার্জিত ও নীতিবাক্য উচ্চারণ করলেন। এতে কাবিলের প্রতি সহায়তা ও শুভেচ্ছা ফুটে উঠেছিল। তিনি বললেন, 'আল্লাহর নিয়ম এই যে, তিনি আল্লাহ ভীরু মুত্তাকিদের কর্মই গ্রহণ করেন। তুমি আল্লাহ

---

২৩৭. মরমী শিল্পী মরহুম আব্দুল আলীমের গাওয়া গান

ভীতি আবলম্বন করলে তোমার কুরবানিও গৃহীত হত। তুমি তা করনি, তাই তোমার কুরবানি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এতে আমার দোষ কী?'[২৩৮]

পরবর্তীতে পাপিষ্ট কাবিল ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড ঘটাল। কাবিল যদি এ অন্যায়ের পথে পা না বাড়িয়ে আল্লাহর ফয়সালা মেনে নিত, তবে চির সুখের ঠিকানা আল্লাহর জান্নাতের মেহমান হবার সৌভাগ্য লাভ করত। সেখানে কত শত সুন্দরী হুর-গিলমান বিদ্যমান! কিন্তু সাময়িক লোভ ও ক্রোধ সামলাতে না পারার কারণে চিরদিনের জন্য ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হল, শেষ ঠিকানা হয়ে গেল জাহান্নাম। বিশ্ব নবী (স.) বলেছেন, পৃথিবীতে যত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় তার পাপের একটা অংশ কাবিলের আমলনামায়ও যোগ হয় এ নিয়ম কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

অনৈক্যের আনুষ্ঠানিক সূচনা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, আদম ও নূহ (আ.)-এর মধ্যে দশ প্রজন্ম অতিবাহিত হয়েছে যারা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এরপর মানুষের মাঝে মতভেদ সৃষ্টি হয় এবং ঈমানের বিরুদ্ধে কুফরী ও শিরক বিস্তার লাভ করে।[২৩৯]

হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর পুত্রদের দ্বন্দ্ব

আল্লাহর নবী হযরত ইউসূফ (আ.) এর সৎভাই, ইয়াকূব (আ.) এর দশ পুত্র মিলে ইউসূফ (আ.)-কে তাঁর মহান বাবার আদর সোহাগ থেকে চির বঞ্চিত এবং দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেয়ার জন্য দীর্ঘ দিন পর্যন্ত চক্রান্ত ষড়যন্ত্র করে অবশেষে খেলতে যাবার নাম করে বাবার কাছ থেকে নিয়ে যায়। বাবার চোখের আড়াল হবার পর তাঁকে অবর্ণনীয় নির্যাতন করে। অবশেষে হত্যার সিদ্ধান্তে ঐক্যবদ্ধ হতে না পেরে একটি গভীর কূপে নিক্ষেপ করে। আল্লাহর হুকুমে সৌভাগ্যক্রমে তিনি পথিকদের পানির জন্য নিক্ষিপ্ত বালতিতে ওঠে আসেন। সেখান থেকেও তাঁকে গোলাম পরিচয় ও বিভিন্ন অপবাদ দিয়ে তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা পথিকদের কাছে বিক্রয় করে দেয়। কিন্তু আল্লাহর কুদরত বুঝা বড় দায়! যে ভয়ে তারা তাঁকে দুনিয়া থেকে সড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের ধারণার চেয়েও বড় আসনে তাঁকে আসীন করলেন। তাঁকে ততকালিন মিশরের স্বনামধন্য, জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী প্রধানমন্ত্রী (আযীযে মিশর) বানিয়ে দিলেন। অবশেষে ষড়যন্ত্রকারি ভাইয়েরা তাঁর পায়ের কাছে এসে তাঁর জন্য সম্মানসূচক সিজদায় লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়েছিল। তিনিও তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। পবিত্র কর'আনুল

২৩৮. ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া, *কুরআনুল কারীম বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর* (ঢাকা, মোহাম্মদপুর, সবুজ উদ্যোগ প্রকাশনী, প্রকাশকাল, এপ্রিল-২০১৯), খন্ড-০১, পৃ. ৫৪৮-৫৪৯

২৩৯. প্রাগুক্ত, খন্ড-০২, পৃ. ১০৫২

কারীমের বার নম্বর সূরা, সূরা ইউসূফে আল্লাহ তা'আলা এ ঐতিহাসিক ঘটনা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিস্তারিত তুলে ধরেছেন।

বিশ্ব নবীর যুগে মত পার্থক্যের সমাধান

বিশ্ব নবী (স.)-এর যুগে কোন মত পার্থক্য দেখা দিলে তিনিই তা কাঙ্ক্ষিত মানে সুন্দরভাবে সমাধান দিয়ে দিতেন। সাহাবায়ে কিরামগণের মাঝে কোন বিষয়ে ইখতেলাফ দেখা দিলে তাঁরা তা নবীজীর কাছে পেশ করতেন এতে সমাধান পেয়ে যেতেন।

সাহাবা যুগে মতভেদ

বিশ্ব নবী (স.)-এর ইন্তেকালের পর দাওয়াতী মিশন নিয়ে সাহাবায়ে কিরামগণ (রা.) বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। তারা যে যেখানে গিয়েছেন, তিনিই সেখানকার জনগণের নেতৃত্ব লাভ করেন। এ সময় জীবনের বিভিন্ন বিভাগে নতুন নতুন ঘটনা তাদের সামনে আসতে থাকে। এসব বিষয়ে লোকেরা তাদের কাছে ফতোয়া ও ফায়সালা চান। প্রত্যেক সাহাবী (রা.) তাঁর নিকট রক্ষিত প্রমাণিত জ্ঞান (কুর'আন-সুন্নাহ) দ্বারা কিংবা প্রমাণিত জ্ঞানের আলোকে জবাব প্রদান করতেন। কোন বিষয়ে যদি এভাবে সমাধান পাওয়া না যেতো তবে তারা সে বিষয়ে ইজতেহাদ করতেন এবং যে কারণ ও উদ্দেশ্যের ভিত্তির ওপর রাসূলে আকরাম (স.) শরয়ী বিধান প্রদান করেছেন, তা জানার চেষ্টা করতেন। অতঃপর যে কারণ ও উদ্দেশ্যের সাথে মাসআলার সামঞ্জস্য দেখতে পেতেন, সেখানে তারা অনুরূপ বিধান প্রয়োগ করতেন। এ প্রয়োগের ক্ষেত্রে তারা রাসূলে আকরাম (স.)-এর বিধান প্রয়োগ নীতি ও উদ্দেশ্যের পূর্ণ অনুসরণ করতেন। এ ব্যাপারে তারা পূর্ণ তাকওয়া ও ঈমানদারীর সাথে নিজেদের যোগ্যতাকে কাজে লাগাতেন। এখান থেকেই শুরু হয় তাদের মধ্যে মতপার্থক্যের।[২৪০] আর এর কারণ প্রতিষ্ঠিত ছিলো কয়েকটি মৌলিক ভিত্তির ওপর:-

প্রথম ভিত্তি: রাসূল (স.)-এর হাদীস জানা না থাকা।

যেসব কারণের উপর ভিত্তি করে সাহাবায়ে কিরামের মতামতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছিলো, তার প্রথমটি এই যে, কোনো একটি প্রশ্ন বা সমস্যার সমাধান সম্পর্কে একজনের হয়তো রাসূল (স.)-এর বক্তব্য জানা ছিলো, পক্ষান্তরে অন্য এক সাহাবীর হয়তো সে বিষয়ে নবী কারীম (স.) এর বক্তব্য জানা ছিলো না যার ফলে সে বিষয়ে তিনি বাধ্য হয়ে ইজতিহাদ করেন। এরূপ ইজতিহাদের কয়েকটি অবস্থা হতো।[২৪১] যেমন:

---

২৪০. শাহওয়ালিউল্লাহ দেহলাবী, অনু: আব্দুস শহীদ নাসিম, *মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ৭ম প্রকাশ, জুন-২০১৬), পৃ. ১৪

২৪১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪-১৫

এক. কখনো এরূপ ইজতিহাদ রাসূল (স.) এর অনুরূপ হয়ে যেতো। ইমাম নাসায়ী (র.) প্রমুখ থেকে বর্ণিত একটি হাদীস এর উদাহরণ। উক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদের (রা.) নিকট এমন একজন মহিলার প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হয়, যার স্বামী তার মাহরানা নির্ধারণ এবং সান্নিধ্য গমনের পূর্বেই মৃত্যু বরণ করেছে? তিনি জবাব দিলেন, এ বিষয়ে রাসূল (স.)-এর কোনো ফায়সালা আমার জানা নেই। কিন্তু এ বিষয়ে যে কোনো একটি ফায়াসালা দেয়ার জন্য লোকেরা তাকে পীড়াপীড়ি করতে থাকে। তখন তিনি বিষয়টির ওপর ইজতিহাদ করে এ ফায়সালা প্রদান করেন, যে, 'মহিলাটিকে এমন পরিমাণ মোহরানা দিতে হবে, যা তার সমমর্যাদার মহিলারা পেয়ে থাকে। এর চাইতে কম ও না এর চাইতে বেশী ও না। তাছাড়া মহিলাটিকে ইদ্দত পূর্ণ করতে হবে এবং সে তার স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে উত্তরাধিকার লাভ করবে।' এ ফায়সালা শুনার সাথে সাথে হযরত মা'কাল ইবন ইয়াসার (রা.) দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দেন, "রাসূলুল্লাহ (স.) আমাদের কাবিলার জনৈক মহিলার ব্যাপারে ঠিক অনুরূপ ফায়সালা করেছিলেন।" তার সাক্ষ্য শুনে আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) এতোটা খুশি হন, যতটা ইসলাম কবুল করার পর থেকে ঐ সময় পর্যন্ত আর হননি।[২৪২]

দুই. কখনো এমন হতো যে, কোনো একটি মাসয়ালা সম্পর্কে দু'জন সাহাবী পরস্পর আলোচনা করতেন। এ আলোচনার মাধ্যমে রাসূল (স.)-এর কোনো হাদীস তাদের সামনে এসে যেতো এবং হাদীসটির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে তাদের মধ্যে প্রবল আস্থা জন্ম নিতো। এমতাবস্থায় মুজতাহিদ তার ইজতিহাদ পরিত্যাগ করে হাদীসটি গ্রহণ করতেন। উদাহরণস্বরূপ সে হাদীসটির কথা উল্লেখ করা যায়, যেটি হাদীসের ইমামগণ হযরত আবু হুরাইরা (রা.) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। তা হলো এই যে, হযরত আবু হুরাইরা (রা.) এর ধারণা ছিলো, "যার ওপর গোসল ফরয হলো (জুনুবী), সে যদি সূর্যোদয়ের পূর্বে গোসল না করে, তাহলে তার রোযা হবে না।" কিন্তু নবী কারীম (স.)-এর পবিত্র স্ত্রীগণের কেউ কেউ যখন নবী কারীম (স.) এ ধারণার বিপরীত ছিলেন বলে বর্ণনা করলেন, তখনি হযরত আবু হুরাইরা (রা.) তাঁর ধারণা থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন।[২৪৩]

তিন. আবার কখনো এমন হতো যে, ইজতিহাদকারী সাহাবীর নিকট রাসূল (স.) এর হাদীসটি পৌঁছেছে বটে, কিন্তু তা বিশ্বাসযোগ্য পন্থায় পৌঁছায়নি। এমতাবস্থায় মুজতাহিদ বর্ণনাটি পরিত্যাগ করতেন এবং নিজের ইজতেহাদের ওপর আমল করতেন। এ উদাহরণ পাওয়া যায় ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা.)-এর একটি হাদীস থেকে যা ছয়টি সহীহ গ্রন্থেই (সিহাহ সিত্তাহ) বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি হলো, "ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা.) হযরত ওমর (রা.)-এর সম্মুখে এসে বললেন, "রাসূল (স.) জীবিত থাকতে আমাকে তিন তালাক দেয়া হয়েছিলো কিন্তু তিনি আমাকে ইদ্দতকালীন খোরপোষ দেয়ার নির্দেশ দেননি এবং তালাক দেয়া স্বামীর বাড়িতেও থাকতে দেননি।" হযরত ওমর (রা.) ফাতিমা

২৪২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫
২৪৩. *প্রাগুক্ত*

(রা.)-এর এ বক্তব্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন, "আমরা একজন নারীর কথায় আল্লাহর কিতাব পরিত্যাগ করতে পারি না।"

এখানে কুর'আনের কয়েকটি আয়াতাংশকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সূরা তালাকে বলা হয়েছে, لا تخروجهن من بيوتهن (লা তুখরিজূহুন্না মিন বুয়ূতিহিন্না) "অর্থাৎ, ইদ্দতকালে তোমরা তাদেরকে তাদের বাসগৃহ থেকে বের করে দিও না।" এবং "اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم" (আসকিনূহুন্না মিন হাইছু সাকানতুম মিন উজদিকুম) "তাদের ইদ্দতকালে তাদের সে বাসগৃহে থাকতে দাও তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তোমরা নিজেরা যে বাসগৃহে থাকো।" এ আয়াতগুলো থেকে জানা গেলো যে, ইদ্দতকালে নারীদেরকে ঘর থেকে বের করে দেয়া যাবে না। বরঞ্চ তালাকপ্রাপ্তাকে এ সময়ের জন্য নিজের ঘরে থাকতে দেয়া স্বামীর দায়ীত্ব। কুর'আনুল কারীমে আরো বলা হয়েছে, "انفقوا عليهن" (আনফিকূ আলাইহিন্না) "তাদের ব্যায়ভার বহন করো।" এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইদ্দতকালে তালাকপ্রাপ্তার ব্যায়ভারও বহন করতে হবে। আয়াতাংশগুলো অর্থ প্রকাশের দিক থেকে পরিস্কার, দ্ব্যর্থহীন, ও সাধারণ অর্থবোধক। এখানে নির্দিষ্ট করে কেবল 'তালাকে রিজয়ী' (ফেরতযোগ্য তালাক) দেয়া নারীর কথা বলা হয়নি। তাই এ আয়াতগুলোর হুকুম সব ধরনের তালাক দেয়া নারির ওপরই প্রযোজ্য হবে। এ সাধারণ হুকুমটির প্রেক্ষিতেই হযরত ওমর (রা.) ফাতিমা বিনতে কায়েসের (রা.) বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ তাঁর বর্ণনাটি কুর'আনের আয়াতের স্পষ্ট বিরোধী।[২৪৪]

হযরত ওমর (রা.) এর এ কর্মপন্থা থেকে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি লাভ করি। ফাতিমা (রা.) ছিলেন একজন সাহাবী। উসূলে হাদীস অনুযায়ী 'আসসহাবাতু কুল্লুহুম উদূল' আর ফাতিমা (রা.) ও সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর বর্ণনা কুর'আনের স্পষ্ট অর্থের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ায় হযরত ওমর (রা.) তা গ্রহণ করেননি। এতে বুঝা গেলো, হাদীস বিচারে কেবল সনদই বিবেচ্য নয়, বরঞ্চ বক্তব্য বিষয়ও (মতন) খতিয়ে দেখতে হবে। সোনালী সূত্রের মধ্যেও ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকতে পারে। সূত্রের (সনদ) বিশুদ্ধতা সর্বাবস্থায় হাদীসের বিশুদ্ধতার জন্যে যথেষ্ট নয়। কারণ ফাতিমা বিনতে কায়েসের (রা.) বর্ণনার মধ্যে তো সূত্রগত দুর্বলতার কোনো অবকাশ ছিল না।[২৪৫]

এছাড়াও তার বক্তব্য সঠিক কী ভুল তাও নিশ্চিত বলা যায় না। তাছাড়া "আমাকে রাসূল (স.) খোরপোষ এবং বাসস্থানের ব্যাবস্থা করে দেননি" ফাতিমা বিনতে কায়েসের (রা.) একথা শুনতে পেয়ে হযরত আয়িশা (রা.) বলে ওঠলেন, "ফাতিমার কী হলো? সেকি আল্লাহকে ভয় করে না?"[২৪৬]

---

২৪৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬
২৪৫. *প্রাগুক্ত*
২৪৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭

আরেকটি উদাহরণঃ উদাহরণটি সহীহ বুখারী এবং মুসলিমে উল্লেখিত হয়েছে, "হযরত ওমর (রা.) মনে করতেন, জুনুবী (যার উপর গোসল ফরয হয়েছে) যদি গোসলের পানি না-ও পায়, তবু তায়াম্মুম দ্বারা সে পবিত্রতা অর্জন করতে পারে না।"[২৪৭]

অতঃপর হযরত আম্মার ইবন ইয়াসার (রা.) তাঁকে নিজের ঘটনা শুনালেন। তিনি বললেন, "একবার আমি রাসূলুল্লাহ (স.) এর সফরসঙ্গী ছিলাম। আমার গোসলের যরুরত হলো। কিন্তু পানি পাওয়া গেল না, তাই তায়াম্মুমের উদ্দেশ্যে ধুলায় গড়াগড়ি করে নিলাম। পরে ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (স.) কে জানালাম। তিনি বললেন, তোমার এতটুকুই করা যথেষ্ট ছিলো, (একথা বলতে বলতে) তিনি নিজের দু'হাত যমীনে মারলেন এবং সেখান থেকে উঠিয়ে স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাসেহ করে দেখালেন।" হযরত ওমর (রা.)-এর দৃষ্টিতে আম্মারের এ বর্ণনায় কোনো দুর্বলতা ছিলো। ফলে তিনি তার এ বক্তব্য গ্রহণ করলেন না। তার দৃষ্টিতে বর্ণনাটি প্রামাণ্য দলিল ছিলো না। অবশ্য পরবর্তীতে হাদীসটি মশহুর হয়ে যায় এবং দুর্বল হবার ধারণা চাপা পড়ে যায়। ফলে লোকেরা তার ওপর আমল করতে থাকে।[২৪৮]

চার. কখনো এমন হতো যে, মুজতাহিদ সাহাবীর নিকট সংশ্লিষ্ট বিষয়ের হাদীসই পৌঁছেনি। যেমন, সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, আব্দুল্লাহ ইবন ওমর (রা.) মহিলাদেরকে গোসলের সময় মাথার চুল খুলে নিতে হুকুম করতেন। হযরত আয়িশা (রা.) ব্যাপারটি জানতে পেরে বিস্মিত হয়ে বললেন, "ইবন ওমরের কী হলো, কেনো তিনি মহিলাদেরকে চুল খোলার নির্দেশ দেন? এমন হলে তো তাদেরকে মাথার চুল কামিয়ে ফেলতে বললেই হয়। অথচ আমি এবং রাসূলুল্লাহ (স.) এক পাত্রে গোসল করতাম। আমি কখনো চুল খুলতাম না, শুধুমাত্র মাথায় তিনবার পানি ঢেলে দিতাম।"[২৪৯]

এ ব্যাপারে দ্বিতীয় উদাহরণটি পাওয়া যায় ইমাম যুহ্‌রী বর্ণিত একটি ঘটনায়। "হিন্দ রাদিয়াল্লাহু আনহার একথা জানা ছিলো না যে, কোন নারীর যদি দশদিনের বেশী ঋতুস্রাব হতে থাকে, তাহলে তাকে দশম দিনের পর থেকে সালাত আদায় করতে হবে। এ কারণে তিনি সেসময় সালাত পড়তেন না। আর সালাত পড়তে না পারার কারণে তিনি শুধু কান্নাকাটি করতেন।"[২৫০]

দ্বিতীয় কারণঃ রাসূল (স.) এর কাজের ধরণ নির্ণয়ের পার্থক্য

সাহাবায়ে কিরামের (রা.) মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হবার দ্বিতীয় কারণটি ছিলো এই যে, তারা নবী কারীম (স.)-এর একটি কাজ করতে দেখেছেন। (কিন্তু মানবিক চিন্তার

---

২৪৭. *প্রাগুক্ত*
২৪৮. *প্রাগুক্ত*
২৪৯. *প্রাগুক্ত*
২৫০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮

প্রকৃতিগত তারতম্যের কারণে কাজটির ধরণ ও গুরুত্ব অনুধাবনের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়)। ফলে কেউ রাসূল (স.)-এর উক্ত কাজটিকে মনে করেছেন ইবাদাত আর কেউ মনে করেছেন মুবাহ। এ ব্যাপারে দু'টি উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে। প্রথম উদাহরণটি হচ্ছে 'তাসবীহের'। মানে হজ্জে সফরের উদ্দেশ্যে রাসূল (স.) এর আবতাহ উপত্যকায় অবতরণের ঘটনা। আসহাবে উসূল ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। আবু হুরায়রা (রা.) এবং আব্দুল্লাহ ইবন ওমর (রা.)-এর দৃষ্টিতে এ অবতরণের কাজটি ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। তারা এটাকে হজ্জের সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত মনে করতেন। কিন্তু হযরত আয়িশা (রা.) এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.)-এর মতে, তিনি সেখানে ঘটনাক্রমে অবতরণ করেছিলেন। সুতরাং সেটা হজ্জের সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত নয়।[২৫১]

এ ব্যাপারে দ্বিতীয় উদাহরণটি হচ্ছে এই যে, "সাধারণ মুসলিমগণের মতে, পবিত্র কা'বার তাওয়াফের সময় 'রমল' করা সুন্নাত। কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.)-এর মতে রাসূলুল্লাহ (স.) যে 'রমল' করেছিলেন, তা ছিলো একটি আকস্মিক ঘটনা। তিনি তা করেছিলেন মক্কার মুশরিকদের একটি ভৎসনার জবাবে এবং তিনি সাময়িকভাবে এ কাজটি করেছিলেন। তারা বলত, 'মদীনার ছুতাররা মুসলিমদেরকে বিচূর্ণ ও ক্লান্ত করে রেখেছে।' এ ভর্ৎসনার জবাবে তিনি মুসলিমদের নিতান্তই সাময়িকভাবে "রমল" করার হুকুম দিয়েছেন। এটি হজ্জের স্থায়ী কোনো সুন্নাত নয়।"[২৫২]

তৃতীয় কারণ: ধারণাগত বিশ্লেষণের পার্থক্য

সাহাবায়ে কিরামের (রা.) মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হবার তৃতীয় কারণটি হলো, রাসূলুল্লাহ (স.)-এর কাজসমূহের কথা বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁদের ধারণাগত বিশ্লেষণ। যেমন, রাসূল (স.) হজ্জ সম্পাদন করেছেন আর সাহাবায়ে কিরাম (রা.) তা প্রত্যক্ষ করেছেন। পরে তারা লোকদের কাছে রাসূল (স.)-এর সে হজ্জের ধরণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, তিনি 'হজ্জে তামাত্তু'[২৫৩] করেছেন। কেউ বলেছেন, তিনি 'হজ্জে কিরান'[২৫৪] করেছেন। আবার কারো কারো মতে সেটা ছিলো 'হজ্জে ইফরাদ'।[২৫৫] আর ওমরা বিহীন হজ্জকে ইফরাদ বলা হয়।

এর দ্বিতীয় উদাহরণটি হচ্ছে সুনানে আবু দাউদে সংকলিত হযরত সায়ীদ ইবন যুবায়ের (রা.) বর্ণিত একটি হাদীস। তিনি বলেন, "আমি আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.)-কে

---

২৫১. *প্রাগুক্ত*

২৫২. *প্রাগুক্ত*

২৫৩. 'তামাত্তু' সে ধরণের হজ্জকে বলা হয় যাতে হজ্জের মাসগুলোতে মক্কা গিয়ে উমরা আদায় এবং মাথা মুণ্ডন করে ইহরাম খুলে ফেলা হয়। অতঃপর জিলহজ মাসের আট তারিখে আবার নতুন করে ইহরাম বেঁধে হজ্জ আদায় করা হয়।

২৫৪. 'কেরান' সেই হজ্জকে বলা হয়, যাতে উমরা এবং হজ্জ উভয়টার জন্যে একত্রে ইহরাম বাঁধা হয় এবং উভয়টা সমাপ্ত করার পর ইহরাম খোলা হয়।

২৫৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯

বললাম, হে আব্বাস! হজ্জের ইহরাম বাঁধার পর রাসূল (স.) যে তালবিয়া পাঠ করেছিলেন, সে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সাহাবীগণের মধ্যে মতপার্থক্য দেখে আমার কাছে বিস্ময় লাগছে।" আমার বক্তব্য শুনে ইবন আব্বাস (রা.) বললেন,
"এ বিষয়ে প্রকৃত ঘটনা আমার সবার চাইতে বেশী জানা আছে, আসলে রাসূল (স.) একটিই মাত্র হজ্জ করেছিলেন, আর এ জন্যেই সে হজ্জের বিস্তারিত বিবরণের ব্যাপারে লোকদের মধ্যে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনা হচ্ছে এ যে, রাসূল (স.) হজ্জের উদ্দেশ্যে মদীনা ত্যাগ করেন। অতঃপর তিনি মসজিদে যুলহুলাইফায় দু'রাকাত সালাত আদায় করেন। তারপর সেখানেই হজ্জের তালবিয়া পাঠ করেন। সেখানে তার আশে পাশে যারা ছিলেন, তারা তাঁর এ তালবিয়া পাঠ শুনেন এবং মনে রাখেন। অতঃপর তিনি উটে আরোহণ করেন, উট তাঁকে নিয়ে যাত্রা শুরু করলে তিনি পুনরায় তালবিয়া পাঠ করেন। এ সময় আবার অপর কিছু লোক তা শুনতে পায়, ব্যাপার হলো সফর ব্যাপদেশে সাহাবীগণের পৃথক পৃথক দল একের পর এক রাসূল (স.)-এর খিদমতে আত্মনিয়োগ করে তাঁর পাশে থাকতেন। সে কারণে উট তাকে নিয়ে যাত্রা শুরু করার সময় তাঁর পাশে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা তখনকার তালবিয়া শুনতে পান এবং তাঁরা মনে করে বসেন যে, রাসূল (স.) কেবল তখনই তালবিয়া পাঠ করেছেন যখন যুলহুলাইফার মসজিদ থেকে উটে করে যাত্রা শুরু করেন। অতঃপর তিনি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে বায়দা উপত্যকা অতিক্রমকালে এর ওপরে উঠলে পুনরায় তালবিয়া পাঠ করেন। এ সময় আরেকদল লোক তাঁর তালবিয়া শুনতে পান। তারা মনে করে বসেন যে, রাসূল (স.) শুধু 'বায়দা' উপত্যকা অতিক্রমকালে তালবিয়া পাঠ করেছেন। অথচ, আল্লাহর কসম, জায়নামাজে বসেও তিনি হজ্জের নিয়ত করেছিলেন। অতঃপর উট তাঁকে নিয়ে যাত্রা শুরু করার পরও তালবিয়া পাঠ করেছেন এবং বায়দা অতিক্রমকালেও তালবিয়া পাঠ করেছেন।"[২৫৬]

চতুর্থ কারণ: ভুলে যাবার কারণে মতপার্থক্য

সাহাবায়ে কিরাম (রা.) এর মধ্যে মতপার্থক্যের চতুর্থ কারণ হচ্ছে ভুলচুক (যা মানুষের জন্যে অস্বাভাবিক কিছু নয়)।[২৫৭]

এর উদাহরণ হচ্ছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন ওমর (রা.) সম্পর্কিত একটি বর্ণনা। তিনি (ইব্ন ওমর) বলতেন, "রাসূলুল্লাহ (স.) একটি ওমরা করেছেন রজব মাসে।" তাঁর এ বক্তব্য অবগত হলে আম্মাজান আয়িশা (রা.) বললেন, "ইবন ওমর (রা.) ব্যাপারটা ভুলে গেছেন।"[২৫৮]

---

২৫৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯-২০
২৫৭. *প্রাগুক্ত*
২৫৮. *প্রাগুক্ত*

পঞ্চম কারণ: রাসূল (স.)-এর বক্তব্যের সঠিক উদ্দেশ্য আয়ত্ত করা না করার পার্থক্য

সাহাবায়ে কিরামের (রা.) মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হওয়ার পঞ্চম কারণ হচ্ছে এই যে, কখনো কখনো রাসূল (স.) এর বক্তব্যের যথার্থ ও পূর্ণ উদ্দেশ্য সকলে সমানভাবে আয়ত্ত করে রাখতেন না। এর উদাহরণ হচ্ছে, রাসূল (স.) থেকে হযরত ইবন ওমর (রা.) বর্ণিত একটি হাদীস। তিনি বলেন,
"রাসূল (স.) বলেছেন, "মৃত ব্যক্তির পরিবার পরিজন কান্নাকাটি করলে মৃত ব্যক্তিটিকে আযাব দেয়া হয়।" এ বক্তব্য শুনে হযরত আয়িশা (রা.) বললেন, "এটা ইবন ওমরের ধারণা প্রসূত কথা। রাসূল (স.)-এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য এবং স্থানকাল পাত্র তিনি আয়ত্ত রাখেননি। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ (স.) এক ইয়াহুদী মহিলার কবরের পাশ দিয়ে যাবার কালে দেখলেন, তার আপনজনেরা তার জন্য মাতম করছে। তিনি বললেন, "এরা এখানে তার জন্যে কান্নাকাটি করছে অথচ তার কবরের আযাব হচ্ছে।"[২৫৯]

এখানে ইবন ওমর (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.)-এর বক্তব্যের যথার্থ উদ্দেশ্য আয়ত্ত করতে পারেননি। তিনি মনে করেছেন, কান্নাকাটির কারণেই মাইয়্যেতের আযাব হয়েছে এবং ব্যাপারটা সাধারণভাবে সকল মাইয়্যেতের জন্যই প্রযোজ্য। অথচ রাসূল (স.)-এর বক্তব্য ছিলো কেবল উক্ত মাইয়্যেতের জন্য নির্দিষ্ট (খাস) এবং বক্তব্যে তিনি কান্নাকাটিকে আযাবের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেননি।[২৬০]

৬ষ্ঠ কারণ: বিধানের কারণ নির্ণয়গত কারণ

সাহাবায়ে কিরামের (রা.) মধ্যে যেসব কারণে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে তন্মধ্যে আরেকটি হচ্ছে এই যে, কোনো বিধান স্থির করার পিছনে কী কারণ ছিলো তা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তাঁদের মতামত এর ভিন্নতা। যেমন, কফিন অতিক্রমকালে দাঁড়ানো। এ ব্যাপারে কোনো কোনো সাহাবী বলেছেন, ফেরেশতাদের সম্মানার্থে দাঁড়ানো হয়, কেননা প্রত্যেক কফিনের সাথেই ফেরেশতারা শামিল হন। এ মতানুযায়ী মৃতব্যক্তি মু'মিন হোক কিংবা কাফির সর্বাবস্থায়ই দাঁড়াতে হবে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, মৃত্যু ভীতির কারণে দাঁড়ানো হয়। এ মতানুযায়ীও যে কোনো ধরনের লোকের কফিনের জন্য দাঁড়াতে হবে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, একবার রাসূল (স.)-এর নিকট দিয়ে এক ইয়াহুদীর কফিন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তার মাথার ওপর দিয়ে ইয়াহুদীর লাশ অতিক্রম করা তিনি পছন্দ

---

২৫৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০-২১
২৬০. *প্রাগুক্ত*

করলেন না, তাই তিনি দাঁড়ালেন। এটা যদি সঠিক কারণ হয়ে থাকে, তবে দাঁড়ানোটা শুধু কাফিরের কফিনের জন্যে নির্দিষ্ট।[২৬১]

৭ম কারণ: সামঞ্জস্যবিধানগত পার্থক্য

কোনো বিধানের বৈপরিত্য নিরসনকল্পে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, রাসূল (স.) খাইবার যুদ্ধের সময় 'মুত'আ' বিয়ের অনুমতি দিয়েছিলেন। যুদ্ধের পর আবার তা নিষেধ করে দেন। অতঃপর 'আওতাস' যুদ্ধের সময় পুনরায় মুত'আর অনুমতি প্রদান করেন। এবারও যুদ্ধের পর অনুমতি প্রত্যাহার করে নেন।[২৬২]

এখন এ বিষয়ে হযরত আব্বাসের (রা.) মত হলো, প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে 'মুত'আর' অনুমতি দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজন শেষ হবার সাথে সাথে অনুমতি প্রত্যাহার করা হয়েছে। সুতরাং অনুমতি প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কিত। এ জন্যে এ অনুমতি স্থায়ী। (অর্থাৎ প্রয়োজন দেখা দিলে মুত'আ বিয়ে করা যাবে। আর প্রয়োজন দূরীভুত হলে তা নিষিদ্ধ।) কিন্তু সাধারণ সাহাবীগণের মত এর বিপরীত। তাদের মত হলো, মুত'আ বিয়ের অনুমতি ছিলো মুবাহ পর্যায়ের। নিষেধাজ্ঞা সে অনুমতিকে স্থায়ীভাবে রদ (মানসুখ) করে দিয়েছে।[২৬৩]

এ ব্যাপারে দ্বিতীয় উদাহরণ এই যে, রাসূল (স.) কিবলামুখী হয়ে ইস্তেঞ্জা করতে নিষেধ করেছেন। এ ব্যাপারে কিছু সাহাবীর মত হলো, এ নিষেধাজ্ঞা সাধারণ এবং রদযোগ্য নয়। কিন্তু ওফাতের এক বছর পূর্বে হযরত জাবির (রা.) রাসূল (স.) কে কিবলামুখী হয়ে পেশাব করতে দেখেছেন। তাই তাঁর ধারণা জন্মেছে যে, রাসূল (স.)-এর এ কাজ এ সংক্রান্ত তাঁর পূর্ববর্তী নিষেধাজ্ঞাকে রদ করে দিয়েছে। এমনিভাবে হযরত ইবন ওমর (রা.) রাসূল (স.)-কে কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে এবং সিরিয়ার দিকে মুখ করে ইস্তেঞ্জা করতে দেখেছেন। এর ভিত্তিতে তিনি তাদের মতকে রদ করে দিয়েছেন যারা বলেন, কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে ইস্তেঞ্জা করা নিষেধ। অতঃপর কিছু লোক এ উভয় মতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছেন। ইমাম শা'বী (র.) প্রমুখ মত দিয়েছেন যে, রাসূল (স.)-এর নিষেধাজ্ঞা ছিলো খোলা উন্মুক্ত জায়গার বেলায়। কেউ যদি পায়খানা বা টয়লেটে বসে ইস্তেঞ্জা করে, তখন কিবলার দিকে মুখ করে বা পিঠ দিয়ে বসলে কোনো অসুবিধা নাই। কিন্তু কেউ কেউ আবার ভিন্ন মত ব্যাক্ত করেছেন। তারা বলেন, "রাসূল (স.)-এর নিষেধাজ্ঞা স্থায়ী এবং সাধারণ। তবে হযরত জাবির (রা.) এবং ইবন ওমর (রা.) যা দেখেছেন, সেটা করা নবী হিসেবে বিশেষভাবে কেবলমাত্র তাঁর জন্য বৈধ ছিলো। সুতরাং তাঁর সে কাজ এ সংক্রান্ত তাঁর নিষেধাজ্ঞাকে রদ করে না। তাছাড়া

---

২৬১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১
২৬২. *প্রাগুক্ত*
২৬৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২

কোনো বিশেষ স্থানে কিবলামুখী বা কিবলার দিকে পিঠ করে ইস্তেঞ্জা করাও বৈধ বলে প্রমাণ করে না।[২৬৪]

তাবেয়ীগণের মতপার্থক্য

যেভাবে সাহাবায়ে কিরামের মাঝে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। উত্তরাধিকার সূত্রে এ মতপার্থক্য তাবেয়ীদের নিকটও পৌঁছে। প্রত্যেক তাবেয়ীর নিকট যা কিছু পৌঁছে তিনি সেটাকে আয়ত্ত করে নেন। রাসূল (স.)-এর যে যে হাদিস এবং যে যে সাহাবীগণের যে যে মতামত শুনেছেন, তা তাঁরা তাঁদের স্মৃতিতে অঙ্কিত করে নেন। সাহাবীগণের বক্তব্যে যেসব ইখতিলাফ লক্ষ্য করেছেন, নিজ নিজ জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী তাঁরা সেগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছেন। কখনো একটি বক্তব্যকে আরেকটি বক্তব্যের ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এ ব্যাপারে কোনো কোনো বক্তব্য তাদের সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য হয়েছে। এমনকি তা যদি প্রথম শ্রেণীর কোনো সাহাবীর বক্তব্যও হয়ে থাকে। যেমন, 'তায়াম্মুম দ্বারা ফরয গোসলের কার্য সমাধান হয় না'- হযরত ওমর (রা.) এবং ইবন মাসউদের (রা.) এ মতকে তারা গ্রহণ করেননি। পক্ষান্তরে এ প্রসঙ্গে তাঁরা হযরত আম্মার (রা.) এবং ইমরান ইবন হুসাইন (রা.) প্রমুখের মাশহুর রেওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন। এ পর্যায়ে এসে তাবেয়ীগণের মধ্যেও স্বাভাবিক মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়। দেখা দেয় ভিন্ন ভিন্ন মত।[২৬৫] আর বিভিন্ন শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় ভিন্ন ভিন্ন মতের আলিমদের নেতৃত্ব। যেমন:-

ক) মদীনায় সায়ীদ ইবন মুসাইয়্যেব (র.) এবং সালিম ইবন আব্দুল্লাহ ইবন উমার (র.)-এর মতামত গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। তাঁরা মদীনার জনগণের ইমামের মর্যাদা লাভ করেন। এ দু'জনের পর মদীনায় যুহুরী, কাযী ইয়াহহিয়া ইবন সায়ীদ এবং রাবীয়া ইবন আব্দুর রহমান (র.) অনুরূপ মর্যাদা লাভ করেন।[২৬৬]
খ) মক্কায় আতা ইবন আবি রিবাহ (র.) গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেন এবং সেখানকার ইমামের মর্যাদা লাভ করেন।
গ) কুফায় ইব্রাহীম নাখয়ী এবং শা'বী (র.) এ মর্যাদা লাভ করেন।
ঘ) বসরায় এ মর্যাদা লাভ করেন হাসান আল বসরী (র.)।
ঙ) ইয়েমেনে এ মর্যাদা লাভ করেন তাউস ইবনে কাইসান (র.) আর
চ) সিরিয়ায় এ মর্যাদায় অভিষিক্ত হন মাকহুল (র.)।[২৬৭]

আল্লাহ তা'আলা কিছু লোকের অন্তরে এদের থেকে ইলম হাসিল করার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে দেন। এভাবে তারা এঁদের নিকট থেকে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর হাদিস, সাহাবায়ে

---

২৬৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২
২৬৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩
২৬৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩
২৬৭. *প্রাগুক্ত*

কিরামের (রা.) বক্তব্য ও ফতোয়া এবং এ লোকদের মতামত ও বিশ্লেষণ সংগ্রহ করেন। অতঃপর তাঁদের কাছে ফতোয়া চাইতে আসেন অসংখ্য লোক। তাদের সম্মুখে আসে হাজারো মাসায়েল। উত্থাপিত হয় শত শত মামলা মুকাদ্দামা। এ সকল বিষয়ে তাঁদেরকে ফতোয়া দিতে হয় এবং ব্যাক্ত করতে হয় নিজেদের মতামত।[২৬৮]

ঈমানদার ও কাফিরের চিন্তার অনৈক্য

সাধারণত ঈমানদার ও বেঈমান চিন্তা এবং চেতনায় কখনো একমত হবে না। এটা হওয়াই স্বাভাবিক ও এটাই বাস্তবতা। কারণ ঈমানদার ব্যক্তি এক আল্লাহকে বিশ্বাস করে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আশায়, তাঁর নির্দেশিত পথে যাবতীয় কাজ সম্পাদন করে এবং এতে সে শান্তি ও তৃপ্তি পায়। কিন্তু বেঈমান পৃথিবীতে যতদিন বাঁচে ব্যক্তি খামখেয়ালীপূর্ণ কাজই করতে থাকে। সে মনে করে দুনিয়ার জীবনটাই আসল এবং চূড়ান্ত। এজন্য এখানে একটু সুখের আশায় সে যা ইচ্ছা তা-ই করে বেড়ায়। কত অন্যায় অপকর্ম করে সে যার কোন হিসাব নিকাশ থাকে না। যার কারণে সে হয়ে ওঠে স্বৈরাচারী ও মানবতার দুশমন। সুতরাং ঈমানদার ও বেঈমান কখনো চিন্তায় এবং কাজে একমত পোষণ করে না। এ জন্য দূর অতীত থেকে আজ পর্যন্ত তথা সৃষ্টির সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত সকল নবী এবং রাসূল ও তাঁদের অনুসারীদের সাথে বেঈমান কাফির মুশরিকদের চিরন্তন দ্বন্দ ও সংঘাত চলে আসছে। আলোচ্যাংশে অনৈক্যের সূত্রপাত ও তার ইতিহাস বিষয়ে ঈমানদারদের মাঝে যুগে যুগে যে সকল অনৈক্য ও সংঘাত হয়েছে তার সামান্য তুলে ধরা হল:-

চূড়ান্ত অনৈক্য ও অধঃপতনের শুরু

বিশিষ্ট্য গবেষক ও প্রবীণ সাংবাদিক আবুল আসাদ তাঁর 'একুশ শতকের এজেন্ডা' বইতে উল্লেখ করেন যে, "মুসলিম অনৈক্য ও অধঃপতনের বিপজ্জনক শুরু খোলাফায়ে রাশেদিনের পর থেকেই। কিন্তু তখনকার সে অনৈক্য ছিল নিছকই একটা ক্ষমতার দ্বন্দ্ব যা ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। জাতি- রাষ্ট্র ও ধর্ম নিরেপক্ষতার মতো জাহেলিয়াত তখনও মুসলিম উম্মাহর দেহে প্রবেশ করেনি। এ রোগের অনুপ্রবেশ ঘটে মুসলিম বিশ্বে বিজাতীয় ঔপনিবেশিক শাসন চেপে ধরার সময়। আর এর উৎকট প্রকাশ ঘটে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দ্বন্দ্ব সংঘাত ও বিপর্যয়ের সুযোগে যখন ঔপনিবেশিকদের প্ররোচনায় মুসলিম উম্মাহ ভৌগলিক ও ভাষাভিত্তিক জাতি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে সংঘাত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ফল হয় অত্যন্ত ভয়াবহ। ওসমানি খেলাফত টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং জাতীয়তাবাদের জাহেলিয়াত পূর্ণরূপে মাথা তুলে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মুসলিম বিশ্বের জন্যে আশীর্বাদ হয়ে আসে। ঔপনিবেশিক কবল থেকে মুসলিম দেশগুলো স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু মুসলিম উম্মাহর ভৌগোলিক ও ভাষাভিত্তিক বিভক্তি তীব্রতর হয়ে ওঠে এবং

২৬৮. *প্রাগুক্ত*

সৃষ্টি হয় ডজন ডজন জাতীয়তাবাদী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম রাষ্ট্র। মুসলিম উম্মাহ আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয় 'জাতীয়তাবাদ' নামের এক নতুন জাহেলিয়াতের ক্লেদাক্ত সয়লাবে।"

এ যুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তা নায়ক সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী বলেছেন:-
"পশ্চিমী জাতিসমূহের নিকট যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের পরাজয় তাদের চিন্তা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির কাছে আমাদের আত্মসমর্পণকে ব্যাপকতর করে দেয়। তাদের জীবন দর্শন তাদের তরবারীর চেয়ে ভয়াবহ প্রমাণিত হয়। তাদের রাজনৈতিক আধিপত্য আমাদের দেহকেই মাত্র শৃঙ্খলিত করেছিলো, কিন্তু তাদের সংস্কৃতি ও আদর্শ আমাদের মন-মানসকে বিকৃত করে দেয়। ফলে বিজাতীয় জাতিতত্ত্ব, যা আমাদের কাছে গত শতাব্দী পর্যন্ত অপরিচিত ছিল, মুসলিমদের গ্রাস করলো। মুসলিম উম্মাহর গৌরবান্বিত সদস্য হবার বদলে তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি রাষ্ট্রের সদস্য হয়ে দাঁড়ালো।"

জাতীয়তাবাদ আর একটা ভয়াবহ রোগ সাথে করে নিয়ে এলো। সেটা হল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ যার অনুপ্রবেশ মুসলিম মানসকে দ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্যে আচ্ছন্ন করে তাঁর অধঃপতনকে আরো দ্রুততর করে তোলে। পশ্চিমী চিন্তা ও আদর্শকে গ্রহণ করার ফলে প্রাচ্যের মুসলিমরা মনের দিক থেকে পশ্চিমী বনে গেলো। পতনের এ প্রকৃতিকে তুরস্কের বিখ্যাত লেখক জিয়া গোকালপ সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন:-
"যখনই আমরা বলবো আমরা তুর্কী জাতি, তখনই আমাদের ভাষা, নৈতিকতা, আইন, আদর্শ, দর্শন ও ব্যক্তিত্ব সবই তুর্কী সংস্কৃতি, রুচি ও স্বকীয়তার মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে। আবার যখনই আমরা বলবো, আমরা ইসলামী উম্মাহর সদস্য, তখনই আল কুর'আন হবে আমাদের কাছে জীবন বিধান, মহানবী (স.) হবেন আমাদের নেতা, কা'বা হবে পবিত্রতম কেন্দ্র এবং ইসলাম হবে আমাদের জীবন ব্যবস্থা। আর যখনই আমরা পশ্চিমী সভ্যতাকে আমাদের মনে করবো, তখনই দর্শন, বিজ্ঞান সব কিছুর দিক দিয়ে আমরা ইউরোপীয়ান বনে যাবো।"[২৬৯]
পশ্চিমী দর্শন ও কালচারের কাছে আমাদের আত্মসমর্পণ আমাদেরকে মনের দিক দিয়ে ইউরোপীয়ই করেছিলো। আশা ছিল ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রাম সফল হবার পর সুদিন ফিরে আসবে, ইসলামী সমাজ সংস্কৃতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে এবং তার ফলে মুসলিম উম্মাহর খণ্ড- বিখণ্ডিত দেহ আবার জোড়া লাগার একটা পথ হবে। কিন্তু না, তা হল না। ঔপনিবেশিকদের শিক্ষায় শিক্ষিত নেতারা বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ইসলামের নামে জনগণ জাগ্রিত হলো, নেতারা জনমতকে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিতে পরিণত করার জন্যে ইসলামের কথা বললেন, কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের পর তারা সুর পাল্টালেন। তুরস্কের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় কামাল পাশা "Jihad Armies of the Ummah of Muhammad"

২৬৯. *একুশ শতকের এজেন্ডা*, প্রাগুক্ত, উদ্ধৃত; The Principle of Turkism, by zia gokalp

উপাধী লাভ করেছিলেন।[২৭০] এ মোস্তফা কামালই স্বাধীনতার পর তুরস্কের সমাজ-সংস্কৃতিকে ইসলাম থেকে মুক্ত করার জন্য সতের বার সামরিক শাসন জারি করেন।[২৭১] কায়েদে আযম মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহকে আমরা এ ভূমিকাতেই দেখি। পাকিস্তান আন্দোলনের সময় তিনি বলেছিলেন, তিনি প্রথমে ভারতীয় নন, তিনি প্রথমে মুসলিম, তারপর ভারতীয় এবং তিনি বলেছিলেন, 'মুসলমানদের আদর্শ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের লালনের জন্য তারা স্বাধীন আবাসভূমি চান।' কিন্তু সে কায়েদে আযমই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানের সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, "I think we would keep that infront as our ideal and you will find that in the course of time Hindus will cease to be Hindus and Muslims cease to be Muslims, not in the religious sense because that is the personal faith of individual but in the political sense as citizens of the state."[২৭২]

মুসলিমরা স্বাধীন হবার পর তাদের সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে ইসলামের আদর্শ, সংস্কৃতি বিতাড়িত হলো। এর ফল হলো ভয়াবহ। মুসলিম দেশে ইসলাম পরবাসী হয়ে গেলো, জাহেলিয়াত বিজয় লাভ করলো ইসলামের ওপর। বার্নাড লুইসের ভাষায়, "এবার ইসলামের সংঘাত বাধল অতীতের মতো লাত, উজ্জার সাথে নয়, বরং নতুন প্রতিমা জাতি রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদের সাথে, আর এ সংঘাতে সাময়িকভাবে ইসলামের ওপর প্রতিমাই বিজয় লাভ করলো।"[২৭৩]

খারেজী সম্প্রদায়

ইসলামের প্রথম বাতিল দল এবং বিভক্তকারী দল খারেজী সম্প্রদায়। রাসূল (স.)-এর ওফাতের পর হযরত আলি (রা.)-এর খিলফাতকালে এ দলটির উত্থান হয়। এ দলটি সম্পর্কে আল্লাহ তাঁর রাসূল (স.)-কে আগে ভাগেই জানিয়েছিলেন এবং রাসূল (স.) সাহাবীদের নিকট এ দলটি সম্পর্কে বিস্তারিত ভবিষ্যত বাণী করে যান যাতে উম্মাতে মুহাম্মাদি (স.) সচেতন হতে পারে। কয়েক দশক পরেই রাসূল (স.)-এর ভবিষ্যৎ বাণী সত্য প্রমাণিত হয় এবং খারেজীদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এরপর যুগ যুগ ধরে এ খারেজীরা মুসলিমদের মধ্যে ফিতনা-ফাসাদ করেই যাচ্ছিল। হযরত আলি (রা.)-এর যামানা থেকে

---

২৭০. *প্রাগুক্ত*, উদ্ধৃত; Islam and political movement in turkey by Binnas Tpopak, page 36-37

২৭১. *একুশ শতকের এজেন্ডা*, প্রাগুক্ত

২৭২. *প্রাগুক্ত*, উদ্ধৃত; Quated in constitutional development of Pakistan by G. W. Chodhury, page ৬৩-৬৪

২৭৩. *প্রাগুক্ত*, উদ্ধৃত; Return of Islam, by Brnard Luis

আজও পৃথিবীতে খাওয়ারেজেরা বিদ্যমান। খারেজীদের হাতেই পরপর কয়েকজন মহান খলীফা শাহাদাত বরণ করেন। খারেজীদের হাতেই ১৪০০ বছর ধরে চলমান খিলাফার পতন হয়, খারেজীদের কারণেই বর্তমানে খিলাফার সূর্য উদয়ে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

খারেজী নামকরণ

খারেজী আরবি শব্দ, যা এসেছে খারাজা থেকে, যার অর্থ বেরিয়ে পড়া। মূলতঃ যারা কুর'আন ও হাদিসের পথ থেকে বেরিয়ে পড়ে তাদেরকে খারেজী বলা হয়। এজন্যও খারেজী বলা হয় কারণ তারা বেরিয়ে পড়েছে হত্যার উদ্দেশ্যে সমকালীন সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষকে। এছাড়াও যারা (লোক বা গুষ্টি বা দল) ইসলামের পক্ষে কাজ করে বা করার জন্য চেষ্টা করে, কিংবা ইসলামকে পূর্ণ বা আংশিকভাবে মেনে চলে তাদেরকে যারা কাফের মনে করে তাদেরকে খারেজী বলা হয়।

খারেজীদের আত্মপ্রকাশ

জাবের ইবন আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, এক লোক রাসূল (স.) এর কাছে জেরানা নামক স্থানে দেখা করেন। জেরানা নামক স্থানটি হল সে জায়গা যেখানে রাসূল (স.) হুনায়নের যুদ্ধে প্রাপ্ত গনিমতের মাল বণ্টন করছিলেন। সাহাবী বেলাল (রা.)-এর কাপড়ের ওপর রুপার টুকরা গুলো রাখা ছিল। নবীজি (স.) সেখান থেকে মুষ্টিবদ্ধভাবে মানুষকে দান করছিলেন। তখন উপস্থিত ঐ লোক বলল:

اتَّقِ اللَّهَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ مَنْ يُطِعْ اللَّهَ إِذَا عَصَيْتُ أَيَأْمَنُنِي اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَلَا تَأْمَنُونِي فَسَأَلَهُ رَجُلٌ قَتْلَهُ أَحْسِبُهُ عمر (خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ) فَمَنَعَهُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا أَوْ فِي عَقِبِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنْ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ

'হে মুহাম্মাদ (স.) আপনি আল্লাহ্‌কে ভয় করুন। তিনি বললেন, আমি যদি সীমালংঘন করি তবে কে আল্লাহর আনুগত্য করবে? আল্লাহ আমাকে পৃথিবীবাসির উপর আমানতদার বানানোর পরও তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করবে না? রাবী বলেন, সাথে সাথে তাকে এক ব্যক্তি হত্যা করতে উদ্যত হলেন। আমি ধারণা করছি তিনি হযরত ওমর অথবা খালিদ ইবন অলীদ (রা.)। কিন্তু নবী (স.) তাকে বাধা দিলেন। অতঃপর লোকটি যখন চলে গেল নবী (স.) বললেন,

'আমার কিছু সময় পরে শোরগোল করা কিছু কওম এমন হবে যারা কুর'আন পড়বে কিন্তু কুর'আন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দীন (ইসলাম) থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর ধনুক থেকে বের হয়ে যায় (আর ফিরে আসে না)।' তারা ইসলামের অনুসারীদের হত্যায় মেতে ওঠবে অথচ মূর্তিপূজারিদের ছেড়ে দিবে (সুযোগ দিবে)। আমি যদি তাদের পাই তাহলে আদ জাতির মত হত্যা করব।"[২৭৪]

এ লোকের বংশধর ও অনুসারীরাই হচ্ছে খারেজী। এরা কেমন হবে কী করবে? রাসূল (স.) এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলে যান।

মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করে রাসূল (স.) আরো বলেন, 'অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মতের মধ্যে মতানৈক্য ও ফিরকা সৃষ্টি হবে। এমন এক সম্প্রদায় বের হবে যারা সুন্দর ও ভাল কথা বলবে। আর কাজ করবে মন্দ। তারা কুর'আন পাঠ করবে, তবে তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দ্বীন অর্থাৎ ইসলাম থেকে এমনিভাবে বেরিয়ে যাবে, যেভাবে তীর ধনুক থেকে বেরিয়ে যায়। তারা সৃষ্টির সবচেয়ে নিকৃষ্ট। ঐ ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ যে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং যুদ্ধে তাদের দ্বারা শাহাদাত বরণ করবে। তারা মানুষকে আল্লাহর কিতাব (কুর'আন)-এর প্রতি দাওয়াত দেবে, অথচ তারা আমার কোন আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে লড়বে সে অপরাপর উম্মতের তুলনায় আল্লাহ তা'আলার অনেক নিকটতম হবে। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (স.)! তাদের চিহ্ন কী? হুজুর (স) উত্তরে বললেন, অধিক মাথা মুণ্ডানো।'[২৭৫]

বিশ্ব নবী (স.) আরো বলেন, 'শেষ যামানায় একদল তরুণ বয়সী নির্বোধ লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা সর্বোত্তম কথা বলবে। তারা ইসলাম থেকে এত দ্রুত গতিতে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর ধনুক থেকে বের হয়ে যায়। তাদের ঈমান তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তোমরা তাদেরকে যেখানেই পাবে সেখানেই হত্যা করবে। কারণ যে তাদেরকে হত্যা করবে তার জন্য কি্বয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট নেকী রয়েছে'।[২৭৬]

অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূল (স.) বলেন, 'তোমরা তাদের সালাতের তুলনায় তোমাদের সালাতকে তুচ্ছ মনে করবে, তাদের সিয়ামের তুলনায় তোমাদের সিয়ামকে এবং তাদের

২৭৪. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩০৯৫, ৩৩৪১, ৩৩৪২
২৭৫. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত
২৭৬. *প্রাগুক্ত*

আমলের তুলনায় তোমাদের আমলকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে। তারা মুসলিমদেরকে হত্যা করবে অথচ মূর্তিপূজকদের ছেড়ে দিবে'।[২৭৭]

মূসা ইবন ইসমাইল (র.)-ইউসায়ের ইবন আমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি সাহল ইবন হুনায়েফ (রা.) কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি নবী (স.) কে খারিজীদের সম্পর্কে কিছু বলতে শুনেছেন কি? তিনি বললেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি। আর তখন তিনি [রাসূল (স.)] তাঁর হাত ইরাকের দিকে বাড়িয়েছিলেন যে, সেখান থেকে এমন একটি কাওম বের হবে যারা কুর'আন পড়বে সত্য, কিন্তু তা তাদের গলদেশ অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়।[২৭৮]

মুসনাদে আহমাদের অন্য বর্ণনায় এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, পূর্ব দিক থেকে আমার উম্মতের মধ্যে এমন একদল লোকের আবির্ভাব ঘটবে যারা কুর'আন তেলাওয়াত করবে কিন্তু কুর'আনের বানি তাদের কণ্ঠনালি অতিক্রম করবে না। যত বারই তাদের কিছু অংশের প্রাদুর্ভাব দেখা যাবে ততবারই তারা ধ্বংস (হত্যা করা) হয়ে যাবে। এভাবে রাসূল (স.) দশ বার বলার পরে বলেন, 'যত বারই তাদের কিছু অংশের আবির্ভাব হবে ততবারই তারা ধ্বংস (হত্যা করা) হয়ে যাবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদেরই একটি গোষ্ঠীর মধ্যে দাজ্জালের আবির্ভাব হয়।[২৭৯]

খারেজী সম্প্রদায়ের উত্থান ও পতন

রাসূল (স.)-এর ওফাতের পর রাসূল (স.)-এরর সকল ভবিষ্যত বানী সত্য প্রমাণিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত খারেজীদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। হিজরি ৩৭ সালে একটি কাহিনীর মাধ্যমে খারেজীদের সম্পর্কে সকল ধারণা স্পষ্ট হয়ে যায়।

চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা)-এর শাসনের সময় ইসলামের খিলাফত নির্ধারণে মুসলিমরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি দল হযরত আলী (রা.)-কে এবং অন্য দল হযরত মুয়াবিয়া (রা.) কে খলীফা বানাতে চাচ্ছিলেন। ক্রমে অবস্থা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে রূপ লাভ করে [৬৫৭ সালের জুলাই মাসে আলী (রা.) এর সাথে মুয়াবিয়া (রা.) এর 'সিফফিন' নামক স্থানে যুদ্ধ হয়], তখন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বন্ধের জন্য হযরত আলী (রা.) দু'জন বিচারক নিয়োগ দিলেন, একজন হযরত আলী (রা.) এর পক্ষ থেকে অন্য জন মুয়াবিয়া (রা.) এর পক্ষ থেকে। সিফফীন যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর শাম ও ইরাকের সকল

২৭৭. *প্রাগুক্ত*
২৭৮. *প্রাগুক্ত*
২৭৯. *প্রাগুক্ত*

সাহাবীদের ঐক্যমত্যে বিচার ব্যবস্থা পৃথকীকরণ এবং আলী (রা.) এর কূফায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

তখনই খারেজী সম্প্রদায় আলী (রা.) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হারূরা প্রান্তরে এসে বসতি স্থাপন করে। সেনাবাহিনীতে তাদের সংখ্যা আট হাজার ছিল। বিচ্ছিন্নতার সংবাদ পেয়ে হযরত আলী (রা.) ইবন আব্বাস (রা.) কে তাদের কাছে পাঠান। ইবন আব্বাস (রা.) বুঝিয়ে শুনিয়ে তাদের থেকে দুই হাজারকে আলী (রা.) এর অনুসরণে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। অতঃপর আলী (রা.) কুফার মসজিদে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ ভাষণ দিলে মসজিদের এক কোনায়- "লা হুকমা ইল্লা লিল্লাহ" (আল্লাহ্‌র বিধান ছাড়া কারো বিধান মানি না, মানব না) স্লোগানে তারা মসজিদ ভারী করে তুলে। আলী (রা.) এর দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দেয় "আপনি বিচার ব্যবস্থা মানুষের হাতে তুলে দিয়েছেন! আল্লাহর বিধানে অবজ্ঞা প্রদর্শনের দরুন আপনি মুশরেক হয়ে গেছেন!"

খারেজীদের বক্তব্য, "হযরত আলী (রা.) বিচারের দায়িত্ব মানুষের ওপর ন্যাস্ত করেছেন, কিন্তু বিচারের মালিক আল্লাহ। আল্লাহ ছাড়া কারোও ফয়সালা মানা যাবে না।

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

"সিদ্ধান্ত তো আল্লাহ্ ছাড়া কারোর নয়।"[২৮০]

এ আয়াতের হুকুম ভঙ্গ করেছেন। তাই বিচারক নিয়োগ কুর'আন পরিপন্থী। সুতরাং আপনি কুফরি করেছেন এবং আপনি কাফের হয়ে গেছেন, আপনাকে তওবা করে পুনরাই ইসলাম গ্রহণ করতে হবে।" অথচ সত্য হল মানুষের মধ্যে ফয়সালার জন্য মানুষকেই বিচারক হতে হবে। আর ফয়সালা হবে আল্লাহর আইন অনুসারে। এ খারিজীরা নিজেদের নির্বুদ্ধিতা ধর্মীয় গোঁড়ামিতে রূপলাভ করে এবং মুসলিমদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ভয়াবহ সূচনা করে।

তখন আলী (রা.) বললেনঃ তোমাদের ব্যাপারে আমরা তিনটি সিদ্ধান্ত নিয়েছি,

১. মসজিদে আসতে তোমাদের আমরা বারণ করব না।

২. রাষ্ট্রীয় সম্পদ থেকে তোমাদের বঞ্চিত করব না।

৩. আগে-ভাগে কিছু না করলে আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না।

২৮০. আল কুরআন, ০৬:৫৭

কিছুদিন পর সাধারণ মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষ করতঃ তারা আব্দুল্লাহ্ ইবন খাব্বাব ইবন আরিত (রা:) কে হত্যা করে তার স্ত্রীর পেট ফেঁড়ে দু-টুকরা করে দেয়। আলী (রা.) জিজ্ঞাসা করেন, আব্দুল্লাহ্‌কে কে হত্যা করেছে? জবাবে তারা বলে ওঠলো 'আমরা সবাই মিলে হত্যা করেছি।' আর স্লোগান দিতে থাকে। এরপর আলী (রা.) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। নাহরওয়ান অঞ্চলে তাদের সাথে মুসলিমদের তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে খারেজীরা পরাজিত হয়। খারেজী সম্প্রদায়ের ফেতনাও সাময়িকভাবে খতম হয়ে যায়।

পরজিত খারেজীদের বংশধর ও অনুসারীরা এরপরেও বিভিন্ন সময় আত্মপ্রকাশ করে এবং ফিতনা ফাসাদ বাধাতে উদ্যত হয়।

খারেজীদের কিছু বৈশিষ্ট্য

- খারেজীদের উৎপত্তি হবে পূর্ব দিক থেকে (রিয়াদ, ইরাক ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল)
- তারা বয়সে হবে নবীন ও তরুণ যারা নিজেদের অনেক জ্ঞানী ভাববে।
- খারেজীরা মুসলিমদেরকে যে কোন গুনাহের (বিশেষ করে গুনাহে কবিরা) জন্য কাফের বলে সম্বোধন করে এবং সামান্য ব্যাপারে কুফরের ফতোয়া দেয়।
- তারা মুসলিমদের হত্যা করবে শুধু মাত্র ধর্মীয় মতের অমিলের কারণে। কিন্তু তারা কাফের, মুশরিক, কবর ও মূর্তি পূজারীদের ছেড়ে দিবে।[২৮১]
- তারা মুসলিমদের প্রতি হবে কঠোর কাফেরদের প্রতি হবে নমনীয়।
- তারা কথায় কথায় মুসিলমদের তাকফীর করবে (কাফের বলে সম্বোধন করবে)।
- তারা হবে ইবাদতে অন্যদের চেয়ে অগ্রগামী কিন্তু নিজেদের ইবাদতের জন্য হবে অহংকারী।
- তারা কুর'আন পড়বে কিন্তু কুর'আন বুঝবে না বরং উল্টোটা বুঝবে।
- তারা সর্বোত্তম কথা বলবে কিন্তু সর্ব নিকৃষ্ট কাজ করবে।
- কুর'আনের যেসব আয়াত কাফেরদের জন্য প্রযোজ্য তা তারা অজ্ঞভাবে মুসলিমদের ওপর প্রয়োগ করবে।
- পৃথিবীতে সব সময়ই খারেজী আকিদার লোক থাকবে এবং সর্বশেষ এদের মধ্য থেকেই দাজ্জালের আবির্ভাব হবে।[২৮২]

খারেজী চিনার উপায়

২৮১. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩০৯৫, ৩৩৪১, ৩৩৪২
২৮২. *সুনানুন নাসায়ী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪০৩৪

১. হযরত আলী (রা.)

অতীতের খারেজী সম্প্রদায় ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.) কে মুশরিক এমনকি কাফির বলতেও দ্বিধাবোধ করত না। খারেজী সম্প্রদায়ের সাথে বিশাল যুদ্ধে তিনি এদের পরাজিত করেন। তাই খারেজি সম্প্রদায় তাঁর প্রশংসামূলক যে সব সহীহ হাদীস আছে সেগুলোকে জাল-যয়ীফ হিসেবে প্রচারণা চালায় এবং যারা তাঁর প্রশংসা করে তাদেরকে শিয়া-সূফী মনে করে। অতীতের খারেজী সম্প্রদায় তাঁর বিরোধীতা করত সরাসরি আর এখনকার খারেজিরা করে পরোক্ষভাবে।

২. ইমাম হাসান ও হোসাইন (রা.)

রাসূল (স.) এর প্রিয় দৌহিত্র জান্নাতের পুরুষদের সর্দার ইমাম হাসান ও হোসাইন (রা.) খারেজিদের চোখের কাঁটা। অতীতের খারেজিরা সরাসরি ইমাম হাসান ও হোসাইন (রা.) এর বিষোদগার করত। বর্তমান খারেজীরা তাদের বিষোদগার করার সাহস পায় না বটে তবে তাদের প্রশংসাকারীদের শিয়া বলে অভিহিত করে।

৩. আমীরে মুয়াবিয়া (রা.)

খারেজীরা আমীরে মুয়াবিয়া (রা.) কে কাফের মনে করে কিন্তু তার ছেলে ইয়াজিদকে পাক্কা মুসলিম মনে করে। কারণ মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে খারেজীদের যুদ্ধ হয়েছিল, আবার ইয়াজিদ খারেজীদের জানের দুশমন ইমাম হোসাইন (রা.)-কে হত্যা করেছিল। খেয়াল করলে দেখা যায় খারেজীরা ইয়াজিদের নামের পাশে (রা.)ও লাগায়!।

৪. ইমাম আবু হানিফা (র.)

ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর সাথে খারেজী-মুতাযিলা সম্প্রদায়ের অনেক বাহাস হয়েছিল। সে সবের একটি বাহাসেও খারেজীরা তাঁর সাথে পেরে ওঠেনি। তাই খারেজীরা তাঁকে পছন্দ করত না ও তাঁর নামে বানোয়াট কথা ছড়াত। আজকের খারেজী সম্প্রদায়ের অনেকেই তাঁকে পছন্দ করে না ও তাঁর নামে বানোয়াট কথা ছড়ায়।

৫. ইমাম আশ'আরী (র.) এবং ইমাম মাতুরুদী (র.)

ইমাম আশ'আরী (র.)-এর পূর্ণ নাম ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরি (র.) এবং পরবর্তিতে তিনি ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র.)-এর পাশাপাশি ৩য় শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হিসেবে সমস্ত আলেমগণের নিকট স্বীকৃত পান। ইমাম আশ'আরী (র.) এক সময় খারেজী-মুতাযিলা ছিলেন। কিন্তু পরবর্তিতে তিনি এ সম্প্রদায়ের আক্বীদা যে কতটা ভ্রান্ত তা বুঝতে পেরে এদের সংস্পর্শ তো ত্যাগ করেনই সে সাথে এদের বিরুদ্ধে বই লিখে

এদের আক্বীদা সংক্রান্ত সমস্ত ভ্রান্ত মতবাদকে খণ্ডন করে অসংখ্য বই রচনা করেন। ইমাম মাতুরুদী (র.) ও ঠিক একই কাজ করেছিলেন। যার কারণেই খারেজী-মুতাযিলারা তাঁদেরকে একদমই পছন্দ করত না।

আজকের খারেজী সম্প্রদায়ের অনেকেই তাঁদেরকে পছন্দ করে না; বরং ইসলামী আক্বীদাগুলোকে নিজেদের সুবিধামত কখনও 'আশ'আরী আক্বীদা', আবার কখনোও 'মাতুরুদী আক্বীদা' হিসেবে আখ্যায়িত করে সাধারণ মানুষদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করে চলেছে। বর্তমান জামানার খারেজীরা এ দুই মহান ইমামের নাম শুনলেই হতচকিত হয়ে ওঠে।

বর্তমান যামানার খারেজী

ওপরে উল্লেখিত খারেজীদের ইতিহাস খারেজীদের বৈশিষ্ট্যের সাথে বর্তমান ও কিছুকাল পূর্বে যাদের হুবহু মিল আছে তারাই হল এ যুগের খারেজী। লক্ষনীয় বিষয় যে, খারেজীদের সাথে কারো সাধারণ বৈশিষ্ট্য মিলে গেলেই সে খারেজী নয়, তবে এ গুণ পরিহার্য। একজন মুসলিমের খারেজী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, যে কোন কুফুরি কাজ করার কারণে সে তাৎক্ষনিক মুসলিমদের কাফের বা বিদআতি বলবে এবং কাফেরদের রেখে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। শাসকের ভুলের কারণে শাষকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে মুসলিম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

বর্তমান মধ্য প্রাচ্যের কিছু রাজতান্ত্রিক দেশের রাজাদের কাফেরদের প্রতি কী পরিমাণ নমনীয়তা ও মসলিমদের প্রতি কি পরিমাণ কঠোরতা তা সকলেরই জানাশুনা, এগুলি বলার প্রয়োজন বোধ করছি না। এরাই সে খারিজী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত কী না? সন্দেহের দাবী রাখে।

মুসলিমদের প্রকাশ্য দুশমন ইন্ডিয়া, ইসরাঈল, আমেরিকা হচ্ছে এদেশগুলোর প্রভু। এরা আল্লাহর পরিবর্তে আমেরিকাকে প্রভু বানিয়ে বহু আগেই যেন ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেছে।

ইরাক ও সিরিয়ায় খারেজীদের আবির্ভাব হয়েছে যারা আইসিস (ISIS) নামে পরিচিত, প্রথমদিকে অনেকেই এদেরকে মুজাহিদ ভেবেছিলেন।

এদের আসল রূপ প্রকাশিত হয়ছে ২০১১-২০১৫ এ সময়কালে। এরা স্বৈরাচার বাসার আল আসাদকে বাদ দিয়ে সিরিয়ার মুজাহিদদের হত্যা করেছে যার সুস্পষ্ট প্রমাণ বিশ্ববাসী দেখেছে। সারা বিশ্বের মুসলিমদের প্রাণপ্রিয় ইসলামী সংগঠনগুলো ইতোমধ্যে এদের গোমরাহ পথভ্রষ্ট খারেজী ঘোষণা করেছে। এরা আহলুল আকদের সমর্থন না নিয়ে খিলাফাহ ঘোষণা করেছে এবং তাদের অবৈধ খিলাফাহ যারা মানতে অস্বীকার করেছে তাদের ব্রাশ ফায়ার করেছে ইরাক ও সিরিয়াতে। অথচ পাশেই অবৈধ ইসরাঈল ফিলিস্তিনি মুসলিমদের নির্মমভাবে হত্যা করছে, আসাদ সিরিয়াতে সুন্নি মুসলিমদের হত্যা করছে। সেদিকে তাদের ভ্রুক্ষেপ নেই তারা নেমেছে মুসলিম হত্যা করে বাইয়াহ আদায়

করতে। খারেজীদের মূল বৈশিষ্ট্য কাফেরদের ছেড়ে দিয়ে মুসলিমদের হত্যা করে[২৮৩] আইসিস (ISIS) এর মধ্যে এ আলামত রয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয়।

---

২৮৩. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত

সপ্তম অধ্যায়

মুসলিম উম্মাহর সমকালীন অনৈক্য (২০০০-২০১৫)

আজকের মুসলিম উম্মাহ কোন না কোনভাবেই সর্বত্র নির্যাতিত নিপীড়িত। ধুকে ধুকে সারা পৃথিবীতে মার খাচ্ছে শুধুমাত্র নিজেদের মাঝের অনৈক্যের কারণে। এ অনৈক্যের কী আবস্থা তার একটা চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো:-

একে অপরের প্রতি মন্দ ধারণা

একে অপরের প্রতি মন্দ ধারণা, গীবত, পরনিন্দা আজ গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা কর্মীদের নিত্যদিনের এজেন্ডায় পরিণত হয়েছে। একজন আরেকজনের, একদল আরেকদলের গীবত করেই যেন ক্ষমতায় থাকতে চায় অথবা ক্ষমতায় আসতে হয়, এমন একটা সিদ্ধান্ত তারা স্থির করে নিয়েছে। এছাড়াও শিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত, মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিত কিংবা জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিত সকল স্তরের মানুষের মাঝে এগুলো মহামারি আকার ধারণ করেছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা গীবত থেকে দূরে থাকতে কুর'আনুল কারীমে সরাসরি দিক নির্দেশনা দিয়ে রেখেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

"হে ঈমানদারগণ তোমরা বহুবিদ ধারণা থেকে দূরে থাক; কারণ কোন কোন ধারণা পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না। একে অপরের পশ্চাতে গীবত (নিন্দা) করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মরা ভাইয়ের গোস্ত খেতে পছন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরাতো এটাকে ঘৃণ্যই মনে কর। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চই আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।"[২৮৪]

অপরের দোষ অন্বেষণ

মুসলিমদের বিরাট একটা অংশ বর্তমানে নিজেরা অন্যের দোষ ত্রুটি খুজতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এতে দেশ ও জাতি উভয়ই ক্ষতি গ্রস্থ হচ্ছে। আর ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রুরা লাভবান হচ্ছে। অন্যের মন্দ বিষয় নিয়ে নিজেরা নিজেরা কানাঘুষা করা, এটা

২৮৪. আল কুরআন, ৪৯:১২

মারাত্মক অপরাধ। আল্লাহ তা'আলা কুর'আনুল কারীমে এ বিষয়ে সরাসরি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ

"আপনি কি তাদেরকে লক্ষ্য করেন না, যাদেরকে গোপন পরামর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছিল? তারপর তারা যা নিষিদ্ধ তারই পুনরাবৃত্তি করে এবং পাপাচরণ, সীমালঙ্ঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের জন্য গোপন পরামর্শ করে। আর যখন তারা আপনার কাছে আসে তখন তারা আপনাকে এমন কথা দ্বারা অভিবাদন করে যা দ্বারা আল্লাহ আপনাকে অভিবাদন করেননি। আর তারা মনে মনে বলে 'আমরা যা বলি তার জন্য আল্লাহ আমাদের শাস্তি দেন না কেন?' জাহান্নামই তাদের জন্য যথেষ্ট, যেখানে তারা দগ্ধ হবে। আর কত নিকৃষ্ট সে গন্তব্যস্থল!"[২৮৫] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

"হে মু'মিনগণ তোমরা যখন গোপন পরামর্শ করবে, সে পরামর্শ যেন পাপাচার, সীমালঙ্ঘন ও রাসূলের বিরদ্ধাচরণ সম্পর্কে না হয়। কল্যাণকর কাজ ও তাকওয়া অবলম্বনের পরামর্শ কর এবং ভয় কর আল্লাহকে যাঁর নিকট তোমরা সমবেত হবে। গোপন পরামর্শ তো কেবল শয়তানের প্ররোচনায় হয় মু'মিনদেরকে দুঃখ দেয়ার জন্য। তবে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া শয়তান তাদের সামান্যতম ক্ষতি সাধনেও সক্ষম নয়। অতএব আল্লাহর ওপরই মু'মিনরা যেন নির্ভর করে।"[২৮৬]

তিনজন থাকলে দু'জনকে কানাকানি করতে বিশ্ব নবী (স.) নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'যেখানে তোমরা তিনজন একত্রিত সেখানে দুইজন তৃতীয়জনকে রেখে পরস্পরে কানাকানি ও গোপন কতাবার্তা বলবে না, যে পর্যন্ত আরো লোক এসে যায়। কারণ এতে সে মনঃক্ষুন্ন হবে, সে নিজেকে পর বলে ভাববে এবং তার বিরুদ্ধেই কথা বার্তা হচ্ছে বলে সে সন্দেহ করবে।"[২৮৭]

---

২৮৫. আল কুরআন, ৫৮:০৮

২৮৬. আল কুরআন, ৫৮:০৯-১০

২৮৭. *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২১৮৪

হিংসা

হিংসা মানুষের সব ভাল আমলকে বরবাদ করে দেয়। হিংসা করা হারাম ও মহাপাপ। এটাই আকাশে কৃত ইবলিসের সর্বপ্রথম গুণাহ এবং এটাই পৃথিবীতে কৃত আদম সন্তান কাবিলের সর্বপ্রথম গুণাহ। আকাশে ইবলিশ আদম (আ.)-এর প্রতি এবং পৃথিবীতে আদম পুত্র তার ভাইয়ের প্রতি হিংসা করেই ধ্বংস প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।[২৮৮] আল্লাহ তা'আলা কুর'আনুল কারীমে বলেছেন:

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

"আর (আমি আশ্রয় চাই) হিংসুকের হিংসা থেকে যখন সে হিংসা করে।"[২৮৯] **حَسَد** যার শাব্দিক অর্থ হিংসা। হিংসার মানে হচ্ছে, কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ যে অনুগ্রহ, শ্রেষ্ঠত্ব বা গুণাবলী দান করেছেন তা দেখে কোন ব্যক্তি নিজের মধ্যে জ্বালা অনুভব করে এবং তার থেকে সেগুলো ছিনিয়ে নিয়ে এ দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেয়া হোক, অথবা কমপক্ষে তার থেকে সেগুলো অবশ্যই ছিনিয়ে নেয়া হোক– এ আশা করা। তবে কোন ব্যক্তি যদি আশা করে অন্যের প্রতি যে অনুগ্রহ করা হয়েছে তার প্রতিও তাই করা হোক, তাহলে এটাকে হিংসার সংজ্ঞায় ফেলা যায় না। সুতরাং হিংসার মূল হলো, কারো নিয়ামত ও সুখ দেখে দগ্ধ হওয়া ও সে নিয়ামতের অবসান কামনা করা। হিংসার বশবর্তী হয়েই ইয়াহুদীরা বিশ্ব নবী (স.)-কে যাদু করেছিল এবং তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল।[২৯০] তাছাড়াও ইয়াহুদী, মুশরিক ও মুনাফিকরা মুসলিমদের ইসলামের নি'আমত পাওয়া দেখে হিংসার অনলে দগ্ধ হত। নবী (স.) বলেছেন:

إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ أَوْ قَالَ الْعُشْبَ

"সাবধান! তোমরা হিংসা থেকে দূরে থাক। নিশ্চই হিংসা নেক আমলগুলোকে এমনভাবে খেয়ে ফেলে যেমনি আগুন লাকড়িকে খেয়ে ফেলে (জ্বালিয়ে দেয়)।"[২৯১]

সাময়িক ক্ষমতার লোভ

দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মুসলিম দেশ এবং বিশ্বের নেতৃত্ব সাধারণত নেতৃস্থানীয়রাই দিয়ে থাকেন। তাদের একতাই মুসলিম বিশ্বের একতা। কিন্তু নেতৃস্থানীয়দের দুনিয়ার সাময়িক ক্ষমতার লোভ লালসার কারণে মুসলিমগণ স্থায়ী কোন বিষয়ে এক হতে পারছে না। কেউ কেউ যদি একতা কামনা করেও তারা চায় তাদের অধীনে সবাই একতাবদ্ধ হোক। আমাদের দেশেরও একই অবস্থা-এখানে জাতীয় কোন ইস্যু নিয়ে এক হওয়া সম্ভব হচ্ছে না সাময়িক নেতৃত্বের লালসার কারণে। অথচ সাময়িক

---

২৮৮. *কুরআনুল কারীম বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর*, প্রাগুক্ত, খন্ড-০৩, পৃ. ২৯২৭

২৮৯. আল কুরআন, ১১৪:০৫

২৯০. *কুরআনুল কারীম বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২৭-২৯২৮

২৯১. *সুনানু আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪২৫৭

এ লালসা যদি বর্জন করে এক হওয়া যায় তাহলে জনশক্তি, ভৌগলিক অবস্থান ইত্যাদির বিবেচনায় বাংলাদেশ এশিয়ার টাইগার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

পরকালের সাফল্যের প্রতি অনাসক্তি

পৃথিবীর সফলতাই আসল সফলতা নয়। আবার পৃথিবীর ব্যর্থতাই আসল ব্যর্থতা নয়। বরং আল্লাহ তা'আলার বক্তব্য হচ্ছে:

وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى

"আর অবশ্যই আপনার জন্য পরকাল ইহকাল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"[২৯২]

এ কারণেই বিশ্ব নবী (স.) পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ইবাদত করতেন এবং দুনিয়া বিমূখ জীবন যাপন করতেন।[২৯৩] নবী (স.) এর জীবনী যাঁরা পাঠ করেছেন তাঁদের কাছে এ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। মুসনাদে আহমাদে হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন:

اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير، فأثر في جنبه، فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه وقلت يا رسول الله، ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما لي وللدنيا! ما أنا والدنيا! إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظَلّ تحت شجرة، ثم راح وتركتها

"রাসূল (স.) একটি খেজুর পাতার চাটাইর ওপর শুয়েছিলেন। ফলে তাঁর শরীর মোবারকের পার্শ্বদেশে চাটাইর দাগ পড়ে গিয়েছিল। তিনি ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর আমি তাঁর পিঠে হাত বুলিয়ে বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল (স.)! চাটাইর ওপর আমাকে কিছু বিছিয়ে দেয়ার অনুমতি দিন!' তিনি আমার একথা শুনে বললেন, 'পৃথিবীর সাথে আমার কী সম্পর্ক? আমি কোথায় এবং দুনিয়া কোথায়? আমার এবং দুনিয়ার দৃষ্টান্ত তো সে পথচারী পথিকের মত যে একটি গাছের ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করে। তারপর গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে চলে যায়।"[২৯৪]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন:

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى

"তোমার প্রতিপালক অচিরেই তোমাকে এমন নিয়ামত দিবেন যে, তুমি খুশি হয়ে যাবে।"[২৯৫] আল্লাহ তা'আলা সূরা তাওবাতে বলেছেন:

---

২৯২. আল কুরআন, ৯৩:০৪
২৯৩. *তাফসীর ইবনে কাসীর*, প্রাগুক্ত, খন্ড-১৮, পৃ. ১৯৫,
২৯৪. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬
২৯৫. আল কুরআন ৯৩:০৫

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"আর বলুন, 'তোমরা কাজ করতে থাক, অচিরেই আল্লাহ তোমাদের কাজ কর্ম দেখবেন এবং তাঁর রসূল ও মু'মিনগণও। আর অচিরেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে গায়েব ও প্রকাশ্যের জ্ঞানীর নিকট, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জানিয়ে দিবেন।"[২৯৬]

অমুসলিমদের ইসলাম বিদ্বেষ

অমুসলিমদের একটা অংশ সর্বদাই কামনা করে ইসলাম এবং মুসলিমরা কষ্ট এবং বিপদে থাকুক। এর কারণে বিভিন্ন দেশে মুসলিমদের নাগরিকত্ব বাতিল করে দিতে পর্যন্ত দেখা যায়। মুসলিমদের সর্ব শ্রেষ্ঠ জায়গা পবিত্র মসজিদ দখল করে মন্দির, গীর্জা, ঘোড়ার আস্তাবল বানাতে দেখা যায়। এমনকি পবিত্র মসজিদ জবর দখল করে সেখানে নিকৃষ্ট প্রাণী শুকর লালন-পালনের মত ঘটনাও অমুসলিমরা ঘটাচ্ছে। অহরহ বিভিন্ন অমুসলিম দেশে মুসলিমদের পবিত্র স্থান মসজিদ ভেঙ্গে দেয়া হচ্ছে।

ইসলামের দুশমনদের চক্রান্ত

ইসলামের দুশমনরা সর্বদাই তৎপর ইসলাম এবং মুসলিমদের ক্ষতি সাধন করার জন্য। মাঝে মাঝে তাদের মুখ থেকে ইসলাম এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে যে ধরনের হিংসাত্মক ও ধ্বংসাত্মক কথা বের হয় তা দিয়েই বুঝা যায় তারা মুসলিমদের ক্ষতি সাধন ও ধ্বংস করতে কতটা তৎপর।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা মু'মিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গবন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের অনিষ্ট সাধনে কোন ক্রটি করবে না। যাতে তোমরা বিপন্ন হও, তাই তারা কামনা করে। তাদের মুখেই বিদ্বেষ প্রকাশ পায়, আর যা তাদের অন্তরে লুকিয়ে রয়েছে তা আরো জঘন্য। আমি তোমাদের কাছে তাদের লক্ষণগুলো স্পষ্ট করে দিলাম, যদি তোমরা বুঝতে পার।"[২৯৭]

---

২৯৬. আল কুরআন, ০৯:১০৫

২৯৭. আল কুরআন, ০৩:১১৮

মুনাফিকরা মন্দ কাজে উৎসাহিত করে ভাল কাজে বাধা দেয়

মুনাফিকরা মানুষকে মন্দ কাজে উৎসাহিত করে আর ভাল কাজে নিরুৎসাহিত করে ও বাধা দেয়। আল্লাহ তাদের অভ্যাসের বিষয়ে কুর'আনুল কারীমে জানিয়ে রেখেছেন:

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"মুনাফিক পুরুষ এবং নারীরা একে অপরের অংশ, তারা অসৎ কাজে নির্দেশ দেয় এবং সৎ কাজে বাধা দেয়, তারা তাদের হাতকে (দান করা থেকে) গুটিয়ে রাখে। তারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছে। ফলে তিনিও তাদের ভুলে গিয়েছেন; নিশ্চই মুনাফিকরাতো ফাসিক।"[২৯৮]

পক্ষান্তরে মু'মিন এবং মুসলিমগণ তাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা মানুষকে ভাল কাজের আদেশ দেন এবং মন্দ কাজে বাধা প্রদান করেন। তারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং ইয়াকীন রাখেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য যাদের বের করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দিবে, অসৎ কাজে বাধা দিবে এবং আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে। আর আহলে কিতাবগণ যদি ঈমান আনতো তবে তা ছিল তাদের জন্য ভাল। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মু'মিন আছে কিন্তু তাদের অধিকাংশই ফাসিক।"[২৯৯]

বিভিন্ন চিন্তা লালনকারী রাজনৈতিক দলসমূহ

দেশে দেশে বিভিন্ন চিন্তা ও দর্শন লালনকারী রাজনৈতিক দলের উত্থান ও ক্ষমতা গ্রহণ মুসলিম উম্মাহকে একত্র না করে বিভক্ত করে দিয়েছে। যেমন, আমাদের দেশে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি ইত্যাদী রাজনৈতিক দল। এগুলোর নেতাকর্মীরা মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও এক হবার মত কোন এজেন্ডা তাদের হতে নাই। দ্বিতীয় বৃহত্তর মুসলিম দেশ পাকিস্তানের একই অবস্থা সেখানে পিটিআই, পিপিপি, পিএলএমএন, এএনপি, এমকিউএম, এমএমএ, পিকেএমএপি, এডব্লিউপি ইত্যাদী রাজনৈতিক দল রয়েছে যার প্রায় সবগুলোর নেতৃবৃন্দই মুসলিম।[৩০০] এভাবে গণতান্ত্রিক প্রতিটি মুসলিম দেশে অসংখ্য

২৯৮. আল কুরআন, ০৯:৬৭
২৯৯. আল কুরআন, ০৩:১১০
৩০০. *দৈনিক বাংলা নিউজ ২৪ ডট কম*, ১৪ জুলাই-২০১৮

দল রয়েছে ঠিকই কিন্তু মুসলিম উম্মাহকে একতাবদ্ধ করার মত কোন এজেন্ডা এ দলগুলোর নাই।

ফিলিস্তিন

দীর্ঘদিন পর্যন্ত দখলদার ইসরাঈল নিরীহ মাযলুম মুসলিম ফিলিস্তিনীদের ওপর শতাব্দির ভয়াবহ অত্যাচার এবং নির্যাতন করা সত্ত্বেও আজও ফিলিস্তিনী মুসলিম রাজনৈতিক দল হামাস এবং ফাতাহ এক হতে পারল না। গত একদশকেরও বেশি সময় ধরে ইসরাঈল ও মিসরের অবরোধের মুখে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় উন্মুক্ত কারাগারে পরিণত হয়েছে ফিলিস্তিনের গাজা। তার ওপর এ দু'টো সংগঠনের দ্বন্দের কারণে অবস্থা আরো ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। হামাসকে চাপে রাখতে গাজার বিদ্যুৎ সুবিধা বন্ধ করাসহ সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন কেটে নেয়ার আদেশ দিয়েছেন ফাতাহ দলের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস। ফাতাহ পরিচালিত ফিলিস্তিনী কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্মরত গাজার অনেক বাসিন্দার বেতন বন্ধ করে দেয়ার নিউজও সে সময়ের পত্র পত্রিকায় এসেছিল। ফিলিস্তিনী কর্তৃপক্ষের মূল শক্তি হল ফাতাহ। তবে দলটি ইসরাঈলি দখলদার সরকারের সমর্থনপুষ্ট। অন্যদিকে হামাস ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘদিন সশস্ত্র সংগ্রাম করে আসলেও ২০০৭ সালে নির্বাচনে অংশ নেয়। গাজায় নির্বাচনে জয়লাভের পর সেখান থেকে তারা ফাতাহর নিয়ন্ত্রণ কেড়ে নেয়। সে সময় থেকেই হামাস ও ফাতাহর মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর তখন থেকেই গাজায় অবরোধ আরোপ করে রেখেছে ইসরাঈল ও মিশর। তারা গাজায় যে কোন পণ্য সামগ্রী আমদানী-রপ্তানীতে কড়া নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। ইসরাঈল মনে করে এতে হামাস চাপে থাকবে আর গাজাবাসীও নিষেধাজ্ঞা শিথিলের আশায় হামাসকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করবে।[৩০১]

মিশরের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একমাত্র প্রেসিডেন্টকে উৎখাত

হযরত ইউসুফ ও মূসা (আ.) এর স্মৃতিবিজড়িত এবং পিরামিডের দেশ খ্যাত প্রাচীন সভ্যতার দেশ মিশরে ২০১২ সনে প্রথম গণতান্ত্রিকভাবে বিপুল ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন হাফেয ড. মোহাম্মাদ মুরসী। কিন্তু তাঁকে আমেরিকা, ইসরাঈল, আরব আমিরাত এবং সৌদি আরবের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ইন্ধনে এক বছরের মাথায় অপসারণ করা হয়। এ চক্রান্তে সে দেশের ইসলামী দল আন-নূর পার্টির নেতাকর্মীরাও জড়িত ছিল বলে পত্র পত্রিকায় প্রকাশ পায়।

---

৩০১. হামাস ফাতাহ দ্বন্দে গাজায় মানবিক সংকট, *অনলাইন দৈনিক বাংলা ট্রিবিউন*, প্রকাশিত ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৮

সৌদি আরব ও ইরান

মধ্যপ্রাচ্যের প্রভাবশালী মুসলিম দেশ সৌদি আরব ইয়াহুদীবাদী একমাত্র অবৈধ দেশ ইসরাঈলের যে পরিমাণ বিরোধীতা করে তার থেকে অনেক বেশি বিরোধিতা করতে দেখা যায় ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরানকে নিয়ে। যা আসলেই অনভিপ্রেত এবং মুসলিম উম্মাহর জন্য চরম হতাশা ও দুখঃজনক বিষয়। এভাবেই চলছে যুগ যুগ ধরে। আর দিনদিন যেন এ শত্রুতার মাত্রা বাড়তেই আছে।

কাতার অবরোধ

কাতার ও সৌদি আরব অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ তৈল উৎপাদনকারী দু'টো উপসাগরীয় আরবী ভাষাভাষি মুসলিম দেশ। নিজেদের মাঝে রেষারেষির এক পর্যায়ে সৌদি আরব কাতারকে বয়কটের ঘোষণা দেয়। আর এর মাধ্যমে অমুসলিম দুশমনরাই লাভবান হল বিশেষ করে ইসরাঈল। পক্ষান্তরে কাতারসহ মুসলিম দেশগুলোই ক্ষতিগ্রস্থ হল।

মিডিয়ার মিথ্যা প্রচারণা

পশ্চিমের বিচিত্র ধর্মীয় প্রচার কৌশলের মাধ্যমে ভুয়া তথ্য ছড়িয়ে কাজ হাসিল করে নেয়া তাদের একটা মারাত্মক অস্ত্র। ডঃ সুকর্ণের আমলে ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া যুদ্ধের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল পশ্চিমের ছড়ানো ভুল তথ্যের ওপরে ভিত্তি করেই। সোভিয়েত গোয়েন্দা সংস্থা কেজিবি ছদ্ম পরিচয়ে ভুল তথ্য দিয়ে উভয়কেই বুঝিয়েছিল যে, সে আক্রান্ত হতে যাচ্ছে। ফলে উভয় দেশই একে অপরের বুকে বন্দুক তাক করে ধরেছিল। পরে একজন কেজিবি এজেন্ট বিস্ময়ের সাথে এ সম্পর্কে বলেছিল, "আমাদের তথ্য প্রচারণা এমন ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করে যা আমাদেরকেই হতবাক করে দেয়।" পশ্চিমের প্রচার শক্তি আগের চেয়ে আজ আরো বেড়েছে। তারা সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য করবার ক্ষমতা রাখে। পশ্চিমের এ শক্তি ইসলামের উত্থান ও মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের পথে আজ এক বিপজ্জনক বাঁধা।[৩০২]

২০০১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর আমেরিকার টুইন টাওয়ারে কথিত বিমান হামলার অপবাদ কোন তথ্য প্রমাণ ছাড়াই মিডিয়ায় ভর করে চাপিয়ে দেয়া হল শান্তি প্রিয় মুসলিম দেশ তৎকালিন তালেবান সরকার শাসিত আফগানস্তানের ওপর। কারো আর খতিয়ে দেখার সুযোগ থাকলো না। পরিণতি কী হল? গোটা আফগানিস্তানকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করল আমেরিকা। কত বনীআদমকে আমেরিকা হত্যা করল তার কোন হিসাব-নিকাশ নেই। ফলাফল দাঁড়ালো ২০১৯ সালের ২৯ ডিসেম্বরে সে আফগান তালেবানদের সাথেই

৩০২. আবুল আসাদ, *একুশ শতকের এজেন্ডা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

আমেরিকা শান্তি চুক্তি করল। কিন্তু প্রশ্নই থেকে গেল তাহলে ঊনিশ বছর আগে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে কেন আফগানে হামলা করা হল? কেন লক্ষ লক্ষ নিরাপরাধ পুরুষ নারী ও শিশুকে হত্যা করা হল? কে দিবে এর ক্ষতিপূরণ ও এর সঠিক জবাব?

তবে আজকে জবাব না দিলেও ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না কাউকে ছেড়ে দেয় না। একদিন মিথ্যা প্রপাগান্ডা পরিচালনাকারীদের অবশ্যই জবাব দিতে হবে, ইতিহাসের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবেই। যারা আজকে অন্যায় অপকর্ম করে যাচ্ছে হয়তবা সেদিন তারা থাকবে না কিন্তু তাদের ছেলে-সন্তান, নাতী-নাতনীরা তো থাকবেই মাশুল হয়তোবা তাদেরকেই গুণতে হবে। কারণ পৃথিবী ব্যাপী এমনটিই লক্ষ করা যায়। অপকর্ম করে, মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে কোন জাতি সারা জীবন টিকতে পারে না। পতন তার আছেই, আজ অথবা কাল।

অষ্টম অধ্যায়

ঐক্য প্রচেষ্টা (২০০০-২০১৫)

নতুন শতকের শুরুতে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় যে প্রতিষ্ঠানগুলো মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে সেগুলোর কয়েকটির বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হল:-

ইসলামিক মিলিটারি কাউন্টার টেররিজম কোয়ালিশন (আই এম সি টি সি) গঠন

ইসলামিক মিলিটারী কাউন্টার টেররিজম বা ৪১ দেশীয় মুসলিম সামরিক জোট।

প্রতিষ্ঠাকাল : ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৫

উদ্দেশ্য: Counter-terrorism

সরকারি ভাষা: আরবি, ইংরেজি ও French

প্রতিষ্ঠার স্থান: সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে।

অঞ্চল: সমগ্র মুসলিম বিশ্ব

ইসলামিক মিলিটারি কাউন্টার টেররিজম কোয়ালিশন (আইএমসিটিসি; আরবি: التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الارهاب) আইএসআইএল এবং অন্যান্য সন্ত্রাসবাদবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সামরিক হস্তক্ষেপে ঐক্যবদ্ধ একবিংশ শতকের প্রথমভাগের একটি মুসলিম বিশ্বের আন্তঃসরকারী-সন্ত্রাসবাদ বিরোধী জোট।

জোট ঘোষণার সময় সেখানে ৩৪ সদস্য ছিল। ডিসেম্বর ২০১৬ সালে ওমানসহ আরো কয়েকটি মুসলিম দেশ যোগদানের পরে সদস্য সংখ্যা ৪১ এ পৌঁছেছে। এর অংশগ্রহণকারীদের বেশিরভাগই ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থার সদস্য।[৩০৩]

এলায়েন্স গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আইএমসিটিসি জানিয়েছে যে, এর প্রাথমিক লক্ষ্য মুসলিম দেশগুলোকে সমস্ত সন্ত্রাসবাদী দল ও সন্ত্রাসী সংগঠন থেকে রক্ষা করা। আইএমসিটিসি নিশ্চিত করেছে যে, এটি সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কিত জাতিসংঘ এবং ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) বিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করবে।[৩০৪]

আইএমসিটিসি চালুর জন্য সংবাদ সম্মেলনে এর মুখপাত্র মোহাম্মদ ইবন সালমান বলেছিলেন যে, তারা ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়া, মিশর এবং আফগানিস্তানে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রচেষ্টা "সমন্বিত" করবে। তিনি বলেছিলেন, "সিরিয়া ও ইরাকে অভিযানের ক্ষেত্রে বড় শক্তি ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সাথে আন্তর্জাতিক সমন্বয় হবে।"[৩০৫]

আজ অবধি এর সমস্ত সদস্য হয়েছে সুন্নি-অধ্যুষিত সরকার ও দেশগুলো। জোটে ইরান, ইরাক এবং সিরিয়ার মতো শিয়া অধ্যুষিত সরকারগুলির সাথে কোনও দেশ অন্তর্ভুক্ত নয়। ইউরোনিউজের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কিছু বিশ্লেষক ইরানের সাথে লড়াইয়ে মধ্যপ্রাচ্য ও মুসলিম বিশ্বে অগ্রণী ভূমিকা নেওয়ার সৌদিআরবের প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে এ জোট গঠনকে দেখছেন।

এ জোটের মধ্যে থাকা দেশের তালিকায় বাংলাদেশও রয়েছে। সৌদিআরবের সরকারি বার্তা সংস্থা জানিয়েছে, সৌদিআরবের রাজধানী রিয়াদ থেকেই জোট বাহিনীর কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

এসপিএ জানিয়েছে, জোটের সদস্য দেশগুলোর মধ্যে আরব, দক্ষিণ এশিয়া আর আফ্রিকার দেশগুলো রয়েছে। তবে ইরানকে এ জোটের অর্ন্তভুক্ত করা হয়নি। জোটে নেই আফগানিস্তান, ইরাক এবং সিরিয়াও।

---

৩০৩. *উইকিপিডিয়া*
৩০৪. *প্রাগুক্ত*
৩০৫. *প্রাগুক্ত*

একটি সংবাদ সম্মেলনে সৌদি প্রতিরক্ষামন্ত্রী যুবরাজ মোহাম্মাদ ইবন সালমান বলেছেন, এ জোট ইরাক, সিরিয়া, মিশর আর আফগানিস্তানে সন্ত্রাসী ও চরমপন্থিদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে।

যুবরাজ সালমান আরো জানান, জোটে পুরোপুরি সক্রিয় হতে সদস্য দেশগুলোকে প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। তবে খুব তাড়াতাড়ি জোট কার্যকর হয়ে ওঠবে।

জোটের ৩৪টি দেশের তালিকা:

সৌদিআরব, বাহরাইন, বাংলাদেশ, বেনিন, চাদ, কোমোরোস, আইভরি কোস্ট, জিবুতি, মিশর, গ্যাবন, গায়ানা, জর্ডান, কুয়েত, লেবানন, লিবিয়া, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, মালি, মরক্কো, মৌরিতানিয়া, নাইজার, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, ফিলিস্তিন, কাতার, সেনেগাল, সিয়েরা লিওন, সোমালিয়া, সুদান, টোগো, তিউনিসিয়া, তুরস্ক, আরব আমিরাত এবং ইয়েমেন।[৩০৬]

মূল্যায়ন

এ জোট গঠনের নিউজ মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার পর মুসলিম যুব সমাজসহ সচেতন মহল অনেক আশাবাদী হয়ে ওঠেছিল যে, 'মাযলুম মুসলিমরা এবার একটু নিরাপত্তা পাবে।' তবে এখন পর্যন্ত কার্যত এর কোন কর্মকাণ্ড সচেতন মহলের নযরে আসেনি। সন্ত্রাস কবলিত মাযলুম মুসলিম ও বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রান্ত মুসলিম জনপদের জন্য চোখে পড়ার মত এখনো উল্লেখযোগ্য কিছু এ জোট করতে পারেনি।

৩০৬. *প্রাগুক্ত*

বাংলাদেশে ইসলামী ঐক্য প্রচেষ্টা

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তর সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশ বাংলাদেশ। এদেশের শতকরা বিরানব্বই ভাগ মানুষ মুসলিম। এদেশের মানুষদেরকে একতাবদ্ধ করার জন্য যুগে যুগে অনেক ইসলামি চিন্তাবিদ চেষ্টা সাধনা করেছেন। এর অংশবিশেষ কয়েকটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল;

প্রথম সম্মেলন

১৯৯৭ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী দক্ষিণবঙ্গের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন মরহুম মাওলানা আযীযুর রহমান নেসারাবাদির (কায়েদ সাহেব হুজুর) নেতৃত্বে ঐক্যের এক ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা শুরু হয়। এরই অংশবিশেষ বাংলাদেশের ঝালকাঠি জেলার নেসারাবাদে দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেম উলামা ও ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ফুরফুরার তৎকালিন পীর মুহতারাম আল্লামা আবুল আনসার মুহাম্মাদ আব্দুল কাহহার সিদ্দীকি (র.) ও অংশগ্রহণ করেন।[৩০৭]

দ্বিতীয় সম্মেলন

ঝালকাঠি সালেহিয়া আলিয়া (এনএস কামিল) মাদরাসার ময়দানে ১৯৯৮ মালের মার্চ মাসের ১৭ ও ১৮ তারিখে সর্বদলীয় দ্বিতীয় ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সর্বদলীয় ইসলামী সম্মেলন উপলক্ষ্যে আয়োজিত ওলামা, মাশায়েখ, ইমাম, ইসলামপন্থী ও দেশপ্রেমিক জাতীয় নেতৃবৃন্দসহ লাখো জনতার সামনে বাংলাদেশ হিযবুল্লাহ জমিয়াতুল মুসলিহীনের সম্মানিত আমীর আল্লামা হযরত মাওলানা আযীযুর রহমান নেছারাবাদী (কায়েদ সাহেব হুজুর) তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, ‘দ্বীন রক্ষার স্বার্থে আজ মুসলমানদের যেমন ঐক্যের প্রয়োজন, তেমনি দেশ ও জাতির স্বার্থে দলমত নির্বিশেষে সকল দেশপ্রেমিক ভাইয়ের ঐক্যবদ্ধ হওয়াও প্রয়োজন।’[৩০৮]

---

৩০৭. অধ্যাপক গোলাম আযম, *বাংলাদেশে ইসলামী ঐক্য প্রচেষ্টার ইতিহাস* (ঢাকা, কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, প্রকাশকাল, ফেব্রুয়ারী-২০০৬) পৃ. ৭৯

৩০৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০

তিনি তাঁর ভাষণে ‘ইত্তেহাদ মা‘আল ইখতেলাফ’ (মতানৈক্যসহ ঐক্য) এর নীতির আলোকে সকল শ্রেণির মুসলিমকে ঐক্যবদ্ধভাবে দ্বীনের খেদমত আঞ্জাম দেয়ার আহবান জানান।[৩০৯]

এ প্রোগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ও বাংলাদেশ হিযবুল্লাহ জমিয়তুল মুসলিহীনের নির্বাহী আমীর জনাব ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, ‘হুজুরের ঐক্যের ডাকে সাড়া দিয়ে পীর-মাশায়েখ, আলেম-ওলামা এবং আওয়ামীলীগ, বিএনপিসহ অসংখ্য রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত হয়েছেন। আমার জীবনে কোন মাহফিলে এমনটি দেখিনি।”[৩১০] ফুরফুরার সম্মানিত পীর সাহেব মহান আল্লাহর দরবারে মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আবেগঘন দু‘আ করেন।[৩১১] চরমোনাইর পীর সাহেব বলেন, ‘এ মুহূর্তে ইসলামী হুকুমাতের জন্য জামা‘আত, ছারছীনা ও কাওমীসহ সকল পীর মাশায়েখ ও আলেম ওলামার একত্রিত হওয়া প্রয়োজন।’[৩১২] সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলী পাঠ করেন, নেসারাবাদ ছালেহিয়া আলিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ জনাব মাওলানা খলিলুর রহমান নেসারাবাদী।[৩১৩] সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, ঢাকা সরকারি আলিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ সালাহ উদ্দীন, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ অধ্যাপক জনাব মাওলানা আখতার ফারুক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জনাব আলী হায়দার মুর্শিদী, হযরত মাওলানা আরিফ বিল্লাহ (ছারছীনা), ঢাকা তা‘মীরুল মিল্লাত মাদরাসার উপাধ্যক্ষ জনাব মাওলানা একিউএম সিফাত উল্লাহ, জনাব মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ, নওয়াপাড়া পীর সাহেবের প্রতিনিধি মুহাদ্দিস জনাব মাওলানা আবু তালহা ও জনাব মাওলানা খন্দকার মাহবুবুল হক।[৩১৪] এছাড়াও বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের অন্যতম প্রেসিডিয়াম সদস্য জনাব আলহাজ্ব আমীর হোসেন আমু এবং বিএনপির কেন্দ্রিয় নেতা সাবেক সংসদ সদস্য জনাব অধ্যক্ষ আব্দুর রশিদও বক্তব্য রাখেন।[৩১৫] এ সম্মেলনের সমাপনী ভাষণ প্রদান ও দু‘আ মুনাজাত পরিচালনা করেন সম্মেলনের সভাপতি জনাব আল্লামা মাওলানা আযীযুর রহমান নেসারাবাদী কায়েদ সাহেব হুজুর।[৩১৬]

---

৩০৯. *প্রাগুক্ত*
৩১০. *প্রাগুক্ত*
৩১১. *প্রাগুক্ত*
৩১২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১
৩১৩. *প্রাগুক্ত*
৩১৪. *প্রাগুক্ত*
৩১৫. *প্রাগুক্ত*
৩১৬. *প্রাগুক্ত*

সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ

‘অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তের কারণে দ্বীন ইসলাম আজ বিপন্ন। এ মুহূর্তে প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো, স্বার্থকভাবে এ চক্রান্তের মোকাবেলা করা।’ এ লক্ষ্যে সম্মেলন প্রস্তাব করছে যে-

১। ‘যাঁরা বিভিন্নভাবে ইসলামের খিদমত করে যাচ্ছেন, যেমন-দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, খানকাহ ও তা'লীমের মাধ্যমে, রাজনীতি ও সেবাকর্মের মাধ্যমে- তাঁরা এমন কোন কার্যক্রম গ্রহণ করবেন না কিংবা এমন কোন বক্তব্য-অভিমত প্রকাশ করবেন না, যাতে নিজেদের মাঝে অনৈক্য, বিভেদ ও ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে।’

২। এ সম্মেলন আরো প্রস্তাব করছে যে, ‘তাঁরা নিজ নিজ অবস্থানে থেকে ‘আল ইত্তেহাদ মা'আল ইখতেলাফ’ (মতানৈক্যসহ ঐক্য) এর ভিত্তিতে নিজেদের মাঝে ইস্পাত-দৃঢ় ইসলামী ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে ইসলাম বিরোধী চক্রের সমুচিত জবাব দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবেন। দেশী ও বিদেশী স্বার্থান্বেষীদের অভিলাষ চরিতার্থ করার প্রয়াসে দেশ ও জাতি আজ এক ক্রান্তিলগ্নে উপনীত। দেশের অর্থনীতি ও শিক্ষানীতি বিপর্যস্ত, সংস্কৃতি ও মানবিক মূল্যবোধ চরম আগ্রাসনের শিকার। এমতাবস্থায় প্রতিটি দেশ প্রেমিক নাগরিকের প্রতি এ সম্মেলন উদাত্ত আহবান জানাচ্ছে যে, দেশ ও জাতির স্বার্থে দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশকে বাঁচান। ঈমান ও আকীদার ভিত্তিতে চিরায়ত, লালিত সংস্কৃতিকে সমুন্নত রাখুন।’[৩১৭]

দেশের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের ঐতিহাসিক আহবান

১৯৯৮ সালের ১৭ নভেম্বর সারাদেশের নেতৃস্থানীয় ওলামা-মাশায়েখ, বুদ্ধিজীবি ও ইসলামী নেতৃবৃন্দের প্রায় সকলেরই ঐক্য সংক্রান্ত এক ঐতিহাসিক যুক্ত বিবৃতি ততকালিন জাতীয় দৈনিকগুলোতে প্রেসবিজ্ঞপ্তি আকারে পাঠানো হয় এবং যা ১৮ তারিখে প্রকাশিত হয়। পত্রিকায় প্রেরিত প্রেসবিজ্ঞপ্তিটি ছিল নিম্নরূপ:

‘পরকালিন মুক্তি ও সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আল্লাহর দেয়া ইসলামের শরীয়াত অনুসরণ করা প্রতিটি মুসলিমের ঈমানী দায়ীত্ব।’

‘কওম ও মিল্লাতের এ ক্রান্তিকালে নিজেদের নাজাতের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের নিমিত্তে আসুন- আমরা যারা আল্লাহকে রব হিসেবে মানি, ইসলামকে একমাত্র সত্য দ্বীন

৩১৭. *প্রাগুক্ত*

হিসেবে মানি এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স.) কে বিশ্বনবী ও শেষ নবী হিসেবে মানি আর রাসূল (স.) এর সাহাবায়ে কিরামের আদর্শকে সঠিক আদর্শ হিসেবে মানি, তারা সকলে মিলে-মিশে কাজ করি এবং পারস্পরিক মতপার্থক্যগত অনৈক্যের ঊর্ধ্বে ওঠে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য পথে সম্মিলিতভাবে অগ্রসর হই।'[৩১৮]

১. সমাজে বিরাজমান অপসংস্কৃতি ও অবক্ষয় থেকে মুক্তি ও নিষ্কৃতি লাভের লক্ষ্যে কুফর, শিরক ও বিদ'আত এবং চরিত্র বিধ্বংসী অশ্লীল ছায়াছবি, গান-বাজনা, উলঙ্গপনা, মদ-জুয়া, সুদ-ঘুষ, সন্ত্রাস ও চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি সমাজবিরোধী ক্রিয়াকলাপ রোধ করার কার্যকর ব্যবস্থা যাতে গ্রহণ করা যায় তা নিশ্চিত করা প্রতিটি দ্বীনদার মুসলিমের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

২. নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধ করা প্রতিটি মুসলিমের দ্বীনি দায়িত্ব। সমাজে বর্তমানে নারী ও শিশু নির্যাতন ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। ইসলামী শরীয়াত পালন না করার কারণে এ ধরনের অমানবিক আচরণের প্রসার ঘটছে। ইসলামী পারিবারিক আইন ও পর্দাপ্রথা যথাযথভাবে যাতে চালু করা হয়, সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

৩. শিক্ষা একটি জাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ইসলাম শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। একটি দেশের জনগণের ঈমান-আকিদার ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় জনগণের ঈমান-আকিদার যথাযথ প্রতিফলন ঘটেনি। ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার ফলশ্রুতিতে বর্তমান সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় এক নৈরাজ্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় পর্যাপ্ত নৈতিক শিক্ষার অনুপস্থিতি শিক্ষাক্ষেত্রে ও সমাজে সন্ত্রাস সৃষ্টির অন্যতম কারণ। শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মীয় শিক্ষার প্রচলন অত্যাবশ্যক। প্রচলিত মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে আরো গতিশীল, আরো কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।

৪. তাহযীব ও তামাদ্দুন একটি জাতির প্রাণশক্তি। যখনই কোন জাতি স্বীয় তাহযীব-তামাদ্দুন থেকে দূরে সরে যায় কিংবা এর প্রতি অনীহা প্রকাশ করে তখন সে জাতি অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে। ইদানিং লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ইসলামের তাহযীব-তামাদ্দুন পরিপন্থী মূর্তি ও প্রতিমা নির্মাণ করা হচ্ছে, অগ্নিকে সম্মান করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, মসজিদ ভেঙে দেয়া হচ্ছে, মাদরাসা জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছে, আযানের প্রতি কটুক্তি করা হচ্ছে, যার ফলে কোন কোন দেশে মাইকে আযান দেয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হচ্ছে। ইসলামবিরোধী এনজিওসমূহের ইসলামবিরোধী অপতৎপরতা ইসলাম ও মুসলিম জাতিকে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন করছে। টেলিভিশন ও রেডিওতে ইসলামবিরোধী নাটক ও

৩১৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২

উপন্যাস প্রচারিত হচ্ছে, যা মুসলিম মিল্লাতের জন্য ধ্বংসের পথ অবধারিত করে দিচ্ছে। প্রতিটি দীনদরদি মুসলিমের পক্ষে এসবের প্রতিকারের জন্য সাধ্যানুযায়ী কাজ করা অপরিহার্য কর্তব্য।

৫. কাদিয়ানীরা রাসূলে কারীম (স.) কে শেষ নবী বলে মানে না- অতএব তারা মুসলিম হতে পারে না। মুসলিম না হওয়ার কারণে তারা মুসলিম সমাজভুক্ত নয়। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা না থাকার কারণে মুসলিম সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি হচ্ছে। তাই সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বিধানের লক্ষ্যে অনতিবিলম্বে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করার ব্যবস্থা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন![৩১৯]

ঐ বছরের ১১ জুলাই রাজধানী ঢাকার মীরপুরস্থ ফুরফুরার দরবারে মুসলিম ঐক্যের বিষয়ে ঐতিহাসিক সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯৮ সালের ১৮ নভেম্বর সারাদেশের ৬৩ জন নেতৃস্থানীয় ওলামা-মাশায়েখ ও বুদ্ধিজীবির ঐক্য সংক্রান্ত যুক্ত বিবৃতি ততকালিন জাতীয় দৈনিকগুলোতে প্রকাশিত হবার পর এদেশে মুসলিম ঐক্যের সম্ভাবনা আরো উজ্জল হয়ে ওঠে।[৩২০]

ঐ বছর ১৫ ডিসেম্বর ঢাকাস্থ ফুরফুরা দরবার- ইশায়াতে ইসলাম, দারুসসালাম, মীরপুরে উক্ত ৬৩জন নেতৃস্থানীয় ওলামা-মাশায়েখ ও বুদ্ধিজীবিকে নিয়ে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ আলেমে দীন মাওলানা আযীযুর রহমান নেসারাবাদী (কায়েদ সাহেব)-এর সভাপতিত্বে জাতীয় শরীয়াহ কাউন্সিল গঠনের নিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।[৩২১]

জাতীয় শরীয়াহ কাউন্সিলের আহবায়ক কমিটি ছিল নিম্নরূপ

১৯৯৮ সালের ১৫ ডিসেম্বরের সম্মেলনেই জাতীয় মসজিদের খতীব মরহুম মাওলানা উবায়দুল হক সাহেবকে প্রধান আহবায়ক করে নিম্নলিখিত উলামা-মাশায়েখকে নিয়ে জাতীয় শরীয়াহ কাউন্সিলের আহবায়ক কমিটি গঠিত হয়।[৩২২]

১. মাওলানা উবায়দুল হক (খতীব, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ)

২. শায়খুল হাদীস আল্লামা আযীযুল হক

৩. মাওলানা আহমাদ শফী' (মুহতামিম, হাটহাজারী মাদরাসা, চট্টগ্রাম)

---

৩১৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২-৭৩
৩২০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮
৩২১. *প্রাগুক্ত*
৩২২. *প্রাগুক্ত*

৪. মাওলানা আযীযুর রহমান নেসারাবাদী (কায়েদ সাহেব)

৫. ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান (অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

৬. মরহুম মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ (বিশ্ব মুসলিম ঐক্য নিয়ে কাজ করেছেন)

৭. মাওলানা আব্দুল মান্নান (শায়খুল হাদীস, গওহরডাঙ্গা)

৮. মাওলানা আবদুস সুব্হান (এমপি)

৯. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (সম্পাদক, মাসিক মদীনা)

১০. মাওলানা হারুন ইসলামাবাদী (মুহতামিম, জামেয়া ইসলামিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম)

১১. মাওলানা মুফতি ফজলুল হক আমিনী (প্রিন্সিপাল, জামেআ কুরআনিয়া, লালবাগ, ঢাকা)

১২. মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (এমপি)

১৩. মাওলানা শাহ মুহিব্বুল্লাহ (পীর সাহেব, ছারছীনা দরবার)

১৪. মাওলানা আনোয়ার হোসাইন তাহের জাবিরী আল-মাদানী (খতীব, আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ, চট্টগ্রাম)

১৫. মাওলানা কুতুবুদ্দিন (পীর ছাহেব, বায়তুশ শরফ, চট্টগ্রাম)

১৬. মাওলানা সাইয়্যেদ নজর ইমাম মুহাম্মাদ (পীর সাহেব, নারিন্দা)

১৭. মাওলানা আব্দুল লতীফ (পীর সাহেব, সিলেট)

১৮. মাওলানা মুসলেহ উদ্দীন আহমদ আবু বকর মিয়া (পীর সাহেব, বাহাদুরপুর)।[৩২৩]

তাছাড়া মুফতি মাওলানা সাঈদ আহমাদ সাহেবকে প্রধান করে নিম্নলিখিত সদস্যগণকে নিয়ে একটি লিয়াজোঁ কিমিটি গঠন করা হয়।

লিয়াজোঁ কিমিটির সদস্যবৃন্দ

১. মুফতি মাওলানা সাঈদ আহমাদ মুজাদ্দেদী (লিয়াজোঁ কমিটি প্রধান)

---

৩২৩. *প্রাগুক্ত*

২. প্রিন্সিপাল মাওলানা সাইয়্যেদ কামাল উদ্দীন জাফরী

৩. ড. আ.ন.ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

৪. অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারুক

৫. এডভোকেট মাওলানা নজরুল ইসলাম

৬. মাওলানা আব্দুল মতিন

৭. মাওলানা আতাউর রহমান খান (সাবেক এমপি)

৮. মাওলানা কবি রুহুল আমিন খান (নির্বাহী সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব)

৯. মাওলানা আবুল কালাম আযাদ।[৩২৪]

জাতীয় শরীয়াহ কাউন্সিলের ২০০৩ সালের বার্ষিক সম্মেলন

২০০৩ সালের ১ জানুয়ারী তারিখে ফুরফুরার ততকালিন পীর সাহেবের মীরপুরস্থ দারুস সালামে জাতীয় শরীয়াহ কাউন্সিলের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে একটি রিপোর্ট পেশ করা হয়। ঐ রিপোর্টের গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হল;

১৬.১০.২০০০ তারিখে পুরানা পল্টনে জাতীয় শরীয়াহ কাউন্সিলের বৈঠক

১৬.১০.২০০০ তারিখে রাজধানী ঢাকার ৫৫/বি, পুরানা পল্টনে খতীব মরহুম মাওলানা ওবায়দুল হক সাহেবের সভাপতিত্বে জাতীয় শরীয়াহ কাউন্সিলের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে জাতীয় শরীয়াহ কাউন্সিলকে একটি স্থায়ী কমিটিতে রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত এবং সে সাথে নিম্নের প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়;

১. পূর্বঘোষিত জাতীয় শরীয়াহ কাউন্সিলের আহবায়ক ও লিয়াজোঁ কমিটির সম্মানিত সকল সদস্যকে মূল কমিটির অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

২. সভায় মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (র.)-এর প্রস্তাবক্রমে মরহুম খতীব মাওলানা ওবায়দুল হক সাহেবকে স্থায়ীভাবে জাতীয় শরীয়াহ কাউন্সিলের সভাপতি মনোনীত করা হয়।

৩. সভায় মাওলানা মুহিউদ্দীন খানকে সহ-সভাপতি, মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ মুজাদ্দেদী সাহেবকে মহাসচিব ও মাওলানা হারুনুর রশিদ খান সাহেবকে যুগ্ম-মহাসচিব

৩২৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯

মনোনীত করা হয় এবং নিম্নলিখিত শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরামের সমন্বয়ে জাতীয় শরীয়াহ কাউন্সিলের কমিটি গঠিত হয়।[৩২৫]

জাতীয় শরীয়াহ কাউন্সিলের পৃষ্ঠপোষকগণ;

১. শায়খুল হাদীস মাওলানা আযীযুল হক

২. মাওলানা আবদুল কাহহার সিদ্দীকি (পীর সাহেব, ফুরফুরা)

৩. মাওলানা আহমাদ শফী' (মুহতামিম, হাটহাজারী)

৪. মাওলানা আযীযুর রহমান (কায়েদ সাহেব)

৫. মাওলানা আব্দুল মান্নান (শায়খুল হাদীস ও মুহতামিম, গওহরডাঙ্গা মাদরাসা)

সভায় মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নের বিষয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়।

১০.০৭.২০০১ তারিখ পুরানা পল্টনে মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেবের সভাপতিত্বে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে ০৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি মজলিসে আমেলা (কর্ম-পরিষদ) গঠিত হয়।

মজলিসে আমেলার সদস্যগণ

খতীব মাওলানা ওবায়দুল হক

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান

মুফতি সাঈদ আহমাদ মুজাদ্দেদী

মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মাদ ইউসুফ

মাওলানা আব্দুস সুবহান (এমপি)

মাওলানা ফজলুর রহমান

অধ্যক্ষ মাওলানা যাইনুল আবেদীন

মাওলানা মুসলেহ উদ্দিন আহমদ আবু বকর মিয়া

এডভোকেট মাওলানা নজরুল ইসলাম।[৩২৬]

---

৩২৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০-৮১

০৯.০৮.২০০১ তারিখ শরীয়াহ কাউন্সিলের বৈঠক খতীব মাওলানা ওবায়দুল হক সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় রেডিও-টিভিতে ইসলামের বিরুদ্ধে অপ্রপ্রচার বন্ধ করা, ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা, ভাস্কর্যের নামে মূর্তি নির্মাণ বন্ধ করা ও যে সকল আলেম এখনো জেলে রয়েছেন তাঁদেরকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা জোরদার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৩২৭]

১০.০৯.২০০২ তারিখ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেবের সভাপতিত্বে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে জাতীয় শরীয়াহ কাউন্সিল, বাংলাদেশের উদ্যোগে একটি জাতীয় ভিত্তিক ওলামা-মাশায়েখ সম্মেলন ও প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এ জন্য মুফতি সাঈদ আহমাদ মুজাদ্দেদী, মাওলানা যাইনুল আবেদীন, মুফতি আব্দুল কুদ্দুস ও মাওলানা আব্দুল লতিফ নিযামীর সমন্বয়ে একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়।

০৩.১১.২০০২ তারিখ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেবের সভাপতিত্বে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে জাতীয় সম্মেলনের কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয় এবং খতীব সাহেবের বিশেষ দাওয়াতনামা নিয়ে ওলামা-মাশায়েখদের সাথে যোগাযোগ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খতীব সাহেব ও মুফতি সাঈদ আহমাদ মুজাদ্দিদী সাহেবের স্বাক্ষরিত চিঠি নিয়ে ওলামা-মাশায়েখগণের সাথে বিশেষভাবে যোগাযোগ করা হয়।

০১.০১.২০০৩ তারিখ বুধবার সকাল ১০টায় ঢাকাস্থ মারকাযে ইশায়াতে ইসলাম, ২/২ দারুস সালামে জাতীয় শরীয়াহ কাউন্সিল বাংলাদেশের জাতীয় ওলামা-মাশায়েখ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় শরীয়াহ কাউন্সিল বাংলাদেশের চেয়ারম্যান খতিব মাওলানা ওবায়দুল হক। সম্মেলনে দেশ বরেণ্য ৬৭ জন আলিম অংশগ্রহণ করেন।

উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন সম্মানিত চেয়ারম্যান খতীব মাওলানা ওবায়দুল হক। বিগত বছরের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করেন সেক্রেটারী জেনারেল মুফতি সাঈদ আহমাদ মুজাদ্দেদী। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন মাওলানা আবদুস সোবহান (এমপি) ঘোষণাপত্র পাঠ করেন সহ-সভাপতি মাওলানা মহিউদ্দিন খান। সম্মেলনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং সারাবিশ্বের বিশেষ করে বাংলাদেশের মুসলিমদের সকল সমস্যার সমাধান ও কল্যাণের জন্য উলামায়ে কেরাম

---

৩২৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১
৩২৭. *প্রাগুক্ত*

ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়।[৩২৮] উক্ত জাতীয় ওলামা-মাশায়েখ সম্মেলনে বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরামের মধ্যে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন:

১. খতীব মাওলানা ওবায়দুল হক

২. শায়খুল হাদিস আল্লামা আযিযুল হক

৩. মাওলানা মহিউদ্দিন খান (সম্পাদক, মাসিক মদীনা)

৪. মুফতি সাঈদ আহমাদ মুজাদ্দেদী

৫. প্রিন্সপাল সাইয়্যেদ মাওলানা কামাল উদ্দিন জাফরী

৬. মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী (এমপি)

৭. মাওলানা আব্দুস সুবহান (এমপি)

৮. মাওলানা আবুল কালাম আজাদ

৯. মাওলানা সুলতান যওক নদভী (চট্টগ্রাম)

১০. অধ্যক্ষ মাওলানা যাইনুল আবেদীন

১১. মাওলানা আবদুল লতিফ নেজামী

১২. এডভোকেট মাওলানা নজরুল ইসলাম

১৩. উপাধ্যক্ষ মাওলানা এ কিউ এম সিফাত উল্লাহ

১৪. মাওলানা জুলফিকার আহমাদ কিসমতি

১৫. মাওলানা মোঃ ইসহাক

১৬. মাওলানা এমদাদুল হক আড়াইহাজারী

১৭. ড. মাওলানা আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

১৮. মাওলানা আজিজুল হক মুরাদ

১৯. ড. এএইচএম ইয়াহইয়া রহমান

২০. মাওলানা আশিকুর রহমান কাসেমী

---

৩২৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২

২১. মাওলানা আব্দুর রহিম ইসলামাবাদী (ঢাকা)

২২. প্রিন্সিপাল মাওলানা শাহজাহান (ঢাকা)

২৩. মাওলানা প্রিন্সিপাল ইলিয়াস (চট্টগ্রাম)

২৪. মাওলানা একে এম আব্দুস সোবহান (ঢাকা)

২৫. প্রিন্সিপাল ইউনুস (ঢাকা)

২৬. প্রিন্সিপাল মফিজুর রহমান (রাঙ্গামাটি)

২৭. মাওলানা আতাউর রহমান খান (সাবেক এমপি)

২৮. মাওলানা নুরুল ইসলাম

২৯. মাওলানা আব্দুল হাই মিশকাত

৩০. মাওলানা অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

৩১. মুহতামিম মাওলানা আব্দুল কাইয়ূম

৩২. মাওলানা সালেম ওয়াহিদী

৩৩. মাওলানা আতাউর রহমান (এমপি)

৩৪. মুহতামিম মাওলানা সালমান

৩৫. অধ্যক্ষ মাওলানা শহিদুল ইসলাম (রাজশাহী)

৩৬. মুহতামিম মাওলানা আবুল কালাম (ঢাকা)

৩৭. মাওলানা আব্দুস সাত্তার (ফেনী)

৩৮. অধ্যক্ষ মাওলানা রহমতুল্লাহ (খুলনা)

৩৯. উপাধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল (লক্ষীপুর)

৪০. মাওলানা এটিএম আব্দুল হাই আল মাদানী

৪১. মাওলানা মাহবুবুর রহমান

৪২. মাওলানা আব্দুল্লাহ

৪৩. মাওলানা আব্দুস সালাম কাসেমী (সাতক্ষীরা)

৪৪. উপাধ্যক্ষ মাওলানা কুতুবুদ্দিন

৪৫. মাওলানা মনিরুল আহসান মাদানী (যশোর)

৪৬. মাওলানা মুফতি আব্দুল কুদ্দুস

৪৭. মাওলানা মোহাম্মদ জাকারিয়া (ঢাকা)

৪৮. মাওলানা হাবিবুর রহমান (ঢাকা)

৪৯. মাওলানা আব্দুস সালাম (ঢাকা)

৫০. মাওলানা ফজলুর রহমান (ঢাকা)

গুরুত্বপূর্ণ এ সম্মেলনের খবর জাতীয় পত্র পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়।[৩২৯]

জাতীয় শরীয়াহ কাউন্সিলের পরবর্তী সম্মেলন

২০০৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর জাতীয় শরীয়াহ কাউন্সিলের বার্ষিক সম্মেলন-২০০৪

মারকাযে ইশায়াতে ইসলাম, মীরপুর দারুস সালামে (ফুরফুরা দরবারে) অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় শরীয়াহ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতিব মাওলানা ওবায়দুল হক। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় কাউন্সিলের প্রধান উপদেষ্টা শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক। তিনি কুর'আন ও হাদিসের ওপর সকল মুসলিম বিশেষ করে উলামায়ে কিরামকে অটল ও অবিচল থাকার আহ্বান জানান। বিশেষ মেহমান হিসেবে জাতীয় কাউন্সিলের ভাইস-চেয়ারম্যান মাওলানা আবুল কালাম মোহাম্মদ ইউসুফ তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'মুসলিমদেরকে তাদের দুশমন সম্পর্কে জানতে হবে এবং ইসলামী জ্ঞান অর্জন করতে হবে তিনি আফগানিস্তান ও ইরাক থেকে ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারের আহ্বান জানান।'

প্রফেসর ড. মুস্তাফিজুর রহমান তাঁর বক্তব্যে বিভিন্ন মতভেদ পরিত্যাগ করে কুর'আন হাদীসের ভিত্তিতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। সাবেক সচিব শাহ আব্দুল হান্নান বলেন, ওলামায়ে কিরামকে সকল বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদানের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

---

৩২৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২-৮৩

জাতীয় শরিয়া কাউন্সিলের সেক্রেটারী জেনারেল মুফতি সাঈদ আহমাদ মুজাদ্দেদী সকল ওলামায়ে কিরামকে একত্রে বসে সব বিষয়ে সকল সমস্যার সমাধান করার আহ্বান জানান। মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী (এমপি) শিরক-বিদ'আত বাদ দিয়ে সকল মতের উলামায়ে কেরামকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। মাওলানা আশিকুর রহমান কাসেমী বলেন, 'দেশের জনগণ জাতীয় শরীয়াহ কাউন্সিলের নিকট থেকে মতপার্থক্যের শরিয়াহ ভিত্তিক সমাধান প্রত্যাশা করে। তাই শরীয়াহ কাউন্সিলের আরো বিস্তৃতি ঘটাতে হবে।' বাংলাদেশ জমিয়তে আহলে হাদিসের সভাপতি অধ্যাপক আবুল কালাম মোহাম্মদ শামছুল আলম বলেন, 'সকল স্তরের ওলামায়ে কিরামের সমন্বয়ে জাতীয় শরীয়াহ কাউন্সিলের এ সম্মেলন ওলামায়ে কেরামের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করবে।' জনাব মতিউর রহমান (এমপি) ওলামায়ে কেরামের ঐক্যের আহ্বান জানান। মাওলানা এমদাদুল হক আড়াইহাজারী জাতীয় শরীয়াহ কাউন্সিলের মাধ্যমে সকল মতের ওলামায়ে কিরামকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

সম্মেলনে আরও আলোচনা করেন, প্রফেসর মাওলানা নূর মোহাম্মদ, মাওলানা এ কিউ এম সিফাত উল্লাহ, মাওলানা এডভোকেট নজরুল ইসলাম, অধ্যক্ষ মাওলানা যাইনুল আবেদীন, ড. মাওলানা হাসান মঈন উদ্দিন, ড. মুহাম্মাদ আবদুস সালাম, মাওলানা রফিক আহমদ ও ড. আমিনুল হক।

সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন, মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস, মাওলানা সরদার আব্দুস সালাম, ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম, মাওলানা আ ন ম আব্দুর রশিদ, মাওলানা রশিদ ফেরদৌস, মাওলানা আবদুল কাইয়ূম, মাওলানা রহমত উল্লাহ, মাওলানা শহিদুল ইসলাম, মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম ও মাওলানা নিজাম উদ্দিন। সভাপতি হযরত মাওলানা ওবায়দুল হক জাতীয় শরীয়াহ কাউন্সিলের মাধ্যমে খুঁটিনাটি সকল মতভেদ ভুলে ওলামায়ে কেরামকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান এবং সকল মতপার্থক্য জাতীয় শরীয়াহ কাউন্সিলের মাধ্যমেই সমাধান করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। শাহতলীর পীর হযরত মাওলানা আবুল বাশার সাহেবের মোনাজাতের মাধ্যমে সম্মেলন শেষ হয়।[৩৩০]

জাতীয় শরীয়াহ কাউন্সিলই সর্বদলীয় একমাত্র ঐক্য মঞ্চ

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ইসলামী শক্তিসমূহের ঐক্যের জন্য একমাত্র প্ল্যাটফর্ম (মঞ্চ) হিসেবে জাতীয় শরীয়াহ কাউন্সিলই উল্লেখযোগ্য। জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতিব মাওলানা উবায়দুল হকের নেতৃত্বে এবং ফুরফুরা দরবারের গদ্দিনশীন পীর

৩৩০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫

মাওলানা আবুল আনসার মুহাম্মদ আব্দুল কাহ্‌হার সিদ্দিকীর পৃষ্ঠপোষকতায় এ সংগঠনটি উত্তরোত্তর সম্প্রসারিত হতে থাকে। বাংলাদেশে আরো কিছুমহল বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের নেতৃত্বে সংঘটিত হয়েছিল। জাতীয় শরীয়াহ কাউন্সিল তাদেরকেও এ ঐক্যমঞ্চে সংগঠনভুক্ত করার প্রয়াস চালান যাতে ইসলামী ঐক্য পূর্ণতা লাভ করে।

কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অত্যন্ত উদার দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হওয়ার কারণে তিনি সকলকে ঐক্যবদ্ধ করতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। তিনি কোন মহলকেই ঐক্যের বাইরে দেখতে চাননি। কারণ কোন মহল বাইরে থাকলে এ ঐক্য পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। যারা এমন মনোভাব পোষণ করেন যে, 'অমুক দলকে বাদ দিতে হবে বা অমুক দলের সাথে ঐক্য করবো না, তারা মূলতঃ মনে প্রাণে সার্বিক ঐক্যই চাননি।[৩৩১] মতবিরোধ চিরকালই ছিল, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। মতপার্থক্য আছে বলেই তো মুসলিমগণ বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত। ***জাতীয় শরীয়া কাউন্সিল এর নীতি হচ্ছে 'ইত্তেহাদ মা'আল ইখতেলাফ'।*** মতভেদের জায়গায় মতভেদ থাকুক। প্রয়োজনে ভিন্ন ভিন্ন দলও সংগঠন বহাল থাকুক। কিন্তু দ্বীনের দুশমনদের মোকাবেলা ও দ্বীনের বিজয়ের প্রয়োজনে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। কারণ কোন দল বা মহলই একা এ বিরাট দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম নয়। আর এ দায়িত্ব পালন না করলে আল্লাহ তা'আলার দরবারে সবাইকে কৈফিয়তের সম্মুখীন হতে হবে। এটাই জাতীয় শরীয়াহ কাউন্সিলের দাওয়াত। এটাই ঐক্যের দর্শন। এটাই ঐক্যের ভিত্তি।[৩৩২]

আল্লাহ না করুন এমন কিছু ব্যক্তিও যদি থাকেন, যারা নেতৃত্বের প্রতি এতটাই লোভী যে, অন্য কোনো ব্যক্তির নেতৃত্ব মেনে জাতীয় শরীয়াহ কাউন্সিলে শরিক হতে সম্মত হতে পারছেন না, তাহলে তারা জনগণের নিকট চিহ্নিত হয়ে থাকবেন। তাদের ছাড়াই এ কাউন্সিল ইসলামী জনতার স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া পাবে বলে কাউন্সিলের সম্মানিত নেতৃবৃন্দ আশাবাদী ছিলেন, কারণ জনগণ ঐক্যের জন্য পাগল ছিল।[৩৩৩]

---

৩৩১. *প্রাগুক্ত*
৩৩২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬
৩৩৩. *প্রাগুক্ত*

হেফাযতে ইসলাম বাংলাদেশ

হেফাযতে ইসলাম বাংলাদেশ বাংলাদেশের কওমি মাদরাসাভিত্তিক একটি ঐতিহ্যবাহী ইসলামী সংগঠন, যেটি ২০১০ সালের ১৯ জানুয়ারি গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এ সংগঠনটি দেশের মুসলিমদের মাঝে ঐক্যের সেতুবন্ধন তৈরী ও বাংলাদেশে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন পরিচালনা করে আসছে।[৩৩৪]

প্রতিষ্ঠার তারিখঃ ১৯ জানুয়ারী, ২০১০

প্রতিষ্ঠাতা আমীরঃ আল্লামা শাহ আহমদ শফী (র.)

প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিবঃ আল্লামা হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরী

সদর দপ্তরঃ হাটহাজারী উপজেলা, চট্টগ্রাম।

দাপ্তরিক ভাষাঃ বাংলা ভাষা

প্রধান উপদেষ্টাঃ আল্লামা মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী চট্টগ্রাম

বর্তমান নির্বাচিত আমীরঃ আল্লামা হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরী

বর্তমান নির্বাচিত মহাসচিবঃ মাওলানা নূরুল ইসলাম জিহাদী

২০১০ এর ১৯ জানুয়ারিতে এ সংগঠনটি চট্টগ্রামের প্রায় একশত কাওমি মাদরাসার শিক্ষকদের নিয়ে গঠিত হয়। হাটহাজারী মাদরাসার মহাপরিচালক আল্লামা শাহ আহমদ শফী (র.) এর প্রতিষ্ঠাতা আমীর ছিলেন। এটি ২০১০ সালে বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতির বিরোধিতার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। ২০১১ সালে সংগঠনটি বাংলাদেশ নারী উন্নয়ন নীতি (২০০৯) এর কয়েকটি ধারাকে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক দাবি করে এর তীব্র বিরোধিতা করে।[৩৩৫]

কর্মকাণ্ড

ঐতিহাসিক ১৩ দফা দাবীঃ

২০১১ সালে এ সংগঠনটি সর্বক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমঅধিকার নিশ্চিতের লক্ষ্যে গঠিত সরকার ঘোষিত নারী উন্নয়ন নীতি মালার তীব্র বিরোধিতা করে। ২০১৩ সালে তারা

৩৩৪. *উইকিপিডিয়া*
৩৩৫. *উইকিপিডিয়া*

ইসলাম ও রাসূল (স.) কে কটূক্তিকারী নাস্তিক ব্লগারদের ফাঁসি দাবি করে দেশব্যাপী ব্যাপক আন্দোলন ও সমাবেশ শুরু করে। এ প্রেক্ষিতে তারা ১৩ দফা দাবি উত্থাপন করে। হেফাযতে ইসলামের এ দাবীর কয়েকটি দফা সমালোচিত হলে পরবর্তীতে তারা সংবাদ সম্মেলন করে ১৩ দফার ব্যাখ্যা প্রদান করে।[৩৩৬]

হেফাযতে ইসলামের বক্তব্য অনুযায়ী তাদের দাবিসমূহ:

- সংবিধানে 'আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' পুনঃস্থাপন এবং কুর'আন-সুন্নাহবিরোধী সব আইন বাতিল করা।
- আল্লাহ্, রাসূল ও ইসলাম ধর্মের অবমাননা এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুৎসা রোধে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে জাতীয় সংসদে আইন পাস।
- শাহবাগ আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী স্বঘোষিত নাস্তিক এবং রাসূল (স.) এর নামে কুৎসা রটনাকারী ব্লগার ও ইসলামবিদ্বেষীদের সব অপপ্রচার বন্ধসহ কঠোর শাস্তিদানের ব্যবস্থা করা।
- ব্যক্তি ও বাকস্বাধীনতার নামে সব বেহায়াপনা, অনাচার, ব্যভিচার, প্রকাশ্যে নারী-পুরুষের অবাধ বিচরণ, মোমবাতি প্রজ্জ্বলনসহ সব বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ বন্ধ করা।
- ইসলামবিরোধী নারীনীতি, ধর্মহীন শিক্ষানীতি বাতিল করে শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা।
- সরকারিভাবে কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণা এবং তাদের প্রচারণা ও ষড়যন্ত্রমূলক সব অপতৎপরতা বন্ধ করা।
- মসজিদের নগর ঢাকাকে মূর্তির নগরে রূপান্তর এবং দেশব্যাপী রাস্তার মোড়ে মোড়ে ও কলেজ-ভার্সিটিতে ভাস্কর্যের নামে মূর্তি স্থাপন বন্ধ করা।
- জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমসহ দেশের সব মসজিদে মুসুল্লিদের নির্বিঘ্নে নামাজ আদায়ে বাধাবিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতা অপসারণ এবং ওয়াজ-নসিহত ও ধর্মীয় কার্যকলাপে বাধাদান বন্ধ করা।
- রেডিও-টেলিভিশনসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে দাড়ি-টুপি ও ইসলামি কৃষ্টি-কালচার নিয়ে হাসিঠাট্টা এবং নাটক-সিনেমায় নেতিবাচক চরিত্রে ধর্মীয় লেবাস-পোশাক পরিয়ে অভিনয়ের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের মনে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষমূলক মনোভাব সৃষ্টির অপপ্রয়াস বন্ধ করা।

---

৩৩৬. *উইকিপিডিয়া*

- পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশব্যাপী ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত এনজিও এবং খ্রিষ্টান মিশনারিগুলোর ধর্মান্তকরণসহ সব অপতৎপরতা বন্ধ করা।
- রাসূলপ্রেমিক প্রতিবাদী আলেম-ওলামা, মাদরাসার ছাত্র, রাসূলপ্রেমিক জনতার ওপর হামলা, দমন-পীড়ন, নির্বিচার গুলিবর্ষণ এবং গণহত্যা বন্ধ করা।
- সারা দেশের মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক, ওলামা-মাশায়েখ ও মসজিদের ইমাম-খতিবকে হুমকি-ধমকি, ভয়ভীতি দানসহ তাঁদের বিরুদ্ধে সব ষড়যন্ত্র বন্ধ করা।
- অবিলম্বে গ্রেপ্তারকৃত সব আলেম-ওলামা, মাদরাসাছাত্র ও রাসূলপ্রেমিক জনতাকে মুক্তিদান, দায়ের করা সব মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং আহত ও নিহত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণসহ দুষ্কৃতকারীদের বিচারের আওতায় এনে কঠোর শাস্তি প্রদান।[৩৩৭]

লং মার্চ এবং সমাবেশ

উপরোক্ত দাবী বাস্তবায়নের দাবীতে ৫ই মে, ২০১৩ হেফাযতে ইসলাম বাংলাদেশ সারা দেশ থেকে ঢাকা অভিমুখে লং মার্চ করে এবং ঢাকার মতিঝিল শাপলা চত্ত্বরে তাদের প্রথম সমাবেশ করে। এ সমাবেশে দলমত নির্বিশেষে প্রচুর লোকের সমাগম হয়। এসময় বিভিন্ন বাধার কারণে অনেক কর্মী চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা আসতে ব্যর্থ হয়। পরবর্তীতে তারা চট্টগ্রামের ওয়াসা মোড়ে সমাবেশ করে। এদিন দেশের বিভিন্ন স্থানে সংগঠনের কর্মীদের সাথে আইনশৃঙ্খলারক্ষী বাহিনীর সংঘর্ষ হয় এবং কিছু হতা-হতের ঘটনা ঘটে।

পর্যালোচনা

মুসলিম ও ইসলামের সমসমায়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে হিফাযতে ইসলাম কর্মসূচী ঘোষণা করার কারণে তখন দলমত নির্বিশেষে সকলে এতে শামিল হয়ে তাদের ঘোষিত ইসলাম ও জনকল্যাণমূখী কর্মসূচী বাস্তবায়নে একাত্বতা ঘোষণা করে। এরপর বিতর্কিত কিছু কর্মসূচীর কারণে সংগঠনটি সেসময় স্থবির হয়ে পড়ে।

---

৩৩৭. *উইকিপিডিয়া*

নবম অধ্যায়

উম্মাহর অনৈক্যের কুফল ও পরিণতি

উম্মাহর অনৈক্যের কুফল কত ভয়াবহ তা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। হযরত আবূ বাকরাহ (রা.) বলেন, 'আমি রাসূল (স.) কে বলতে শুনেছি,

إِذَا الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَخِيهِ السِّلَاحَ فَهُمَا عَلَى جُرْفِ جَهَنَّمَ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ دَخَلَاهَا جَمِيعًا

'যখন দু'জন মুসলিম তাদের হাতিয়ার নিয়ে পরস্পরের মুখোমুখি হবে, তখন তাদের দু'জনই জাহান্নামে যাবে।"[৩৩৮] বলা হল এতে হত্যাকারির ব্যাপারটি তো বুঝা গেল, কিন্তু যাকে হত্যা করা হয়েছে তার ব্যাপারটি কেমন? তখন রাসূল (স.) বললেন, 'সেও তো তার সাথীকে হত্যা করতে চেয়েছিল।'

অন্য হাদীসে এসেছে সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস (রা.) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (স.)! যদি সে আমার ঘরে প্রবেশ করে আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয় তখন কী করতে হবে? আমাকে জানান।' রাসূল (স.) বললেন, 'তুমি তখন আদম সন্তানদের মত হয়ে যাও।' তারপর বর্ণনাকারী তিলাওয়াত করলেন:

لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ

"যদি তুমি আমাকে হত্যা করার জন্য আমার প্রতি হস্ত প্রসারিত কর, আমি আমার হাত তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার প্রতি প্রসারিত করব না। নিশ্চই আমি জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।"[৩৩৯]

এর অর্থ তুমি তাকে হত্যা করবে না, সেটা জানিয়ে দাও। আপর হাদীসে এসেছে, রাসূল (স.) হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) কে বললেন, 'হে আবূ যর! তোমার কী করণীয় থাকবে যখন দেখবে যে, আহযারু যাইত স্থানও রক্তে ডুবে গেছে?' আবূ যর (রা.) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (স.)! আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.) আমার জন্য যা পছন্দ করবেন।' রাসূল (স.) বললেন, 'তোমার উচিৎ তখন তুমি যেখানে আছ সেখানে থাকো।' অর্থাৎ পরিবার পরিজনের বাইরে না যাওয়া। তিনি বললেন, 'আমি কি আমার

---

৩৩৮. *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫১৪১

৩৩৯. আল কুর'আন, ০৫:২৮

তরবারি নিয়ে ঘাড়ে লাগাব না।' রাসূল (স.) বললেন, 'তাহলে তো তুমি তাদের সাথে হত্যায় শরীক হলে।' আবূ যর (রা.) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (স.)! তাহলে আমার করণীয় কী?' তিনি বললেন, 'তুমি তোমার ঘরে অবস্থান করবে।' আমি বললাম, 'যদি তারা আমার ঘরে প্রবেশ করে?' তিনি বললেন, 'যদি তুমি ভয় পাও যে, তরবারির চমকানো আলো তোমাকে বিভ্রান্ত করবে, তাহলে তুমি তোমার চেহারার ওপর কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও। এতে করে (যদি তোমাকে সে হত্যা করে, তবে) সে তোমার ও তার গুনাহ নিয়ে ফিরে যাবে।'[৩৪০]

উম্মাহর অনৈক্যের ভয়াবহ কুফল ও পরিণতি

অনৈক্যের কুফল এমন যে, আজকে গুঁটি কয়েক ইয়াহুদির হাতে নির্মমভাবে মার খেতে হচ্ছে ২০০ কোটি মুসলিমের গর্বিত সদস্য ফিলিস্তিনিদের। আরাকানে হাতেগোনা কিছু বৌদ্ধ দস্যুর অত্যাচারে অতীষ্ট হয়ে লক্ষাধিক রোহিঙ্গা মুসলিম জীবন বিসর্জন দিল। দশ লক্ষের বেশি জীবন নিয়ে কোনমতে পালিয়ে এসে বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেছে এবং নিজেদের সহায় সম্পদ সব সে দেশে বিসর্জন দিয়ে এসে এখানে মানবেতর জীবন যাপন করছে। ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরে মাযলুম কাশ্মীরীরা কী নির্মম অত্যাচার নির্যাতনের শিকার তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এছাড়াও আরো কতজনপদে যে মুসলিমরা নির্মমভাবে মার খাচ্ছে, কত লক্ষ মুসলিম নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে শাহাদাত বরণ করেছে, কত মা বোন তাদের ইয্যত-সম্ভ্রম হারিয়েছে তা লিখে শেষ করা যাবে না।

মধ্য প্রাচের মুসলিম দেশগুলোতে সমস্যা জিইয়ে রাখার সুযোগ পেল

আধুনিক মালয়েশিয়ার রূপকার ড. মাহাথির মুহাম্মাদ বলেছেন, 'মধ্য প্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোতে দ্বন্দ সংঘাত জিইয়ে রেখেছে আমেরিকা।' যাতে তার ঘনিষ্ঠ মিত্র ইসরাঈলের দখলদারিত্বে আরব বিশ্ব নাক গলানোর ফুরসত না পায়। গোটা ইসরাঈল রাষ্ট্রটিই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ফিলিস্তিনিদের ভূমি জবর দখল করে। এ নিয়ে কেউ কথা বলে না। কার্যত মুসলিম দেশগুলো একে অপরের পিছনে লেগে আছে। সময় এসেছে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইয়াহুদী সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়বার। তা না হলে বিশ্ব মানচিত্র থেকে মুসলিম দেশ ফিলিস্তিন একেবারেই হারিয়ে যাবে।[৩৪১] আরো কত দেশকে হারাতে হয় বলা যায় না। তবে নিজেদের অনৈক্যের কারণে আমরা আর কোন দেশ হারাতে চাই না।

মানব হত্যাকারী কাকের চেয়েও নিকৃষ্ট

---

৩৪০. *সুনানু আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪২৬১

৩৪১. *জাতীয় দৈনিক নয়াদিগন্ত*, আন্তর্জাতিক পাতা, ০৫ জুলাই -২০২০

আদম (আ.)-এর সন্ত্রাসী পুত্র কাবিল যখন নেককার তাক্বওয়াবান হাবিলকে নির্মমভাবে হত্যা করল। লাশ কী করবে কুল কিনারা করতে পারছিল না এবং সে যে মহাপাপ করেছে অনুধাবন করে কুড়ে কুড়ে মরছিল। হত্যা করা নেককার মৃত ভাইয়ের লাশ কাঁধে নিয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করছিল। হঠাৎ সে দেখতে পেল দু'টি কাক ঝগড়া করে একটি আরেকটিকে হত্যা করেছে। জীবিত কাকটি মৃত কাকটিকে মাটি খুঁড়ে তাতে পুঁতে ফেলল। এদৃশ্য দেখে কাবিল আপসোস করে বলতেছিল যে সে কাকের চেয়েও নিকৃষ্ট। কাক যে কাজটি করতে পেরেছে সে কাজটিও করতে পারল না। অবশেষে কাকের কাছ থেকে শিখে নিজের মরা ভাইকেও সে মাটিতে দাফন করে রাখল আর ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হল। আল্লাহ তা'আলা কুর'আনুল কারীমে বলেছেন:

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ

"অতঃপর তার প্রবৃত্তি তাকে স্বীয় ভ্রাতৃ হত্যার প্রতি প্রলুব্ধ করে তুলল। ফলে সে তাকে হত্যা করেই ফেলল। ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। অতঃপর আল্লাহ একটি কাক প্রেরণ করলেন, সে মাটি খুঁড়তে লাগল, যেন সে তাকে (কাবিলকে) শিখিয়ে দেয় যে, স্বীয় ভাইয়ের লাশ কীভাবে ঢাকবে, সে বলতে লাগল, আফসোস, আমি কি এ কাকের সমতুল্যও হতে পারলাম না, যাতে আমার ভাইয়ের লাশ গোপন করতে পারি! অতঃপর সে লজ্জিত হল।"[৩৪২]

অনৈক্যের ক্ষতির উদাহরণ

দুইজন মল্ল যোদ্ধা যখন পরস্পরের মাঝে কুস্তি লড়তে থাকে তখন সামান্য একজন বালকও তাদের যে কাউকেই অনায়াসে পরাজিত করতে পারে। দু'টি পাহাড়কে যদি দাঁড়িপাল্লায় সমান করা হয় তাহলে সামান্য একটি নুড়ি পাথরও তাদের মধ্যকার সমতা বিনষ্ট করে একটিকে ওপরে তুলে অন্যটিকে নিচে নামিয়ে দিতে পারে।[৩৪৩] আজকে মুসলিমদের অবস্থাও হুবহু এমন। মাত্র হাতে গোনা বিশ্বের কিছু ইয়াহুদী দুইশত কোটি মুসলিমকে নির্যাতন করে বিশ্বময়। যেখানে ৫৭টি মুসলিম দেশ সেখানে মাত্র একটা অবৈধ ইয়াহুদী দেশ। অথচ অশান্তি মুসলিম দেশে দেশে আর তারা আছে আরামে আয়েশে, বহাল তবিয়তে এবং মধ্য প্রাচ্যের সবচেয়ে আধুনিক ও নিরাপদ শহর আজকে ইসরাঈলে গড়ে তোলা হয়েছে।

তাতারিদের ভয়াবহ আক্রমণ

---

৩৪২. আল কুরআন, ০৫:৩০-৩১

৩৪৩. বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী, *আল মাকতুবাত*, মুসলিম ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব অধ্যায় (ঢাকা, উত্তরা, লিবার্টি প্রকাশনী, মে ২০১৩), পৃ. ৫৯

৬২৮ হিজরীতে মুসলিম উম্মার মাঝে বিভেদ-বিভাজন চরম আকার ধারণ করে। প্রত্যেক মুসলিম নেতা নিজ নিজ রাজ্যসীমা নিয়ে ব্যস্ত মহাব্যস্ত ছিল। রাজ্য যত ছোটই হোক না কেন? এমনকি কোন কোন রাজ্য মাত্র একটি শহরের ভিতরেই সীমাবদ্ধ ছিল। মুসলিম নেতারা কেবল বিভেদ-বিভাজনে ছিল এমন নয়, বরং পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, একে অপরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করত। কেউ কাউকে শর্তহীন নিরাপত্তা প্রদান করত না। তাদের মাঝে ঐক্য ও একতার কোন চিন্তাই ছিল না। সে প্রেক্ষাপটে মুসলিমদের বিচ্ছিন্নতার সুযোগ নিয়ে তাতারিরা মুসলিম ভূখন্ডগুলোতে ভয়াবহ আক্রমণ ও লুটতরাজ চালায়।[৩৪৪]

বাগদাদের হৃদয় বিদারক ঘটনা

৬৫৫ হিজরীতে বাগদাদে শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে সংঘর্ষে ভয়াবহ লুটতরাজ, হত্যাকাণ্ড চলে, মুসলিমদের বহু বাড়ীঘর বিধ্বস্ত হয়। এ ছাড়াও মাযহাবগত দলাদলি অন্যান্য মুসলিম এলাকাগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ে। এ বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে চীনের মঙ্গোলিয়া হতে আগত চেঙ্গীস খাঁন ও হালাকু খানঁ মুসলিম সভ্যতার নগরী বাগদাদকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে। ৬৫৬ হিজরীর ১২ই মুহাররম হালাকুর সৈন্যদল বাগদাদে প্রবেশ করে এবং ১৪ই সফর বুধবার খলীফাতুল মুসলিমীনকে শহীদ করে। খলীফার দুই পুত্র আমীর আবু বকর আহমাদ ও আবুল ফাযায়েল আব্দুর রহমানকে তাতারীরা নৃশংসভাবে হত্যা করে এবং খলীফার কন্যা, স্ত্রী ও পরদানশিন অন্যান্য মহিলাগণকে তাদের দাসীতে পরিণত করে। ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান তাঁর রচিত ‘ইসলাম ও আধুনিক বিশ্ব’ পুস্তকে আব্বাসীয় খিলাফতের পতন ও হালাকু খানের বাগদাদের ধ্বংসযজ্ঞের বর্ণনা দিতে যেয়ে উল্লেখ করেছেন যে, সর্বশেষ আব্বাসীয় খলিফা আল-মুসতাসিম বিল্লাহর রাজত্বকালে শিয়া, সুন্নী এবং হানাফী ও হাম্বলী সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব ও বৈষম্য চরম আকার ধারণ করে। খলিফা শিয়া সম্প্রদায়কে সমূলে উৎপাটিত করার জন্য অভিযান পাঠালে শিয়া মতাবলম্বী মন্ত্রী মুযাইদ উদ্দিন মুহম্মদ আলকামী হালাকু খানকে বাগদাদে আক্রমণের আমন্ত্রণ জানিয়ে খলিফার ওপর প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্প করে। হালাকু খান ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে বাগদাদে আক্রমণ চালায়। দীর্ঘ চব্বিশ দিন অবরোধ ও আক্রমণের পর খলিফা তাঁর পরিবার-পরিজনসহ হালাকু খানের কাছে আত্মসমর্পণ করে প্রাণ ভিক্ষা চান। কিন্তু হালাকু খাঁন বাগদাদ দখলের দশ দিনের মধ্যে খলিফা ও তাঁর পরিবারবর্গের পুরুষ সদস্যদেরকে হত্যা করে। মহিলাদেরকে দাসী হিসেবে গ্রহণ করে। হালাকু খানের খৃষ্টান মন্ত্রী ডকুজ

---

৩৪৪. ড. রাগিব সারজানি, *তাতারিদের ইতিহাস* (ঢাকা: মাকতাবাতুল হাসান, জানুয়ারী-২০১৮), পৃ. ১০৫

(Doquz) এবং শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত লোক ব্যতীত প্রায় ২০ লক্ষ লোক মাত্র ছয় সপ্তাহে নিষ্ঠুর মোঙ্গল বাহিনীর বর্বরতা ও হত্যাকান্ডের শিকার হয়।[৩৪৫]

ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, তিন দিন ধরে নগরীর রাজপথগুলিতে রক্তের স্রোত প্রবাহিত হয় এবং ইউফ্রেটিস নদীর পানি রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। ঐতিহাসিক গিলম্যান বলেন, "এভাবে শতসহস্র নিহতের গগণভেদী আর্তনাদ এবং বর্বর বিজয়োন্মাতাল মোঙ্গলদের প্রকট উন্মাদনায় যে বাগদাদ পাঁচশত বৎসর ধরে শিল্প, বিজ্ঞান এবং সাহিত্যের গৌরবোজ্জল কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল তা চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। ৬৩২ খৃষ্টাব্দে রাসূল (স.) এর ওফাতের পর মদীনায় যে পবিত্র খিলাফতের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তা দীর্ঘ ছয় শতাব্দীরও বেশী সময় নিরবচ্ছিন্নভাবে চলার পর নিজেদের কোন্দলের কারণে ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে বর্বর মোঙ্গলদের আক্রমণে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এর ফলে শুধু একটি সাম্রাজ্যেরই পতন হল না, একটি ইসলামী সভ্যতারও পতন ঘটল। মোঙ্গল আক্রমণের ফলে সুন্নী ইসলামের বিপর্যয় ঘটে। শিয়া ও সুন্নীদের বিরোধ চরম আকারে দেখা দেয়। মুসতাসিমের খিলাফতে শিয়া প্রধান উযীর আলকামী হালাকু খাঁনের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করার প্রয়াস পান এবং এর মূলে ছিল সুন্নী ইসলামের প্রতি তার বিদ্বেষ। এছাড়া শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত নাসির উদ্দিন তুসী হালাকু খানের পরামর্শদাতা ছিলেন। এর ফলে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের পতনে সুন্নী ইসলাম যে মারাত্মক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় তা হতে পুনরুদ্ধার করা আর সম্ভবপর হয়নি। বলা বাহুল্য, আব্বাসীয় খিলাফতের পতনে সুন্নী মুসলিম সমাজ ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় প্রতীক হারিয়ে অসহায় ও দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ে। ঐতাহাসিক হিট্টি বলেন, "ইতিহাসে প্রথমবারের মত মুসলিম বিশ্ব খলিফা বিহীন হয়ে পড়ে যার নাম শুক্রবারের জুমু'আর সালাতের খুতবায় আর উচ্চারিত হয়নি।"[৩৪৬]

প্রফেসর ব্রাউন তাঁর বিখ্যাত Literarz Historz of Persia বইতে বাগদাদের পতন কাহিনীর এভাবে বর্ণনা দেন- "বাগদাদের লুণ্ঠন কাজ ১২৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আরম্ভ হয় এবং সপ্তাহকাল চলতে থাকে। এ সময়ের মধ্যে আট লক্ষ অধিবাসীকে হত্যা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে যে বাগদাদ মহানগরী শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিশ্ব নবী (স.) এর মহান সাহাবী ও জামাতা চতুর্থ খলীফা আমীরুল মু'মিনিন হযরত আলী (রা.) ও আব্বাসী খলীফাগণের বিশাল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল তার সমুদয় ধনভান্ডার এবং সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক সম্পদ যা দীর্ঘকাল হতে সঞ্চিত হয়ে আসছিল সমস্তই লুণ্ঠন ও বিধ্বস্ত করা হয়। তাতারীদের দ্বারা মুসলিম সংস্কৃতির যে মহা সর্বনাশ সাধিত হয়েছিল পরবর্তী যুগে তা কখনও পূরণ হয়নি। এ ক্ষতির বিবরণ প্রদান করা অসম্ভব ও

৩৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২-১২৮
৩৪৬. প্রাগুক্ত

কল্পনাতীত। কেবল যে লক্ষ লক্ষ গ্রন্থরাজী সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়েছিল তা নয়, অগণিত আলেমের শাহাদাত বরণ ও বেঁচে থাকাদের রিক্ত হস্তে শুধু প্রাণ নিয়ে পলায়ন করার দরুণ মৌলিক গবেষণা পদ্ধতি এবং সঠিক রেওয়ায়েতসমূহের সনদগুলি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায়। পৃথিবীর ইতিহাসে এত বড় বিরাট ও মহান সভ্যতাকে এত দ্রুত আগুনে ভস্মীভূত ও রক্তসমুদ্রে নিমজ্জিত করার দৃষ্টান্ত আর পাওয়া যাবে না।[৩৪৭]

তাতারী অভিযানের ফলে ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানগুলি যথা সমরকন্দ, বুখারা, খোরাসান, আজারবাইজান, মসুল এবং ইউরোপের কতকাংশও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল।"[৩৪৮]

এ ধ্বংসের অন্যতম কারণ গৃহবিবাদ

মুসলিম জাতীয় জীবনের এ উল্লিখিত ভয়াবহ বিপর্যয় ও সংকটের মূল কারণ ছিল মুসলিমদের মাঝের গৃহ বিবাদ। আর গৃহবিবাদের অন্যতম কারণ ছিল মাযহাবী কোন্দল এবং তাকলীদপন্থীদের গোঁড়ামী ও বিদ্বেষ। দুঃখের বিষয় এত বড় আঘাতের পরও মুসলিমগণ সমবেতভাবে চৈতন্য লাভ করতে পারেনি এবং নিদারুণ পরিণতি স্বরূপ আজ তাতারী অভিযানের স্থানে নাস্তিকতা ও জড়বাদের যে সয়লাব সমগ্র ইসলামী জগতকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে তার প্রতিকারের জন্য তারা আজো কুর'আন ও সুন্নাহ এর দিকে পুরোপুরি ফিরে আসতে প্রস্তুত হচ্ছে না। ঐতিহাসিক ইয়াফেয়ী (মৃ. ৭৬৮ হি.) ইসলাম জগতের তৎকালীন দুরবস্থায় মর্মাহত হয়ে লিখেছিলেন, 'হায় দুরদৃষ্ট! ইসলাম কি ভয়াবহ বিপদে আক্রান্ত হয়েছে এবং হানাফী-শাফেয়ী ও অনুরূপ কলহসমূহের কি হৃদয় বিদারক পরিণতি ঘটেছে! প্রত্যেকটি দল যে মাযহাবের অনুসরণ করে থাকে তার গোঁড়ামিতে অন্ধ হয়ে স্বীয় দলভুক্ত দুশ্চরিত্রদেরকে অকপট সমর্থন জ্ঞাপন করছে, আর অন্য মাযহাবের যারা প্রকৃত সাধুসজ্জন, তাদের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে লেগে গিয়েছে।' অথচ দুর্ভাগ্যবশতঃ এ দুষ্কার্যকে তারা সত্যপরায়ণতা ও সত্যের সহায়তা বলে ধারণা করছে, কিন্তু আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রশিকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরো এবং কখনো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।' আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন:-

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ

'যারা নিজেদের দ্বীনকে টুকরো টুকরো করে নিজেরাই নানা দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে গেছে, তাদের কোনো দায়িত্বই তোমার ওপর নেই।'[৩৪৯]

---

৩৪৭. প্রাগুক্ত

৩৪৮. প্রাগুক্ত

৩৪৯. আল কুরআন, ০৬:১৫৯

মুসলিমদের মধ্যে মাযহাব নিয়ে আত্মকলহ মারাত্মক আকার ধারণ করলে বিবরুহ বাদশার আমলে মিশরে চারটি মাযহাব সরকারী স্বীকৃতি লাভ করে এবং চার মাযহাবের জন্য চারজন সরকারী কাজীও নিযুক্ত করা হয়। ৬৬৫ হিজরীতে সরকারীভাবে চার মাযহাব স্বীকৃতি লাভ করায় ইসলামী দুনিয়া হতে অন্য মাযহাবগুলি লোপ পেতে থাকে। চরম পরিণতি স্বরূপ ৮০১ হিজরীতে সুলতান ফরহ বিন বরকুক সরকেশী পবিত্র কা'বা ঘরের চার পাশে চার মাযহাবের জন্য চারটি ভিন্ন ভিন্ন মুসল্লা নির্দিষ্ট করে দেন। তখন থেকে এক আল্লাহর দ্বীন এবং মুসলিম জাতির প্রতিষ্ঠাকেন্দ্র চার ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। অর্থাৎ সত্য ধর্মকে চারটি মাযহাবে বিভক্ত করে বিশ্ব নবীর আনীত দ্বীনে বিপর্যয় ঘটান হল।

পবিত্র কা'বায় চার ইমামের পিছনে সালাত আদায়

দীর্ঘ সাড়ে পাঁচশত বৎসর পর্যন্ত পবিত্র কা'বায় চার মাযহাবের চার ইমামের ইমামতিতে নামাজ চলতে থাকে। অতঃপর সাড়ে পাঁচশত বৎসর সৌদী আরবের বাদশাহ আব্দুল আযীয আল সউদের রাজত্বকালে ১৩৪৩ হিজরীতে কা'বার হেরেম হতে এ জঘন্য বিদ'আত বিলুপ্ত হয়। তবে মূল কেন্দ্র থেকে তা উৎপাটিত হলেও পৃথিবীর প্রায় সব মুসলিম প্রধান দেশে এ মাযহাবগত বিভক্তি এখনও প্রকটভাবে বিদ্যমান।[৩৫০]

মুসলিমরা স্পেন থেকে বিতাড়িত

সমগ্র বিশ্বের ওআইসিভুক্ত ৫৭টি দেশসহ মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহ নিয়েই মুসলিম বিশ্ব। বিশ্ব মানচিত্রে এর পরিমাণ অর্ধ পৃথিবীর চেয়েও বেশি। কোন এক সময় অর্ধ পৃথিবীর চেয়েও বেশি অঞ্চল জুড়ে এ বিশাল সাম্রাজ্য একজন মুসলিম খলীফাই পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করতেন। তবে বর্তমানে মুসলিমদের অতীতের সে বিশাল সাম্রাজ্যের খুব সামান্যই নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। বাকি সবটাই মুসলিমদের নিজেদের বিভক্তির সুযোগে অমুসলিমরা নিজেদের দখল ও নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিয়েছে। যার বড় উদাহরণ ইউরোপের স্পেন। স্পেন থেকে মুসলিমদেরকে চূড়ান্তভাবে উৎখাত করা হয়েছে আজ থেকে প্রায় পাঁচশত বছর আগে।[৩৫১] মুসলিম জাতির চির দুশমন কট্টরপন্থী ও বিদ্বেষপরায়ণ ইয়াহুদী ও খৃষ্টশক্তি। প্রায় আড়াইকোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত মুসলিম উন্দুলুসিয়ার প্রায় সমগ্র অধিবাসীকেই নির্মমভাবে গণহত্যা, উচ্ছেদ ও পেশিশক্তির বলে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিতকরণের মাধ্যমে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করে দিয়েছিল। ওরা প্রায় এগার লক্ষ তরুন-যুবক মুসলিমকে বন্দী করে আমেরিকার দাস বাজারে চালান দিয়েছিল। শত মসজিদকে গীর্জায় পরিণত করেছিল। শত শত পুস্তকাগার আগুনের লেলিহান শিখায়

---

৩৫০. *ইউকিপিডিয়া*

৩৫১. মুফতি তাকী উসমানী, *স্পেনের কান্না* (ঢাকা: পাটুয়াটুলি, মাকতাবতুল হাসান, নভেম্বর-২০১৯), পৃ. ০৭

নিক্ষেপ করে ভস্মে পরিণত করেছিল। ধ্বংস করে দিয়েছিল ঐতিহাসিক হাজার হাজার ইমারত।[৩৫২]

মুসলিমদের পশ্চাদপদ অবস্থা

মুসলিম বিশ্বের বর্তমান অবস্থা প্রায় সকলেই অবগত। দেশে দেশে মাযলুম মুসলিমদের করুণ আর্তনাদ পৃথিবীর আকাশ বাতাসকে ভারি করে তুলছে। লক্ষ লক্ষ মুসলিম আজ বাড়ী ঘর ছাড়া ও হত্যার শিকার। ব্যাপক জনবল ও প্রচুর সম্পদ থাকার পরও নিজেদের মাঝে অনৈক্য, দারিদ্র্যতা, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব, প্রযুক্তিহীনতা মুসলিম দুনিয়ার গণজীবনে অসহ দুর্ভোগ সৃষ্টি করে চলছে। ওআইসি'র ৫৭টি সদস্য দেশের মধ্যে হাতে গোণা দু-একটি ছাড়া প্রায় সবগুলোই সামরিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে আধুনিক নয় বরং পশ্চাৎপদ। রাজনৈতিক স্থিতিহীনতা মুসলিম দুনিয়ার নিত্যদিনের সঙ্গী। শুধু আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া, মিশর, আলজিরিয়া, ইয়ামেন, সুদান, লিবিয়া ও সোমালিয়াই নয়, সারা মুসলিম বিশ্বই রাজনৈতিকভাবে অস্থিতিশীল। যুলুমবাজ পরাশক্তির সামরিক আগ্রাসন, নিজেদের দেশে সামরিক অভ্যুত্থান ও পাল্টা অভ্যুত্থান, গণতন্ত্রের অভাব, আইনের শাসনের দুর্বলতা– এমন মারাত্মক পরিবেশে মুসলিম বিশ্ব সত্যিকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে বার বার ব্যর্থ হচ্ছে। আমেরিকা, রাশিয়া, চীন ভারতসহ কথিত পরাশক্তিগুলোর আগ্রাসী কার্যক্রম বহু শান্তিপূর্ণ মুসলিম দেশকে আজ নরকে পরিণত করেছে।

এর সর্বনাশা কুফলগুলিও স্পষ্ট। মুসলিম জাহান ক্রমেই তাদের অধিকার হারাচ্ছে। তাদের সম্পদ বিভিন্নভাবে পাচার হয়ে যাচ্ছে। পরাশক্তিগুলো লুণ্ঠন করে চোখের সামনে নিয়ে যাচ্ছে হাজারো লাখো বিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলারের সম্পদ কিন্তু ভুক্তভোগি মুসলিম দেশগুলো কিছুই বলতে পারছে না। সামান্য প্রযুক্তির জন্য তাদেরকে বিদেশের ওপর অসহায়ভাবে নির্ভর করতে হচ্ছে। সামরিক অথবা বেসামরিক একটি ৫০ বছরের পুরাতন বিমান ব্যবহার করতে হলেও তা অমুসলিমদের কাছ থেকেই ক্রয় করে ব্যবহার করতে হচ্ছে।

মুসলিমদের পরনির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয়

এ বিভীষিকাময় অবস্থা আমাদের নিজেদেরই সৃষ্টি। সম্পদ কিংবা জনবল কোন দিক দিয়েই মুসলিম দুনিয়া কারো পিছনে থাকার কথা ছিল না বা থাকার কথা নয়। কিন্তু আমাদের অনৈক্য, অলসতা, গাফলতি এবং অনৈতিকতার দরুন মুসলিম বিশ্বের সম্পদের ব্যাপক ব্যয় ও অপচয় হচ্ছে ঠিকই কিন্তু নিরক্ষরতা দূর হচ্ছে না। শিক্ষার মান

৩৫২. *ইউকিপিডিয়া*

বাড়ছে না। প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও আহরণ সম্ভব হচ্ছে না। শিল্পায়ন হচ্ছে না। বিশ্বের সাথে প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হওয়ার সামরিক সক্ষমতা অর্জন করা যাচ্ছে না। আমাদেরকে, মুসলিম দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষকে এমনিভাবে পিছিয়ে থাকতে হচ্ছে। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা ও কুশিক্ষা এবং পরনির্ভরতার মধ্যে কাতরাতে হচ্ছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিভক্তির পরিণতি

বাংলাদেশে মুসলিমগণের বিভক্তির অবস্থা পর্যালোচনা করলে নিম্নের বিষয়গুলো প্রকট আকাড়ে দেখা যায়ঃ

শিরক-কুফর ও খৃষ্টধর্ম প্রচারের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি

এ বিষয়টি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, তাওহীদ, সুন্নাহ ও শরীয়াহ পালনের গুরুত্বে বিশ্বাসীগণের মধ্যে বিভক্তি প্রকটতর। এতে একদিকে শিরক, কুফর ও বিদ'আতের প্রচারকদের জন্য ময়দান খুবই নিরাপদ রয়েছে। শিয়া, কাদিয়ানী, বাহাঈ, ইত্যাদি ধর্মের বা মতের অনুসারিরা তাদের দাওয়াতী কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে এবং অনেকটা নিরাপদেই চালাতে পারছে। সর্বোপরি খৃষ্টান মিশনারিরা হাজার হাজার মুসলিমকে খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করছে।[৩৫৩] দীন প্রেমিক মুসলিমগণ পরস্পরের মধ্যে মতভেদ খণ্ডন, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে ব্যস্ত থাকার কারণে এ সকল বিষয় তাদের নযর এরিয়ে যাচ্ছে। অনেক সময় নযরে আসলেও সঠিক গুরুত্ব দিতে ব্যর্থ হচ্ছেন। এমনকি অনেক সময় তারা এ সকল বিষয়ে গুরুত্বারোপের বিরোধিতা করছেন। কেউ বলছেন, 'অমুক মতের অনুসারী মূলতই কাফির, কাজেই তারা কাদিয়ানী, বাহাঈ, শিয়া বা খৃস্টান হলেই কি আর না হলেই কি!' কেউ বলছেন, 'অমুক মতের অনুসারিরা তো মুসলিম নামের কলঙ্ক, তাদের কাদিয়ানী বা খৃষ্টান হয়ে যাওয়াই ভাল। হয় আমাদের মতে এসে সঠিক ইসলাম অনুসরণ করুক অথবা খৃষ্টান হয়ে ইসলামের কলঙ্ক দূর করুক।'[৩৫৪]

কেউ বলছে, 'খৃষ্টান হচ্ছে হোক, পরে ওদেরকে সামাজিক প্রতিরোধের মাধ্যমে ফিরিয়ে আনা যাবে, এখন অমুক মত বা দল ঠেকাও! যারা খৃষ্টান হচ্ছে তারা আবার পরে আমাদের আখলাক দেখে মুসলিম হয়ে যাবে, যেভাবে হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে কাফিররা সাহাবীগণের আখলাক দেখে মুসলিম হয়ে গিয়েছিলেন! কাজেই কাদিয়ানী, বাহাঈ বা খৃষ্টান ধর্মান্তর নিয়ে এখন চিন্তা করার কোন দরকার নেই। এখন বাতিলকে ঠেকাও!' কেউ

৩৫৩. *জামায়াত ও ঐক্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪
৩৫৪. *প্রাগুক্ত*

বলছেন, 'এগুলো নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই, অমুক বা তমুক পদ্ধতিতে দীনের প্রচার বা প্রতিষ্ঠার কাজ চালিয়ে যান, এক সময় সব ঠিক হয়ে যাবে!!'[৩৫৫]

আলিম ওলামাদের বিষয়ে ব্যাপক কুৎসাচার

সমকালিন বিভক্তির অন্যতম দিক দেশের আলেম ওলামা ও দাঈগণের বিষয়ে ব্যাপক কুৎসাচার। বিশেষত প্রযুক্তির কারণে সকলের কথা একই স্থানে ইন্টারনেটে অথবা টিভির পর্দায় পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের সমাজের কম বেশি ১৫-২০% মানুষ দীন পালন করেন এবং কো না কোন ইসলামী ধারার অনুসরণ করেন বাকী প্রায় ৮০-৮৫% মুসলিম দীন পালনে অবহেলা করেন এবং কোন ধারারই অনুসরণ করেন না। এদের অধিকাংশই দীন ও আলিমদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তারা ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা সামাজিক বিভিন্ন সমস্যায় আলিমদের পরামর্শ নেয়ার চেষ্টা করেন। বর্তমানে এমন কোন ব্যক্তি যদি ঈমানী, আমলী বা দীনী কোন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে গ্রহণযোগ্য আলিম অনুসন্ধানের জন্য ইন্টারনেটে প্রবেশ করেন তবে তিনি দেখবেন যে, প্রসিদ্ধ প্রত্যেক আলিম ও দায়ীর বিষয়েই ব্যাপক কুৎসা বা নিন্দাচার বিদ্যমান রয়েছে। প্রত্যেক ভিন্নমতের আলিম বা দাঈদেরকে ইসলামের দুশমন বা ইয়াহুদী নাসারাদের দালাল বলে চিত্রিত করা হয়েছে।[৩৫৬]

এতে প্রত্যেক দলের অনুসারীগণ পরিতৃপ্ত বা আনন্দিত হলেও দেশ বিদেশে অবস্থানরত সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মুসলিমগণ এবং বিশেষত তরুণগণ খুবই সমস্যায় পড়ছেন। সমাজের আলিমগণ সকলেই খারাপ, কিছুই বোঝেন না ইত্যাদি চিন্তা তরুণদেরকে সমাজ ও আলিম ওলামাগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে।[৩৫৭] এ ছাড়া শিয়া, বাহাঈ, কাদিয়ানি, খৃষ্টান, আহলে কুর'আন ও অন্যান্য ধর্মের বা মতের প্রচারকগণ কুর'আন-হাদীসের নামে এদেরকে সহজেই গ্রাস করতে ও বিভ্রান্ত করতে পারছে। তারা কুর'আনের কিছু আয়াত অথবা বুখারী, মুসলিম বা অন্য কোন সহীহ হাদীস নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থের কয়েকটি হাদিস নিয়ে বলছে:-

'**এক.** কুর'আন হাদিস মানতে হবে
দুই. সমাজের আলিম ও ইমামগণ অযোগ্য, অসৎ ও অজ্ঞ, কাজেই আমাদের এ মতের বিষয়ে তাদের কাছে প্রশ্ন করে বা সামাধান চেয়ে লাভ নেই
তিন. আমরা কুর'আন হাদীস দেখাচ্ছি কাজেই আমাদের মতে চলে এস..।'[৩৫৮]

হানাহানি ও রক্তারক্তি

৩৫৫. *প্রাগুক্ত*
৩৫৬. *প্রাগুক্ত*
৩৫৭. *প্রাগুক্ত*
৩৫৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫

ভিন্নমত খণ্ডনের নামে ভিন্নমতের অনুসারিদের প্রতি শত্রুতা, বিচ্ছিন্নতা বা বিদ্বেষ পোষণ ও প্রচারের কারণে প্রত্যেক মতের অনুসারিদের মাঝে উত্তেজনা ও দুরত্ব বাড়ছে। কোন কোন এলাকায় মুসুল্লিদের মাঝে মারামারির ঘটনা ঘটছে। কোথাও কোথাও সালাত পদ্ধতির মত পার্থক্যকে কেন্দ্র করে নামাজী মুসলিমগণ মারামারি করে কেউ কেউ 'শহীদ'! হয়েছেন বলেও মিডিয়া ও পত্র পত্রিকায় এসেছে। এখনই এর রাশ টানতে না পারলে কয়েক বছরের মধ্যে পুলিশ প্রহরা ছাড়া এদেশের মসজিদে সালাত আদায় অসম্ভব হয়ে যাবে বলে মনে হয়।[৩৫৯]

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বিভক্তির পরিণতি

আন্তর্জাতিক বিশ্বে মুসলিমগণের বিভক্তির অবস্থা পর্যালোচনা করলে নিম্নের বিষয়গুলো প্রকট আকাড়ে দেখা যায়:-

ফিলিস্তিনে ধ্বংসযজ্ঞ

মুসলিমদের বিভক্তির সুযোগ নিয়ে ইয়াহুদীবাদী ইসরাঈল নিয়মিত ফিলিস্তিনীদের নির্মমভাবে হত্যা করে চলেছে। মুসলিমদের যে বাড়ীতে ইচ্ছা বোমা হামলা করছে। যে বাড়ীতে ইচ্ছা অভিযান চালিয়ে সুন্দরী মুসলিম মা-বোনদের তুলে নিয়ে গণধর্ষণ করছে। করছে তাদের ইয্যত লুণ্ঠন। যুবকদের ধরে নিয়ে যুগের পর যুগ ইসরাঈলী কারাগারগুলোতে বিনা বিচারে আটকে রাখছে। আকাশ থেকে বোমা বর্ষণ করে করে অসংখ্য অগণিত শিশু, যুবক এবং বৃদ্ধকে নিয়মিত হত্যা করছে। মুসলিমদের বাড়ী-ঘরগুলো গুড়িয়ে দিয়ে সেখানে ইয়াহুদী বসতি স্থাপন করছে। এভাবেই ফিলিস্তিনে ধ্বংসযজ্ঞ চলছে আজকে প্রায় শত বছর জুড়ে।

---

৩৫৯. *প্রাগুক্ত*

ইসরাঈলী বোমায় নিহত শিশুদের লাশ নিয়ে ফিলিস্তিনি অসহায় বাবাদের শোকার্ত মিছিল

ইসরাঈলী বোমায় আহত দুই শিশুকে নিয়ে নির্বাক এক বাবা

ইয়াহুদীদের হাতে শহীদ হওয়া নিষ্পাপ মুসলিম শিশুদের লাশের স্তুপ

অসভ্য ইসরাঈলী সৈন্যরা এক মাকে তুলে নিচ্ছে আর তার অসহায় শিশু বাচ্চা তাঁকে তাদের হাত থেকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

যুবতি ফিলিস্তিনী বোনকে নিয়ে যাচ্ছে বর্বর ইয়াহুদী সৈন্যরা

ইয়াহুদী কর্তৃক বায়তুল মোকাদ্দাসে আগুন ও বায়তুল মোকাদ্দাস দখল

মুসলিমদের প্রথম কিবলা ও তৃতীয় পবিত্র স্থান আল আকসা মসজিদে ১৯৬৯ সালের আগস্ট মাসের ২১ তারিখ ইয়াহুদিবাদীরা অগ্নি সংযোগ করে। ওই ভয়ানক ঘটনার মাধ্যমে ফিলিস্তিনীদের অধিকার হরণ এবং ইসলাম ও মুসলিমদের পবিত্র স্থাপনা ইয়াহুদীবাদীদের অন্যায় আচরণের বিষয়টি বিশ্ববাসির সামনে আসে। অগ্নি সংযোগের ৫০ বছর পরও মুসলিমদের ওপর আজো তাদের ধ্বংসযজ্ঞ অব্যাহত রয়েছে। ইসরাইল ১৯৬৭ সালে মাত্র ছয় দিনের যুদ্ধে বায়তুল মোকাদ্দাস শহর দখল করেছিল। আল আকসা মসজিদে আগুন দেয়ার পর ফিলিস্তিনিদেরকে ওই মসজিদে প্রবেশে বাধা দেয়া, মসজিদে প্রবেশের জন্য সময় ভাগ করে দেয়া, বায়তুল মোকাদ্দাস শহরে মুসলিমদের স্থাপনা ধ্বংস করা, মুসলিম জনসংখ্যার কাঠামোয় পরিবর্তন আনার জন্য অবৈধ ইয়াহুদি বসতি নির্মাণ প্রভৃতি অপরাধযজ্ঞ ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাচ্ছে ইসরাইল।

দখলদার ইসরাইল নতুন করে আল আকসা মসজিদে মুসলিমদের যাবতীয় স্মৃতি ধ্বংস করার পদক্ষেপ নেয়ার পর তৃতীয় ইন্তিফাদা গণআন্দোলন গড়ে ওঠেছে। আল আকসা মসজিদের বিরুদ্ধে ইসরাইলি ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ জানিয়ে দীর্ঘদিন পর্যন্ত নিয়মিত বায়তুল মোকাদ্দাস, জর্দান নদীর পশ্চিম তীরসহ বিভিন্ন এলাকায় ফিলিস্তিনিরা প্রতিবাদে ফেটে পড়ছে। আল আকসা মসজিদের বিরুদ্ধে ইসরাইলি ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় রক্তক্ষয়ী আন্দোলনই যেন ফিলিস্তিনিদের একমাত্র নিয়তী এবং অবলম্বন।

মসজিদসহ ইসলাম ও মুসলিমদের বিভিন্ন ঐতিহ্য ধ্বংস করা ইয়াহুদিবাদীদের জন্মগত স্বভাব। মুসলিমদের আঞ্চলিক বিভিন্ন সংস্থা এবং ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা বা ওআইসির মতো জোট থাকার পরও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ইসরাইলের ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে। ইসলামী সহযোগিতা সংস্থাকে আগে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা বলা হত। ইয়াহুদীবাদীরা আল আকসা মসজিদে অগ্নি সংযোগের পর ১৯৬৯ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর ওআইসি গঠন করা হয়। কিন্তু তারপরও এ জোট ইসরাইলের আগ্রাসন মোকাবেলায় আজ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কিছুই করতে পারেনি।

ওআইসি এবং রাজতন্ত্র শাসিত আরব দেশগুলোর নিষ্ক্রিয় ভূমিকার কারণে দখলদার ইসরাইল একের পর এক এ অঞ্চলে মুসলিমদের ঐতিহ্যগুলো ধ্বংস করে চলেছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ইসরাইল ১৯৬৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত ঐতিহাসিক ৪৮টির বেশি মসজিদ ধ্বংস করেছে এবং অগ্নি সংযোগ করেছে।[৩৬০]

আফগানিস্তানে বর্বোরোচিত হামলা

ফুলের মত পবিত্র নিরপরাধ শিশুদেরকে মাদরাসায় বোমা হামলা করে মেরে ফেলেছে

কিছুদিন পূর্বে দখলদার আমেরিকা আফগানিস্তানে শিশুদের একটি মাদরাসাতে বোমা হামলা চালিয়ে ১০১জন হাফেযে কুর'আনকে শহীদ করে দিয়েছে। এভাবে ২০০১ সাল থেকে আমেরিকা এবং ন্যাটোভুক্ত অমুসলিম সৈন্যরা লক্ষ লক্ষ আফগান মুসলিমকে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। লক্ষ লক্ষ শিশুকে ইয়াতীম বানিয়ে দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ চরিত্রবান মা-বোনের ইয্যত লুণ্ঠন করেছে এ অসভ্য বর্বর দখলদার বাহিনী। আর তা সম্ভব হয়েছে শুধু মুসলিমদের বিচ্ছিন্নতার সুযোগে।

ইরাকে আগ্রাসন

ইরাককে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করা হল। ইরাকের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র বা যুক্তরাজ্য যে যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল তা সম্পূর্ণ অবৈধ ছিল বলে মন্তব্য করেছেন ওই সময় যুক্তরাজ্যের উপ-প্রধানমন্ত্রী পদে থাকা জন প্রেসকট। সানডে মিররকে লেখা এক নিবন্ধে মি: প্রেসকট এ যুদ্ধের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, ২০০৩ সালে ইরাক দখল করে যুক্তরাজ্য আন্তর্জাতিক আইন ভেঙেছে। ইরাক দখলের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে সম্প্রতি যুক্তরাজ্য সরকারের প্রকাশিত এক তদন্ত প্রতিবেদনের সূত্র ধরে এ মন্তব্য করেন জন প্রেসকট। ইরাক যুদ্ধ নিয়ে সাত বছর তদন্তের পর 'চিলকট রিপোর্ট' নামের ওই তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা। এতে যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের ইরাক যুদ্ধে জড়ানোর সিদ্ধান্ত, এর পরিকল্পনা ও পরিচালনার যৌক্তিকতা নিয়ে তদন্ত করা হয়। প্রতিবেদনে ইরাক দখলের সিদ্ধান্তের জন্য ব্লেয়ারের তীব্র সমালোচনা করা হলেও যুদ্ধটি বৈধ ছিল কি না সে বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। এতে বলা হয়, ইরাক অভিযানের আট মাস

---

৩৬০. অনলাইন ভিত্তিক আন্তর্জাতিক কুর'আন বিষয়ক বার্তা সংস্থা, *ইকনা*, ২১ আগষ্ট-২০১৭

আগে ব্লেয়ার যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশকে বলেছিলেন, 'যাই হোক না কেন, আপনার সঙ্গে আছি।' আর এ সিদ্ধান্ত 'বিধ্বংসী' বলে উল্লেখ করেছেন জন প্রেসকট। ওই নিবন্ধে মি: প্রেসকট জানান যে তিনি ইরাক যুদ্ধের বৈধতা বিষয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করেছেন। মি: প্রেসকট লিখেছেন, '২০০৪ সালে জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান বলেছিলেন, ক্ষমতা পরিবর্তন ইরাক যুদ্ধের প্রধান লক্ষ্য হওয়ায় তা অবৈধ। অনেক দুঃখ ও ক্ষোভের সঙ্গে এখন আমি বিশ্বাস করছি যে তিনি ঠিক ছিলেন"। "বাকী জীবন এ যুদ্ধে যোগ দেয়া ও তার বিপর্যয়কর ফলাফলের দায় নিয়ে বেঁচে থাকব আমি"-বলেছেন জন প্রেসকট। সভ্যতার নগরী ইরাকে আমেরিকা কী তাণ্ডব চালালো বিশ্ববাসিকে তা নিরবে দেখতে হল।

লিবিয়া ও সিরিয়ায় ধ্বংসযজ্ঞ

এখানেই শেষ নয়, এরপর লিবিয়াতে কী করা হল এবং লিবিয়ার কত ক্ষতি করেছে পরাশক্তির মিথ্যা দাবিদাররা তার কি কোন হিসাব আছে? সিরিয়াতেও একই ভয়ংকর হত্যাযজ্ঞ।

নির্যাতিত আরো বিভিন্ন মুসলিম জনপদ

আমাদের পার্শ্ববর্তী গণতান্ত্রিক দেশের দাবিদার পৃথিবীর ভূস্বর্গ কাশ্মীরে কী হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে অবলিলায়, তার কি হদিস আছে জাতিসংঘের কিংবা কোন মুসলিম দেশের? সম্প্রতি মিয়ানমারের অসভ্য দস্যুরা আরাকানের নিরস্ত্র, নিরীহ মুসলিমদের উপর যে পৈশাচিক নির্যাতন চালালো তাদেরকে তাদের পূর্ব পুরুষদের ভিটে মাটি থেকে বের করে দিল কেউ কি এর বিচার করেছে? সবগুলোর উত্তর একটাই– না। কে করবে কার বিচার? সব অপকর্মের হোতাগুলো যে, ঐক্যবদ্ধ!

আর এর নির্মম শিকার যে, মুসলিমরা! এছাড়াও আরো কত জনপদে যে মুসলিমরা বলির শিকার সেটা কয়জনেই বা খবর রাখেন! কি আচরণ করা হচ্ছে চীনের জিংজিয়াংয়ের মুসলিমদের সাথে? এভাবে এ নির্যাতনের মাত্রা বেড়েই চলছে। কবে থামবে? কে থামাবে ? আমাদের ওপরও যে এ বিপদ আসবে না এরও বা গ্যারান্টি কে দিবে? আর এভাবেই মুসলিম জাতি অনৈক্যের কারণে গুটি কয়েক কাফির মুশরিকের হাতে ধুকেধুকে মার খেয়ে খেয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে? এটা কি মানা যায়? মাযলুম মুসলিমতো স্বাভাবিক কথা রক্ত মাংসে গড়া কোন মানুষও কি তা বরদাশত করতে পারে? তাহলে বাঁচার উপায় কী? তবে এর থেকে পরিত্রাণের জন্যই যেন আল্লাহ তা'আলার বক্তব্য:

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“আর তোমরা মুশরেকদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই কর তারা যেভাবে তোমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করে। আর তোমরা জেনে রাখ, নিশ্চই আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।”[৩৬১]

বিশ্ব নবীকে নিয়ে ব্যঙ্গ করার ধৃষ্টতা

মুসলিমদের দূর্বলতা এবং বিচ্ছিন্নতার সুযোগে এবার ইসলাম বিরোধী শক্তি আখিরী যমানার পয়গম্বর মানবতার মহান বন্ধু সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব প্রিয় নবী রাসূলে আকরাম (স.) এর শানেও চরম বেয়াদবী শুরু করে দিয়েছে। ডেনমার্ক ও ফ্রান্সের বিভিন্ন পত্রিকা নিয়মিত বিশ্ব নবীর শানে চরম বেয়াদবীমূলক অশ্লীল কার্টূন প্রকাশ করছে। এর সুযোগ পাচ্ছে শুধুমাত্র মুসলিমগণের ঐক্যবদ্ধ কোন শক্তিশালী অবস্থান না থাকার কারণে।

আল কুর'আনে আগুন দেয়ার ধৃষ্ঠতা

ইউরোপীয় কয়েকটি দেশে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ মহাগ্রন্থ আল কুর'আনুল কারীমের গায়ে আগুন লাগানোর মত ধৃষ্টতাও নাস্তিক এবং ইসলাম বিদ্বেষী শক্তি দেখাচ্ছে। যেটা কোন আইনেই বৈধতা দেয় না। এ জাতীয় ভয়াবহ বহু অন্যায় আজকে গুটি কিছু অমুসলিম অনবরত করার দুঃসাহস দেখাচ্ছে মুসলিমদের বিচ্ছিন্নতা সুযোগ নিয়ে এবং তা দেখাচ্ছে মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ কোন অবস্থান না থাকার কারণে।

৩৬১ আল কুর'আন, ৩৬

দশম অধ্যায়

ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সমস্যাসমূহ

➢ সুশিক্ষার অভাব

মুসলিম ঐক্যের পথে অন্যতম বাধা অজ্ঞতা ও মূর্খতা। মুসলিমদের জন্য যদি প্রতিটি ক্ষেত্রে সুশিক্ষা নিশ্চিত করা যেত তাহলে নিজেদের মাঝে ভেদাভেদ কমে যেত। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

"বলুন! যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান? নিশ্চই চিন্তা-ভাবনা তারাই করে যারা বুদ্ধিমান।"[৩৬২]

আর এ জন্যই "পড়" এ আদেশ দানের মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট গ্রন্থ মহাগ্রন্থ আল কুর'আন নাযিল শুরু করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

'পড় তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে ঝুলে থাকা (রক্ত) পিণ্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন। পড় আর তোমার রব বড়ই অনুগ্রহশীল। যিনি (মানুষকে) কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে এমন বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না।"

➢ মাযহাবের গোঁড়ামী

দেশে দেশে এবং বিশ্বময় মুসলিম বিশ্বে ঐক্যের পথে অন্যতম বাঁধা হয়ে দাড়িয়েছে মাযহাবী গোড়ামী। অথচ মাযহাবগুলোর উৎপত্তি হয়েছিল ইসলামকে, দ্বীনকে ইসলামী বিধি বিধানকে সহজভাবে উপস্থাপন করার জন্য।

➢ কুর'আন ও সুন্নাহর আইন সমাজে কার্যকর না থাকা

৩৬২ আল কুর'আন, ৩৯:০৯

কুর'আন-সুন্নাহর আইন বর্তমান সমাজে কার্যকর না থাকার কারণে মুসলিম উম্মাহকে একতাবদ্ধ করা যাচ্ছে না। বলা চলে উম্মাহর ঐক্যের পথে শতটা প্রতিবন্ধকতা থাকলেও এটা এক নম্বর প্রতিবন্ধকতা। এ জন্য সবার আগে এ বিষয়ে বিবেকবান প্রতিটি মুসলিমের আন্তরিকতার পরিচয় দেয়া উচিৎ যে 'কুর'আন-সুন্নাহর আইনকে সমাজে বাস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবো'।

➢ দীন বিজয়ী না থাকা

দ্বীন বিজয়ী থাকলে দ্বীনই প্রতিটি মুসলিমকে একতাবদ্ধ রাখার জন্য যথেষ্ঠ ছিল। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, আজকে মুসলিম দেশ আছে কিন্তু সেখানে দ্বীন বিজয়ী নেই। আর তা না থাকার কারণে মুসলিমদেরকেও একতাবদ্ধ রাখা সম্ভব হচ্ছে না।

➢ মুসলিম উম্মাহর দীন বিজয়ের ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্ম না থাকা

আমাদের সমাজে দ্বীনও বিজয়ী নেই এমনকি দ্বীন বিজয়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ কোন প্লাটফর্মও নেই। বিচ্ছিন্নভাবে কিছু ইসলামী দল চেষ্টা করছে ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য তবে সেখানে সমর্থক সংখ্যা দেশগুলোর মোট জনসংখ্যার তুলনায় বেশি নয়।

➢ খিলাফত ব্যবস্থা ও খলীফা না থাকা

এ শতাব্দীতে মুসলিমদের বিচ্ছিন্নতার অন্যতম আরেকটি কারণ খিলাফত ব্যবস্থা না থাকা। অথচ বিশ্ব নবী (স.) ইনতেকালের পর থেকে গত শতক পর্যন্ত ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থা কায়েম ছিল। অনুরূপভাবে মুসলিমদের বর্তমানে কোন একক খলীফাও নেই। থাকলে তিনি গোটা মুসলিম জাতিকে এক রাখতে সক্ষম হতেন। মুসলিমদের আজকে যে দুঃখ-দুর্দশা তা উত্তরণে অবশ্যই মুসলিম খলীফা বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতেন।

➢ দেশে দেশে যারা ক্ষমতায় রয়েছেন তারা ঐক্যের ধ্যান ধারণা পোষণ না করা

গোটা পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই সরকার রয়েছেন। এমনকি মুসলিম দেশসমূহে মুসলিম ব্যক্তিরাই ক্ষমতায় রয়েছেন। তবে তাদের মাঝে যথাযথ ইসলামী শিক্ষা না থাকার কারণে, ইসলামী বিধি বিধান যথাযথ মান্য করার বিষয়ে তাদেরকে যেমন উদাসীন দেখা যায় তেমনি উম্মাহর প্রতি দরদ না থাকার কারণে উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করে উম্মাহর হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার বিষয়ে তাদের আন্তরিকতার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

➢ ক্ষমতার লোভ

অধিকাংশ দেশের সরকারী দায়িত্বে থাকা লোকগুলোর মাঝে জাগতিক লোভ-লালসা বেশি পরিলক্ষিত হয়। যার কারণে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে তারা যতটা আন্তরিকতার পরিচয় দেন তার চেয়ে তাদের ক্ষমতাকে যে কোন মূল্যে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে তাদের আরো বেশি তৎপরতা দেখা যায়।

➢ সম্পদের লোভ

মুসলিমদের বিরাট একটা গোষ্ঠীর মাঝে আজকে জাগতিক সম্পদের লোভ ঢুকে গেছে। তারা জান্নাত প্রাপ্তির আশায় যত তৎপর তার চেয়ে বেশি তৎপর জাগতিক ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা প্রাপ্তির জন্য। তারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসতে পারলে দেখা যায় জনগণ ও দেশের টাকা যেন তেনভাবে খরচ করা শুরু করে দেয়। অর্থকরি ভিন দেশে পাচার করে। ভিন দেশে বাড়ী, গাড়ী ইত্যাদি আয়োজন করতে থাকে। তাদের কর্মকাণ্ড দেখলে মনেই হয় না যে, ‘এ লোককে একদিন মরতে হবে। সব কিছুর জন্য একদিন আল্লাহর কাছে জবাবদিহী করতে হবে’। বরং জাগতিক সম্পদ লাভই তার কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়।

➢ অমুসলিমদের ষড়যন্ত্র ও প্রোপাগান্ডা

ইয়াহুদী, মুশরিক, মুনাফিক, নাস্তিক ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায় সর্বদা মুসলিমদের বিভক্ত রাখতে তৎপর। বিশেষ করে ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের অন্যতম কর্মসূচী হল মুসলিমদের যে কোন মূলে বিভক্ত রাখা। এ বিষয়ে ইরানের বর্তমান সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহিল উযমা সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী বলেছেন, ‘মুসলমানদের মধ্যে মত পার্থক্য সৃষ্টি করে তাদের ঐক্যের ওপর আঘাত হানা ইয়াহুদীবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর প্রধান কর্মসূচী।’[৩৬৩]

➢ ঐক্যের সুনির্দিষ্ট এজেন্ডা না থাকা

মুসলিম দেশগুলোর বর্তমান সরকারগুলোকে মুসলিমদের একতাবদ্ধ করার জন্য কোন কর্মসূচী হাতে নিয়ে তা বাস্তবায়ন করতে দেখা যায় না। অথচ তারা যদি এ কর্মসূচী হাতে নিয়ে সামান্য প্রচেষ্টাও চালাতো এতে অনেক বড় সফলতা আসত। কারণ প্রবাদ বাক্য আছে:

الناس على دين ملوكهم

“মানুষেরা তাদের রাজাদের দীনের উপরই থাকে।”

---

৩৬৩ *দৈনিক পার্স টুডে*, ৬ জুলাই ২০১৬

➢ যালিম পরাশক্তির ভয়

অধিকাংশ মুসলিম দেশের সরকার প্রধানই নিজের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে যালিমদের সাথে আঁতাত করে ক্ষমতায় টিকে থাকার চেষ্টা করেন যা মুসলিম উম্মাহর জন্য খুবই ভয়াবহ একটা বিষয়। যার কারণে দেখা যায় মুসলিম দেশের সরকার হয়ে মুসলিমদের স্বার্থ নিয়ে তারা যতটুকু কাজ করেন তার চেয়ে বেশি অমুসলিমদের স্বার্থ রক্ষায় তারা তৎপর। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"সে তো শয়তান। সে তোমাদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়; কাজেই যদি তোমরা মু'মিন হও তবে তাদেরকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর।"[৩৬৪]

➢ ইসলামী ঐক্য প্রতিষ্ঠায় অন্যান্য সমস্যাসমূহ

২০০৫ সালের ৪ঠা আগষ্ট জাতীয় দৈনিক সংগ্রামে তৎকালীন বাংলাদেশ জাতীয় শারীয়াহ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের সম্মানিত খতীব মাওলানা ওবায়দুল হক (র.) সাহেবের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি ইসলামী ঐক্য প্রচেষ্টা সফল না হওয়ার ৫টি কারণ উল্লেখ করেছেন। পরে অবশ্য এর সাথে তিনি আরো একটি যোগ করে এর কারণ মোট ৬টি বলে উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হচ্ছে:-

১. এক দল অপর দলকে বিদ্রুপ করা।
২. নিজের দোষ না দেখে অন্যের দোষ তালাশ করা।
৩. প্রতিপক্ষকে গালি দেয়া ও মন্দ উপাধিতে তিরস্কার করা।
৪. নিজস্ব ধারণাবশত বিনা প্রমাণে অভিযোগ করা।
৫. আত্ম-গর্ব ও অহংকারবশত ধারণা করা যে, শুধু আমরাই ঠিক; অন্য সবাই ভ্রান্ত ও ইসলামের দুশমন।
৬. কারো সাথে পরামর্শ ছাড়াই যা ইচ্ছা করে ফেলা।[৩৬৫]

---

৩৬৪ আল কুরআন, ০৩:১৭৫
৩৬৫ *বাংলাদেশে ইসলামী ঐক্য প্রচেষ্টার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০-১৪১

একাদশ অধ্যায়

উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্য উপায় ও করণীয়

ঐক্যের জন্য কাজ শুরু করতে হবে ব্যক্তি পর্যায় থেকে এবং তা প্রভাব বিস্তার করবে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল পর্যন্ত। এ জন্য নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো এখন থেকে গুরুত্ব দিতে হবে। **কারণ তা ঐক্যের জন্য খুবই প্রয়োজন:-**

➢ সকলের জন্য সুশিক্ষা নিশ্চিত করা

ঐক্যের অন্যতম হাতিয়ার সুশিক্ষা। যে শিক্ষা ব্যক্তিকে বিনয়ী হতে শিখায়, নিজস্ব মূল্যবোধ তৈরী করে দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে কাজ করতে যোগ্য করে তোলে সে শিক্ষা সর্বস্তরে নিশ্চিত করা। যে শিক্ষা মানুষকে ভালবাসতে শিখায়, কাছে টানতে শিখায়, মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূরীকরণে প্রেরণা দেয় তা আজ অনেক বেশি প্রয়োজন। আর তা হলো আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত ও রাসূল (স.) প্রদর্শিত শিক্ষা ব্যবস্থা। কিন্তু যে শিক্ষা পারস্পরিক বিভেদ শিখায় বা বিভেদকে উসকে দেয় আপাতত সে শিক্ষা বর্জন করা।

➢ ঐক্যের প্রেরণা দান

মুসলিমদের বিভিন্ন মাযহাবের মধ্যে ঈমানের দিক দিয়ে সুন্দর ঐকমত্য রয়েছে। এ দিকটি তাদের ঐক্যের জন্য মজবুত ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। সকল মুসলিম এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী, মহানবী (স.) এর নবুওয়াতের প্রতি সবাই আস্থাশীল, মহাগ্রন্থ আল কুর'আন সকলেরই পবিত্র কিতাব এবং কা'বার দিকে মুখ করেই সবাই নামায আদায় করেন। সবাই রমজান মাসে রোযা রাখেন, একই পদ্ধতিতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, ছেলেমেয়েদের একই শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলেন এবং একই পদ্ধতিতে মৃতের দাফন কাফন সম্পন্ন করেন। প্রেরণাদায়ক এ বিষয়গুলো সামনে রেখে আমরা আমাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করলে ঐক্যবদ্ধ হওয়া বা থাকা অসম্ভব নয়।

➢ বলিষ্ঠ নেতা নির্বাচন

এ যুগে দরকার সালাহুদ্দীন আইয়্যুবীর মত একজন বলিষ্ঠ নেতা। গোটা মুসলিম উম্মাহর উচিৎ এমন একজন নেতা খুঁজে বের করে তাঁর হাতে নেতৃত্ব তুলে দিয়ে তাঁর নেতৃত্বে

বিজয়ের স্বপ্ন লালন করে সামনে এগিয়ে যাওয়া। এমন নেতা যদি খুঁজে পাওয়া না যায় তবে সে চাহিদা পূরণে নিজের জায়গা থেকে নিজে মুসলিম উম্মাহর জন্য কিছু করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা সাধনা করা।

➢ সঠিক নেতৃত্ব দান

নেতৃত্বে যারা আছেন তাদের উচিৎ এ আমানতের সর্বোচ্চ কৃতজ্ঞতা আদায়ার্থে মুসলিমদের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য বর্তমান মুসলিমদের শিক্ষা-দীক্ষা, নীতি-নৈতিকতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তিতে এগিয়ে নেয়ার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা সাধনা করা। ক্ষমতা পেয়ে নিজের বাড়ী-গাড়ী ইত্যাদির জন্য অপচেষ্টা না করে নিরলসভাবে দূর্নীতিমুক্ত জীবন যাপন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে পরবর্তী জেনারেশনের জন্য প্রেরণার উৎস হওয়া। এ চিন্তা সব সময় লালন করা যে, 'ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়। জীবনকালও চিরস্থায়ী নয়' সুতরাং সেভাবেই সুযোগকে কাজে লাগানো।

➢ দেশের আলেম সমাজের গোলটেবিল বৈঠক

আলেম সমাজ মুসলিম উম্মাহর জন্য আল্লাহ প্রদত্ত (Natural Leader) প্রাকৃতিক নেতা। একজন ব্যক্তির জন্মগ্রহণের পর কানে আযান দেয়া থেকে শুরু করে তার বিবাহ, মৃত্যুবরণ করলে তার কাফন-দাফন, জানাযা ইত্যাদি এ আলেমদেরকেই ব্যবস্থা করতে হয়। এ ছাড়া প্রতি সপ্তাহে জুমুআর দিক নির্দেশনামূলক খুৎবাহ খতীব সাহেব বা ওলামায়ে কিরামই দিয়ে থাকেন। বাৎসরিক দু'বার ঈদের খুৎবাতেও একটি বছর মুসলিম উম্মাহর কী করণীয় এবং বর্জণীয়? এ বিষয়ে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য শুধুমাত্র তাদের পক্ষ থেকেই আসে। এ জন্যই তারা আমাদের Natural Leader. আর দেশের আলেম সমাজেরও উচিৎ সেভাবে জ্ঞানার্জন করা এবং দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যু নিয়ে তারা দেশের শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কিরাম, সমাজচিন্তক, রাজনীতিবিদ, সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন মহলের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং জাতীয় বিভিন্ন বিষয়ের সমস্যার সমাধান টেবিল বৈঠকের মাধ্যমেই করে দিতে চেষ্টা করা।

➢ মুসলিম নেতৃবৃন্দের নিজেদের মাঝে চা চক্র, গোল টেবিল বৈঠক

মানুষ সামাজিক জীব। এজন্য নিজেদের মাঝে যত যোগাযোগ, উঠাবসা, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি হবে তত একজনের প্রতি আরেকজনের, একদলের প্রতি আরেকদলের হৃদ্যতা, আন্তরিকতা, মহব্বত ও ভালবাসা বাড়বে। এতে মুসলিম হিসেবে ভেদাভেদ তৈরী না হয়ে বরং একে অপরের বিপদ আপদের সাথী হবার সুযোগ হবে এবং এতে দেশ ও জাতির

কল্যাণ হবে। এক ব্যক্তি বিশ্ব নবী (স.) কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কোন ইসলাম উত্তম? তিনি বলেছেন:

تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ

"তুমি মানুষকে খাবার খাওয়াবে এবং তোমার চেনা অচেনা সকলকে সালাম দিবে (এটাই শ্রেষ্ঠ ইসলাম)।"[৩৬৬]

➢ একে অপরকে মূল্যায়ন করা

ইসলামের বিভিন্ন দল ও মাযহাবের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যতম যে বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দিতে হবে তা হল ইসলামের সার্বিক কাঠামো ও মৌলিক বিশ্বাসের ঐক্যের গণ্ডিতে বিভিন্ন মত, চিন্তাধারা ও ইজতিহাদকে স্বীকৃতি দান এবং পরস্পরের মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সংলাপের ক্ষেত্র সৃষ্টি করা ও অনৈক্য পরিহার করে এক কাতারে এসে দাঁড়ানো। অমূলক ধারণার ভিত্তিতে আক্রমণাত্মক ও নেতিবাচকভাবে একে অপরের মতকে খণ্ডন করার পরিবর্তে সঠিক যুক্তি ও জ্ঞানের আলোকে পর্যালোচনার মাধ্যমে একে অপরকে মূল্যায়ন করা। সকল মাযহাবকে স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের সুযোগ দেয়া, বিধি-বিধান ও আচার-অনুষ্ঠান পালনের অনুমতি দান এবং পরস্পরের স্বার্থ ও অধিকারের প্রতি সচেতন থাকা। এক্ষেত্রে আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন ইসলাম হল সে ধর্ম যা ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানদেরকেও স্বীয় শাসনের অধীনে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছে সেক্ষেত্রে মুসলিমদের অধিকার রক্ষা অনেক বেশি গুরুত্বের দাবি রাখে।

বর্তমানে ইসলামের শত্রুরা ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য কোমর বেঁধে নেমেছে। তাই মুসলিমদের নিজেদের মতদ্বৈততা ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করতে হবে। কোনভাবেই শত্রুদের মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিদ্যমান মতপার্থক্যকে ব্যবহার করে স্বার্থ উদ্ধারের সুযোগ দেয়া যাবে না। সকলকে মহান আল্লাহর এ আহ্বানের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে:

أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

"তোমরা (আল্লাহর) দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা কর এবং দ্বীনের ব্যাপারে পরস্পর বিভেদে লিপ্ত হয়ো না।"[৩৬৭]

➢ কারো প্রতি ক্ষোভ বা ঘৃণা না রাখা

৩৬৬. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১১

৩৬৭. আল কুরআন, ৪২:১৩

একজন প্রকৃত মু'মিন কখনো অন্য মু'মিনের প্রতি ক্রোধ বা ক্ষোভ লালন করার কথা নয়। বিশেষ করে যারা আল্লাহর কাছে নিজের ভুলের জন্য সর্বদা মাগফিরাত কামনা করেন, তারা তার সাথেও অন্য কারো কৃত ভুলকে অনায়াসেই মাফ করে দেয়ার কথা। অন্যের প্রতিও দয়াপরবশ হওয়ার কথা যেহেতু তিনিও আল্লাহর দয়ার মুখাপেক্ষী। আর প্রকৃত ঈমানদারদের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

"যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে, মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তজ্জন্যে তারা অন্তরে ঈর্ষাপোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্থ হলেও তাদেরকে (মুহাজিরদেরকে) অগ্রাধিকার দান করে। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত তারাই সফলকাম। আর এ সম্পদ তাদের জন্য, যারা তাদের পরে আগমন করেছে। তারা বলে: 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ও ঈমানে অগ্রগামী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব! নিশ্চই আপনি স্নেহপরায়ণ, পরম দয়ালু।"[৩৬৮]

➢ অন্যের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা ও অন্যকে সহায়তা

বিশেষ কারণ ছাড়া অন্যের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখাই উত্তম, এটাও সাওয়াবেরই কাজ। যে অন্যের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে আল্লাহও তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখেন। বিশ্ব নবী (স.) বলেছেন:

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

"যে ব্যক্তি কোন মু'মিনের দুনিয়ার কোন একটি বিপদ দূর করে দিবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার বিপদ দূর করে দিবেন। যে বক্তি কোন অভাবগ্রস্থ মু'মিনের অভাব দূর করে দিবে, আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখিরাতের অভাব দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ

৩৬৮. আল কুরআন, ৫৯:১০-১১

তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দাহকে সাহায্য করতে থাকেন যতক্ষণ বান্দাহ তার ভাইকে সাহায্য করতে থাকে।"[৩৬৯]

➢ নিজেদের মাঝে ঐক্যবদ্ধ দৃঢ় বন্ধন তৈরী করা

ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা এ বিষয়টি প্রমাণ করেছে যে, যদি কোন দল ও জনসমষ্টি পরাশক্তির অধিকারী হতে চায় তবে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ ও নিজেদের মধ্যে দৃঢ় বন্ধন গড়ে তুলতে হবে। এ বাস্তবতাকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পেরেছে বলেই দেখা যায় পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী দেশগুলো এবং ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানরা তাদের মধ্যকার ঐতিহাসিক শত্রুতাকে ভুলে গিয়ে রাজনৈতিক, কুটনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে একই প্লাটফর্মে সমবেত হয়েছে। অন্যদিকে মুসলিম দেশগুলো ভৌগলিক, আঞ্চলিক, ভাষাগত, জাতিভিত্তিক ও রাজনৈতিক সীমার বিভাজনেই শুধু বিভক্ত নয় বরং তারা একদিকে পাশ্চাত্যের অনুপ্রবেশকৃত ঈমান বিধ্বংসী ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ধর্মবিদ্বেষী মনোভাবাপন্ন ও তথাকথিত ডেমোক্রেসির নামে শতদলে বিভক্ত হয়েছে, অন্যদিকে সুস্থ ও সঠিক ধর্মীয় চিন্তার বিকাশের অভাবে সংকীর্ণ মাযহাবী চিন্তা ও গোড়ামির বশবর্তী হয়ে স্বীয় দল ও মাযহাবের বাইরের সকলকে বিচ্যুত, বিভ্রান্ত আবার কখনও কখনও ধর্মবহির্ভূত বলে গণ্য করছে। পরিণতিতে ধর্মীয় অন্তর্কোন্দলের সৃষ্টি হচ্ছে। এমনকি একদল অপরদলকে নিশ্চিহ্ন করাকে জিহাদ বলে ঘোষণা করছে এবং নারী ও শিশুদের হত্যা ও তাদের ওপর নির্যাতন চালানোকেও বৈধ জ্ঞান করছে। আর কিছু ইসলামের ধ্বজাধারী বলে দাবিকারী শাসক যারা প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদীদের দোসর এ ধরনের অপরাধ সংঘটন ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ ইন্ধন যোগাচ্ছে। এখানে একটি তথ্য উপস্থাপন জরুরী বলে মনে করছি। আর তা হল বিগত অর্ধশতাব্দীতে মুসলিম বিশ্ব বিদেশী আগ্রাসনে যতটা না ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার থেকে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ ও অন্তর্কোন্দলে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মিশরের আলআহরাম সাময়িকীর রিপোর্ট অনুযায়ী আরববিশ্ব ইসরাঈলের সঙ্গে যুদ্ধে বিগত পাঁচ দশকে ৩০০ বিলিয়ন ডলার খেসারত দিয়েছে। এর বিপরীতে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ সংঘাতে অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ ১.২ ট্রিলিয়ন ডলার। যখন যায়নবাদী ইসরাঈলের হাতে একলক্ষ মুসলিম শহীদ হয়েছে তখন মুসলিমদের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও দলের মধ্যে সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছে ২৫ লক্ষ লোক। অবশ্য এ পরিসংখ্যান আমেরিকার ইরাক ও আফগানিস্তানে হামলার (যাতে বিশ লক্ষ লোক নিহত হয়েছে) এবং সাম্প্রতিক সিরিয়ায় চলমান যুদ্ধের প্রাণহানি ও অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতিকে হিসাবে আনেনি। এরূপ ভয়াবহ অবস্থায়ও মুসলিম উম্মাহ সম্বিত ফিরে পায়নি। যদিও মুসলিম উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ ঐক্যের প্রত্যাশী কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এ উম্মারই একাংশের উগ্রচিন্তা ও ধর্মান্ধতাকে ব্যবহার করে তাদের স্বার্থ হাসিল করে চলেছে।

---

৩৬৯. *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৮৬৭

➢ আন্তর্জাতিক ইসলামী নেতৃবৃন্দ বার বার নিজেদের মাঝে বৈঠক ও যোগাযোগ বৃদ্ধি

মুসলিম উম্মাহ কোন দেশ বা গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকার জাতি নয়। মুসলিম উম্মাহকে সৃষ্টিই করা হয়েছে গোটা বিশ্ববাসির কল্যাণের জন্য। এ কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি দেশের মুসলিমগণ যেমন পাস্পরিক একতাবদ্ধ থাকবেন তেমনি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও তারা ভালবাসার একই বন্ধনে আবদ্ধ থাকবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি তোমাদেরকে বের করা হয়েছে মানবতার কল্যাণে। তোমরা মানুষকে সৎকাজের আদেশ দিবে, অসৎকাজে বাধা দিবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। আর আহলে কিতাবগণ যদি ঈমান আনতো তবে তা ছিল তাদের জন্য ভাল। তাদের কিছু সংখ্যক মু'মিন আছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই কাফির।"[৩৭০]

সুতরাং মুসলিম উম্মাহ নিজ দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও সব সময় একে অপরের যোগাযোগ এবং খোঁজ খবর রাখবে। এক ভূ-খন্ডের মুসলিমগণ কোন বিপদের সম্মুখীন হলে তাদের সহায়তায় গোটা বিশ্ব মুসলিম এগিয়ে আসবে।

➢ আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দু'আ করা

বর্তমান এ প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তা'আলা যেন মুসলিম উম্মাহকে ঈমানের ওপর অটল অবিচল রাখেন। নিজেদের মাঝের ভেদাভেদ দূর করে দেন এ জন্য পরস্পর পরস্পরের জন্য বেশি বেশি দু'আ করা। আল্লাহ তা'আলা দু'আ শিখিয়ে দিয়েছেন:

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ

"হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরগুলোকে বক্র করে দিও না এবং তোমার নিকট থেকে আমাদেরকে করুণা দান কর। নিশ্চই তুমি মহাদাতা। হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চই তুমি সমস্ত মানুষকে একদিন একত্রে সমবেত করবে এতে কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চই আল্লাহ ওয়াদা খিলাফ করেন না।"[৩৭১] আল্লাহ তা'আলা আরো দু'আ শিখিয়েছেন:

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

৩৭০. আল কুরআন, ০৩:১১০
৩৭১. আল কুরআন, ০৩:০৮-০৯

"হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান করুন, যারা আমাদের চক্ষুশীতলকারী হয়। আর আমাদেরকে মুত্তাকীদের ইমাম বানিয়ে দিন।"[৩৭২] বিশ্ব নবী (স.) দু'আ করতেন:

اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَأَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَارْضِنَا وَارْضَ عَنَّا

"হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে বাড়িয়ে দিন কম দিবেন না। আমাদেরকে সম্মানিত করুন, অপমানিত করবেন না। আমাদেরকে দান করুন, বঞ্চিত করবেন না। আমাদেরকে অন্যদের ওপর প্রাধান্য দিন, অন্যদেরকে আমাদের ওপর প্রাধান্য দিবেন না। আপনি আমাদের ওপর সন্তুষ্ট থাকুন এবং আমাদেরকেও আপনার প্রতি সন্তুষ্ট রাখুন।"[৩৭৩]

মুসলিম ঐক্য বিনির্মাণে আল্লাহ যেন সকলকে কবুল করেন। এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য যেন মানসিকতা দান করেন এবং অতীতে যারা ভুল করেছেন বলে মনে হয় আল্লাহ যেন তাদেরকে মাফ করে দেন এ দু'আ বেশি বেশি করা। আল্লাহ তা'আলা কুর'আনুল কারীমে আরো বলেছেন:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

"আর যারা তাদের পরে আসেন তারা বলে (দু'আ করে) 'হে আমাদের রব আপনি আমাদেরকে ও ঈমানে অগ্রগামী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রাখবেন না।' হে আমাদের রব নিশ্চই আপনি দয়াদ্র ও পরম দয়ালু।"[৩৭৪]

➢ বিশ্ব নবী (স.) এর দু'আ

اللَّهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ وَنَجِّنَا مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِينَ بِهَا قَابِلِيهَا وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا

"হে আল্লাহ! আমাদের অন্তরগুলোর মাঝে জোড়া লাগিয়ে দিন। আর আমাদের নিজেদের মাঝের বিরোধ মীমাংসা করে দিন। আমাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করুন। আমাদেরকে অন্ধকারসমূহ থেকে আলোর দিকে মুক্তি দিন।

---

৩৭২. আল কুরআন, ২৫:৭৪

৩৭৩. *সুনানুত তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩০৯৭

৩৭৪. আল কুরআন, ৫৯:১০

আমাদেরকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যাবতীয় অশ্লীল কাজ থেকে দূরে রাখুন। আপনি আমাদেরকে বরকত দিন আমাদের শ্রবণ শক্তিতে, দৃষ্টিশক্তিতে, অন্তরসমূহে, আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিতে। আর আমাদের তাওবা কবুল করুন। নিশ্চই আপনি তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু।"[৩৭৫]

➢ পরকালিন সফলতাই চূড়ান্ত সফলতা এ প্রেরণা লালন

পৃথিবীর জীবনই আসল জীবন নয় বরং পরকালীন জীবনই আসল জীবন। পৃথিবীর বিজয় বা সফলতাই চূড়ান্ত বিজয় বা সফলতা নয় বরং পরকালীন বিজয় বা সফলতাই আসল বিজয় বা সফলতা এ ধ্যান ধারণা সর্বদা মনে লালন করতে চেষ্টা করা। এর ওপরই নির্ভর করছে মুসলিমদের একতা অথবা বিভক্তি। যারা বিভক্ত থাকতে চান তারা সাময়িক স্বার্থ ত্যাগ করতে রাযি নয় বলেই বিভক্তি চান। কিন্তু তার চিন্তাই থাকে যদি পরকালিন সাফল্য তাহলে সামান্য স্বার্থের মোহে তারা কখনো বিভক্ত থাকতে পারেন না। বরং আল্লাহর আদেশ পালনে সর্বদা ঐক্যবদ্ধ থাকতেই তারা বদ্ধপরিকর থাকেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى

"বস্তুতঃ তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দাও অথচ পরকালের জীবনই উৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী।"[৩৭৬]

➢ সামরিক শক্তি অর্জন

মুসলিম দেশগুলোর উচিৎ আধুনিক মুসলিম দেশগুলো থেকে সামরিক অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়পূর্বক বর্তমান এ শতাব্দিতে নিজেরা বিজয় অর্জনের জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা। বাংলাদেশসহ প্রতিটি মুসলিম দেশ মুসলিম দেশগুলোর সাথে সামরিক চুক্তিবদ্ধ থাকা। যেন কোন ইসলাম বিদ্বেষী শত্রুদেশ কখনো কোন ধরনের ষড়যন্ত্র করলে দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে দেয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা কুর'আনুল কারীমে আদেশ করেছেন:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

"আর তোমরা কাফিরদের মোকাবেলা করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও সদাসজ্জিত অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে, যা দ্বারা আল্লাহর ও তোমাদের শত্রুকে ভীত সন্ত্রস্ত করবে। এছাড়া অন্যান্যদেরকেও যাদেরকে তোমরা জান না কিন্তু আল্লাহ জানেন।

৩৭৫. সুনান আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৮২৫
৩৭৬. আল কুরআন, ৮৭:১৬-১৭

আর তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় কর, তার প্রতিদান পরোপুরি তোমাদেরকে প্রদান করা হবে। তোমাদের প্রতি (কম দিয়ে) মোটেও যুল্‌ম করা হবে না।”[৩৭৭]

➢ আধুনিক সমরাস্ত্র উৎপাদন ও রপ্তানি

মুসলিম দেশগুলোর উচিৎ নিজেরাই নিজেদের দেশের আত্মরক্ষার জন্য আধুনিক যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদন করা। প্রয়োজনে এক্ষেত্রে যে মুসলিম দেশগুলো এগিয়ে আছে তাদের সাথে সখ্যতা রেখে তাদের সাহায্য নেয়া। ৫৮টি মুসলিম দেশ যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমরাস্ত্র নির্মাণে গুরুত্বারোপ করে গোটা পৃথিবীকে আধুনিক অস্ত্র দিয়ে সাজিয়ে ফেলতে পারেন।

➢ বিশ্ব পরিস্থিতি মূল্যায়ণ করা

প্রকৃত মুসলিমদের ওপর পৃথিবীর প্রায় সব অমুসলিম দেশেই চলছে অবর্ণনীয় নির্যাতন। এমনকি খোদ মুসলিম দেশেও ইসলামিক নেতৃবৃন্দের ওপর চলছে অকথ্য নির্যাতন। দেশে দেশে নির্যাতন যেন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে। সত্যিকারের মুসলিম মানেই বৈষম্যের শিকার, মুসলিম মানেই তার প্রতি অন্যায় অবিচার! তার প্রতি সন্ত্রাসের অপবাদ আরোপ। অথচ সত্যিকারের কোন মুসলিম কখনো সন্ত্রাস করে না, কিন্তু তাকেই অপবাদ দেয়া হয় সন্ত্রাসের। আর কোন অমুসলিম লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করলেও তাকে সন্ত্রাসী ব্যক্তি, তার দেশকে সন্ত্রাসী দেশ বলা হয় না! বরং মুসলিমদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন করে শান্তি পুরষ্কার নেয়ার ঘটনাও ঘটেছে। যেমন: আমেরিকা ও ইসরাঈলের কয়েকজন প্রেসিডেন্ট শান্তি পুরষ্কার লাভের ঘটনা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মুসলিমদের কত নির্মমভাবে মারা হচ্ছে এটার জ্যান্ত উদাহরণ আরাকানের রোহিঙ্গা মুসলিমরা। মগ দস্যুরা একদিকে আরাকানের মাযলুম মুসলিমদের নির্মমভাবে হত্যা করছে, তাদের বাপ দাদাদের ভিটে মাটি ছাড়া করছে। আর তাদেরই নেত্রী অংসান সূচীর হাতে আন্তর্জাতিক নোবেল কমিটি শান্তি পুরষ্কার তুলে দিয়েছে। এগুলো মূল্যায়ণ করে অমুসলিম যালিমদের যাবতীয় চক্রান্ত রূখে দেয়ার শপথ নেয়া।

➢ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা

মাযলুমদেরকে, মুসলিমবিশ্বকে কীভাবে যালিমদের হাত থেকে বাঁচানো যাবে? নাকি শুধু মারই খাবে! না বাঁচানোর ও বাঁচার পথ আছে! আর তা হচ্ছে একটাই; ইস্পাত কঠিন ঐক্য। ঐক্যই পারে মুসলিমদেরকে আবারো সম্মানের আসনে বসাতে। ঐক্যই পারে মুসলিমদের যাবতীয় সব ধরনের অত্যাচার ও নির্যাতনের হাত থেকে উদ্ধার করতে। আজকে মুসলিমরা যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে যেতে পারে তাহলে আমাদের উপর যালিম

---

৩৭৭. আল কুরআন, ০৮:৬০

অমুসলিমদের যেই আগ্রাসন এবং যুলুম-নির্যাতন, শুধু তা-ই বন্ধ হবে না বরং ঐক্যবদ্ধ হতে পারলে আমরা আমাদের যাবতীয় প্রাপ্যও অমুসলিমদের হাত থেকে কড়ায়-গন্ডায় আদায় করে নিতে পারব! এজন্য নিজ নিজ দেশের জনগোষ্ঠীকে এক পতাকা তলে এনে মুসলিম দেশগুলোর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা দরকার।

➢ আমাদের করণীয়

আজকে বাংলাদেশী যারা রয়েছি, আমরা যদি দলমত নির্বিশেষে ঐব্যবদ্ধ হয়ে যেতে পারি তাহলে মায়ানমার বাংলাদেশকে নিয়ে যে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে তার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে দেয়া সহজ হবে। মায়ানমার মাযলুম রহিঙ্গা মুসলিমদেরও কোন ধরনের ছল চাতুরি ছাড়া স-সম্মানে সে দেশের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দিয়ে সেখানে ফিরিয়ে নিবে এবং ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হবে। অনুরূপভাবে যত মুসলিম দেশ রয়েছে সবগুলো দেশ যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজেদের স্বাধীনতা স্বকীয়তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার কাজে নিজেরাই মনোযোগী হয় তাহলে অমুসলিম দেশগুলোর যাবতীয় আক্রমণ ও হুমকি ধামকি সবই বন্ধ হবে। তাই এখন থেকে আমাদের প্রত্যয় হওয়া দরকার একটাই আর সেটা হচ্ছে যে কোন মূল্যে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাব। শত কষ্ট হলেও আমরা ঐক্য বিনষ্ট করবো না, ঐক্য বিনষ্ট হতে দিব না। আমাদের ভাই ভাই সর্ম্পক বিনষ্ট হতে দিতে পারি না। আল্লাহ তা'আলা আল কুর'আনে বলে দিয়েছেন:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

'নিশ্চই মু'মিনগণ পরস্পরে ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা তোমাদের ভাইদের মাঝে মীমাংসা কর আর আল্লাহকে ভয় কর। আশা করা যায় তোমরা দয়া প্রাপ্ত হবে।'[৩৭৮]

➢ প্রয়োজনে শান্তি চুক্তি করা

মুসলিম দেশগুলোতো ঐক্যবদ্ধ থাকবেই প্রয়োজনে কোন অমুসলিম দেশের পক্ষ থেকে যদি কোন ধরনের শত্রুতা অথবা আক্রমণের আশংকা থেকে থাকে তবে তাদের সাথে স্বল্প অথবা দীর্ঘ মেয়াদী শান্তি চুক্তি করে রাখা যায়। তবে নিশ্চই তা গোলামী চুক্তি হবে না। তা হতে হবে শান্তি চুক্তি। আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের উদ্দেশ্য করে আল কুর'আনুল কারীমে বলেছেন:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"আর যদি তারা সন্ধির আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহলে তুমিও সন্ধির জন্য আগ্রহী হও এবং আল্লাহর ওপর ভরসা রাখ। নিশ্চই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"[৩৭৯]

---

৩৭৮ আল কুরআন, ৪৯:১০
৩৭৯ আল কুরআন, ০৮:৬১

➢ শিক্ষা বিপ্লব

ইসলামের উত্থান শুরু ইকরা দিয়ে, সুতরাং মুসলিম দেশগুলোর উচিৎ শিক্ষা বিপ্লব সাধনের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করা। আজকে জাগতিক জ্ঞান বিজ্ঞানে অমুসলিমরা এগিয়ে রয়েছে তাদের মোকাবিলায় নিজেদের শিক্ষা ব্যবস্থার বিষয়ে নযর দেয়া। শিক্ষায় এগিয়ে থাকার প্রত্যয় নিয়ে প্রতিটি মুসলিম দেশের যৌথ শিক্ষা বিপ্লব কমিশন গঠন করা যেতে পারে। আর শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হতে হবে নিজ রবের পরিচয় জানা। যিনি সৃষ্টি করেছেন, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আলাক্ব থেকে। তিনি মানুষকে এমন বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না। আল্লাহ তা'আলা কুর'আনুল কারীমের প্রথম নাযিল করা আয়াতসমূহে তা-ই বলেছেন:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

"পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে আলাক্ব থেকে সৃষ্টি করেছেন। পড় আর তোমার প্রভু অধিক সম্মানিত। যিনি মানুষকে কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে এমন বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না।"[৩৮০] আর শিক্ষার উদ্দেশ্যই হবে দুনিয়ায়ও সফলতা লাভ করা, পরকালেও সফলতা লাভ করা।

➢ আকাশ গবেষণা

আকাশ ও মহাকাশ গবেষণার বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা কুর'আনুল কারীমে সরাসরি দিক নির্দেশনা ও তথ্য দিয়ে রেখেছেন, এরপরও মুসলিম উম্মাহ এ বিষয়ে পিছিয়ে রয়েছে। কারণ বর্তমান মুসলিমগণ কুর'আন নিয়ে সেভাবে চিন্তা গবেষণা করেন না বলেই মনে হয়। অথচ এ বিষয়ে অতীতের মুসলিম বিজ্ঞানিগণ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপাত্ত পেশ করে গেছেন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ বিষয়ে গবেষণা করে আকাশ ও সৌরজগতে মুসলিম আধিপত্য কায়েমের জন্য আয়োজন করা দরকার।

➢ মিডিয়া ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ

বর্তমান যুগ মিডিয়ার যুগ। বিশ্বের এ প্রান্তের খবর ঐ প্রান্তে ঐ প্রান্তের খবর এ প্রান্তে মুহূর্তের মধ্যে পৌঁছে যায় মিডিয়ার কল্যাণেই। তবে ইসলাম বিদ্বেষী মহলের হাতে যাবতীয় মিডিয়ার নিয়ন্ত্রণ থাকার কারণে এর মাধ্যমে মুসলিমগণ ধারণাতীত ক্ষতির শিকার হচ্ছেন। এ জন্য অতি গুরুত্ব দিয়ে প্রতিটি মুসলিম দেশ নিজস্ব স্বতন্ত্র আন্তর্জাতিক

---

৩৮০ আল কুরআন, ৯৬:০১-০৫

মানের মিডিয়া প্রতিষ্ঠা করা দরকার এবং সবগুলো মুসলিম দেশের যৌথ মিডিয়া সংস্থা তৈরী করে ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রম পরিচালনা করা দরকার।

➢ ইসলামিক মিডিয়া তৈরী

ইসলাম সার্বজনীন একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। আল্লাহ তা'আলা নিজেই ইসলামকে পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি এ ইসলামে সকলকে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এর প্রচার, প্রসার এবং প্রতিষ্ঠায় মিডিয়াকে অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগানো দরকার। এ জন্য দেশে দেশে ইসলামিক মিডিয়া তৈরী করে ইসলামের জন্য তা ব্যবহার করা সময়োপয়োগী কাজ।

➢ ইসলামিক মিডিয়া ব্যক্তিত্ব তৈরী

মিডিয়া পরিচালনা ও মিডিয়ায় কথা বলা, টক-সো পরিচালনা ইত্যাদি কাজে মুসলিমদেরকে সচেতন করে তোলার জন্য ও এর মাধ্যমে মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য পরিকল্পিত লোকবল তৈরী করা দরকার। এ জন্য প্রতিটি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বা বিভিন্ন ইনিষ্টিটিউটে এ জাতীয় ডিপার্টমেন্ট খুলে বহুমূখী প্রচেষ্টা চালানো দরকার। আল্লাহ তা'আলা কুর'আনুল কারীমে বলেছেন:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

"তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের দিকে আহবান কর হিকমত ও সদুপদেশের মাধ্যমে আর তাদের সাথে বিতর্ক করবে উৎকৃষ্টতম পন্থায়। নিশ্চই তোমার প্রতিপালক ভালভাবেই জানেন কে তাঁর পথ ছেড়ে গোমরাহ হয়ে গেছে। আর হিদায়াতপ্রাপ্তদের বিষয়েও তিনি ভালভাবেই জানেন।"[৩৮১]

➢ নিজস্ব স্যাটেলাইট

দু-একটি মুসলিম দেশ ছাড়া অধিকাংশ মুসলিম দেশেরই নিজস্ব কোন স্যাটেলাইট ব্যবস্থা নেই। বরং ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের কাছ থেকে ধার করা স্যাটেলাইট দিয়ে নিজেদের প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা করছে, এটা খুবই হতাশাজনক বিষয়। এজন্য প্রতিটি মুসলিম দেশেরই উচিৎ নিজেদের ব্যবস্থাপনায় নিজেদের স্যাটেলাইট উৎক্ষেপন এবং নিজেদের প্রযুক্তি সংক্রান্ত উন্নতি নিজেরাই পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা।

---

৩৮১. আল কুরআন, ১৬:১২৫

➢ মুসলিম সোস্যাল মিডিয়া

আজকে দুনিয়া কাঁপানো সোস্যাল মিডিয়া ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার ইত্যাদীসহ সোস্যাল যোগাযোগের যাবতীয় সব আবিষ্কারই ইয়াহুদী, মুশরিক এবং খ্রিষ্টানদের। সবার মনে প্রশ্ন মুসলিমরা তাহলে কী করেন? তারা এত পিছিয়ে কেন? মুসলিম উম্মাহর বিশাল একটা অংশ এগুলো ব্যবহারে অভ্যস্থ। আর এগুলোর ব্যবহার ছাড়া বর্তমান দুনিয়ায় চলাও যায় না। যে জন্য মুসলিম দেশগুলোর উচিৎ দেশে দেশে প্রযুক্তিবিদ যারা রয়েছেন তাদেরকে কাজে লাগিয়ে এ জাতীয় সোস্যাল মিডিয়া নিজেরা তৈরী করা এবং সেগুলোর ব্যবহার সহজ করে দেয়া। বর্তমানে এ জাতীয় কিছু মিডিয়া মুসলিম তরুণ প্রযুক্তিবিদরা সামনে নিয়ে আসছে, যেমন আলাদিন সোস্যাল ডট কম। এ জাতীয় মিডিয়াগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে হালাল মিডিয়া হিসেবে তা মুসলিম দুনিয়ার জন্য কাজে লাগানো। আর এ বিষয়ে যদি কোন দেশ গাফেল থাকে তাহলে তারা আরো পিছিয়ে পড়বে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

➢ ইন্টারনেটের বিকল্প মুসলিমদের তৈরী ইন্টারনেট

বর্তমান ইন্টারনেট সিস্টেম সবটাই অমুসলিমদের তৈরী ও তাদের নিয়ন্ত্রণে। এ প্রযুক্তির বিষয়ে মুসলিম বিজ্ঞানীগণ এগিয়ে আসা উচিৎ এবং পৃথিবীর প্রায় ২০০ কোটি মুসলিমের জন্য বিকল্প কোন আয়োজন সামনে নিয়ে আসা দরকার। কারণ নেট দুনিয়া নিয়ন্ত্রণ করেই আজকে ইসলামের দুশমনরা তথ্য প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে মুসলিমদেরকে দাবিয়ে রেখেছে। সবগুলো মুসলিম দেশ একত্রে চিন্তা ও গবেষণা করলে এ বিষয়ে বিকল্প কিছু সামনে নিয়ে আসা অসম্ভব নয়।

➢ মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিকপন্থা অবলম্বন

ইসলাম এসেছিল ঐক্যের পয়গাম নিয়ে। কিন্তু অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও গোঁড়ামীর কবলে পড়ে সে আজ মতবিরোধ ও ঝগড়া বিবাদের বস্তুতে পরিণত হয়েছে। কতিপয় ক্ষুদ্র আনুষঙ্গিক মাযহাবী মাস'আলাকে কেন্দ্র করে ঝগড়া বিবাদের তুফান বইয়ে দেয়া হয়েছে। এসবের কারণ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, প্রতিটি গ্রুপই সত্য ও ন্যায়ের কেন্দ্র থেকে কিছু না কিছু বিচ্যুত হয়েছে। গোঁড়ামী এবং বিদ্বেষ দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। প্রত্যেকেই সত্যের অনুসারী বলে দাবী করেছে। কিন্তু সত্যের একনিষ্ঠ রাজপথে চলার পরিবর্তে তারা আবেগতাড়িত হয়েছে। এ বিষয়ে শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলাবী (র.) বলেন, 'আমি পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ, তিনি আমাকে সঠিক, সুষম, ন্যায়-পন্থা জানার মানদণ্ড প্রদান করেছেন। তা দিয়ে আমি সত্য ও ভ্রান্তির মধ্যে পার্থক্য করতে পারছি। জানতে পারছি, সত্যের সরল সোজা

রাজপথ কোনটি! আরো জানতে পারছি, লোকেরা এখন কোন ধরনের মতবিরোধসমূহের মধ্যে নিমজ্জিত। আর তাদের এসব মতবিরোধ ও ঝগড়া বিবাদের ভিত্তি কী?[৩৮২]

মুসলিমদের এ অবস্থা সচেতন মানুষকে ভীষণ পীড়া দেয়। তাই তাদের সমস্যার সঠিক ধরন তাদের সামনে তুলে ধরা দরকার। তাদের চিন্তা ও উপলব্ধির ভ্রান্তি সম্পর্কে তাদের সাবধান করা দরকার। তারা এ ভ্রান্ত পথে মুখে এবং কলমের মাথায় যে বাড়াবাড়ি করছে, সে সম্পর্কে তাদের হুঁশিয়ার করা দরকার।'[৩৮৩]

➢ তাকলীদ বিষয়ে সচেতনতা

বিবাদের সবচাইতে বড় হাতিয়ারটি হলো তাকলীদ। চারজন ইমামের তাকলীদের ব্যাপারে প্রায় গোটা উম্মাত একমত। সে প্রাচীন যুগ থেকে আজ পর্যন্ত লোকেরা প্রায় সর্বসম্মতভাবে তাঁদের তাকলীদ করে আসছে। আর এতে যে বিরাট কল্যাণ নিহিত আছে, তাও সকলের চোখের সামনেই রয়েছে। বিশেষ করে কাল পরিক্রমায় লোকেরা যখন দ্বীনি বিষয়াদি নিয়ে চিন্তা গবেষণা পরিত্যাগ করে বসেছে, তখন নিজ মতের পিছে ছুটে বেড়াচ্ছে এবং নফসের ঘোড়ার পিছে দৌড়াচ্ছে।

তাকলীদ সম্পর্কে ইবন হাযমের বক্তব্য, "কুর'আন এবং প্রাচীন আলিমগণের সর্বসম্মত মতানুযায়ী তাকলীদ হারাম এবং মুজতাহিদ ইমামগণ স্বয়ং তাঁদের তাকলীদ করতে নিষেধ করে গেছেন" কথাটি লোকদের দারুণ ভুল বুঝাবুঝিতে নিমজ্জিত করেছে। তারা মনে করে বসেছে, কথাটা বুঝি সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্যই প্রযোজ্য! কথাটি স্বয়ং সত্য কথা। তবে তা প্রযোজ্য হবে ক্ষেত্রবিশেষে। অর্থাৎ তাকলীদ নিষিদ্ধ তাদের জন্যে, যারা ইজতিহাদের যোগ্যতা রাখেন অন্তত একটি মাস'আলার ক্ষেত্রে হলেও। তাদের জন্যেও তাকলীদ করা নিষেধ, যারা সুস্পষ্টভাবে জানেন যে, 'রাসূলুল্লাহ (স.) অমুক কাজের হুকুম দিয়েছেন, অমুক কাজ নিষেধ করেছেন এবং অমুক হুকুম রহিত।' এ জ্ঞান তারা সরাসরি হাদীস অধ্যয়ন করে অর্জন করুক কিংবা অর্জন করুক দ্বীনের সেরা আলিমদের আমল দেখে, তাতে কিছু যায় আসে না। এ সত্যের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন শাইখ ইযযুদ্দীন আবদুস সালাম। তিনি বলেছেন:-

"ঐসব ফকীহদের অবস্থা দেখে আমি বিস্মিত হচ্ছি, যারা স্বীয় ইমামদের ইজতিহাদী ভ্রান্তি সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও সে ভ্রান্তিকে আঁকড়ে ধরে থাকে এবং তা ত্যাগ করে কিতাব, সুন্নাহ ও কিয়াসের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিশুদ্ধ মতকে গ্রহণ করে না। বরং এসব অজ্ঞ-অন্ধরা তাদের অন্ধ তাকলীদের ভ্রান্ত জজবায় অনেক সময় বাস্তবে কুর'আন-সুন্নাহর

৩৮২ *মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০-১০১
৩৮৩ *প্রাগুক্ত*

বিরুদ্ধে চলে যায় এবং স্বীয় ইমামকে ত্রুটিহীন প্রমাণ করার জন্যে কুর'আন-সুন্নাহর এমন ভ্রান্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে যা কালামের তাহরীফ ছাড়া আর কিছু নয়।"[৩৮৪]

তিনি অন্যত্র লিখেছেন:
"প্রথম যুগের লোকেরা যে আলিমকেই সামনে পেতেন, তাঁর কাছেই ফতোয়া জেনে নিতেন। তিনি কোন খেয়াল ও মাসলাকের লোক, তা জানার চেষ্টা করতেন না। কিন্তু পরবর্তীকালে এ অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়ে যায়। চার মাযহাবের আবির্ভাব ঘটে। সেগুলোর অন্ধ অনুকরণকারীদের আগমন ঘটে। লোকেরা হিদায়াতের আসল উৎস থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবল ইমামদের বক্তব্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, তাদের কোনো বক্তব্য যতোই দুর্বল ও দলিলবিহীন হোক না কেন। ভাবটা যেন এমন যে, মুজতাহিদরা মুজতাহিদ নন বরং আল্লাহর রাসূল, মাসূম এবং তাদের কাছে ওহী নাযিল হয়! এটা সত্য ও হকের পথ নয়। বরঞ্চ নির্ঘাত অজ্ঞতা ও ভ্রান্তির পথ।"[৩৮৫]

এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু শামাহ বলেন:-
"কেউ যদি ফিকহের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন, তিনি যেনো কোনো একটি মাযহাবকে যথেষ্ট মনে না করেন। বরঞ্চ প্রত্যেক মুজতাহিদের মতামত যেনো মনোযোগ দিয়ে দেখেন। প্রত্যেকের মধ্যে ডুব দিয়ে সত্যের বাতি জ্বালিয়ে দেখা উচিত। অতঃপর যে মতটিকে কুর'আন-সুন্নাহর অধিকতর কাছাকাছি মনে করবেন সেটাই যেনো গ্রহণ করেন। প্রাচীন আলিমগণের জ্ঞান ভাণ্ডারের প্রয়োজনীয় অংশগুলোর প্রতি যদি তিনি নযর দেন, তবে ইনশাআল্লাহ যাচাই বাছাইর এ শক্তি অর্জন করা তার জন্যে সহজ হয়ে যাবে এবং সহজেই শরীয়তের সত্যিকার রাজপথের সন্ধান পেয়ে যাবেন। এরূপ লোকদের কর্তব্য হলো গোষ্ঠীগত গোঁড়ামী থেকে নিজেদের মন মস্তিষ্ককে পবিত্র রাখা। বিবাদ বিসম্বাদের ময়দানে একটি কদমও না ফেলা। কারণ সেখানে সময় নষ্ট করে মূলত স্বভাব ও আচরণে বিকৃতি লাভ করা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না।'[৩৮৬]

ইমাম শাফেয়ী (র.) এর বক্তব্য:-

ইমাম শাফেয়ী (র.) তাঁর এবং অন্যদের তাকলীদ করতে লোকদের নিষেধ করে গেছেন। একথা বলেছেন শাফেয়ীর ছাত্র আল মুযনী তাঁর গ্রন্থ মুখতাসার এর সূচনায়। ইবন হাযমের মন্তব্য এমন সাধারণ ব্যক্তির ব্যাপারেও প্রযোজ্য যে দ্বীনি ইল্‌ম সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান না থাকায় তাকলীদ করে বটে, কিন্তু কোনো একজন ফকীহর তাকলীদ এই দৃষ্টিভঙ্গিতে করেন যে, তিনি ভুল করেন না, তিনি যা বলেন সবই সঠিক। তাছাড়া দলিল প্রমাণের দিক থেকে তাঁর মত যতোই ভুল এবং বিপরীত মত যতোই বিশুদ্ধ হোক না কেন, সর্বাবস্থায়ই সে তাঁর তাকলীদের ওপর জমে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। মূলত এ নীতি সে

---

৩৮৪. *প্রাগুক্ত*

৩৮৫. প্রাগুক্ত

৩৮৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩-১০৪

ইয়াহুদীবাদেরই অনুরূপ যা তাওহীদী আদর্শকে শিরকে রূপান্তরিত করে দিয়েছিল।"[৩৮৭] এ প্রসংগে একটি হাদীস উল্লেখযোগ্য। হাদীসটি সহীহ মুসলিমে আদী ইবনে হাতিম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এ প্রসঙ্গে, রাসূলুল্লাহ (স.) নিম্নোক্ত আয়াতখানা তিলাওয়াত করেছেন:

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

"তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের উলামা মাশায়েখদের রব বানিয়ে নিয়েছে।"[৩৮৮]

এ আয়াত পড়ে তিনি বলেছেন: "ইয়াহুদীরা তাদের উলামা মাশায়েখদের ইবাদাত করতো না বটে, কিন্তু তারা যখন কোনো জিনিসকে বৈধ বলতো। তারা সেটাকেই (নির্বিচারে) বৈধ বলে গ্রহণ করতো আর তারা তাদের জন্য যেটাকে নিষিদ্ধ করতো, সেটাকেই অবৈধ বলে মেনে নিতো।"

সুতরাং এ দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো একজন মাত্র ইমামের তাকলীদ করা এবং এ ধারণা করে যে, তিনি শরীয়তের নির্ভুল মুখপাত্র -তার পূজা করারই সমতুল্য।

ঐ ব্যক্তির ব্যাপারেও ইবন হাযমের ফতোয়া প্রযোজ্য যে মনে করে, কোনো হানাফীর জন্যে শাফেয়ী ফকীহর কাছে এবং কোনো শাফেয়ীর জন্যে হানাফী ফকীহ্র নিকট ফতোয়া চাওয়া বৈধ নয়, কিংবা হানাফীর জন্যে শাফেয়ী ইমামের পিছে এবং শাফেয়ীর জন্যে হানাফী ইমামের পিছে (নামাযে) ইক্তেদা করা বৈধ নয়। এটা সাহাবী, তাবেয়ী ও উলামায়ে সালাফের কর্মনীতির সুস্পষ্ট বিরোধিতা। এরূপ চিন্তা ও কর্ম কোনো অবস্থাতেই বৈধ হতে পারে না।[৩৮৯]

মূলত এ হল ইবন হাযমের মন্তব্যের সঠিক তাৎপর্য। যেখানে অবস্থা এরূপ নয়, সে ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্যও প্রযোজ্য নয়। যেমন, এক ব্যক্তি কেবল রাসূলুল্লাহর (স.) এর বক্তব্যের ভিত্তিতেই দ্বীনকে দ্বীন মনে করে, আল্লাহ ও রাসূল (স.) যা হালাল করেছেন, সেটাকেই হালাল মনে করে, আল্লাহ ও রাসূল (স.) যা হারাম করেছেন সেটাকেই অবৈধ মনে করে এবং কোন অবস্থাতেই কোন মানুষের বক্তব্যকে বৈধ ও অবৈধতার মানদন্ড বানায় না।

কিন্তু এরূপ বিশুদ্ধ ঈমান আকীদার অধিকারী হওয়া সত্বেও যেহেতু সে কুর'আন-হাদীস সম্পর্কে যথেষ্ঠ জ্ঞান রাখে না, বিরোধপূর্ণ হাদীসসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের যোগ্যতা রাখে না এবং কুর'আন ও হাদীসের ভিত্তিতে মাসায়েল ইস্তিম্বাতের যোগ্যতা রাখে না, সেহেতু সে যদি তার দৃষ্টিতে সুন্নাতে রাসূলের ভিত্তিতে ফতোয়া দেবার উপযুক্ত নির্ভরযোগ্য কোনো আলিমের ইক্তেদা-অনুসরণ করে এবং মনে এ চিন্তা রাখে যে, যখনই সে আলিমের কোনো ফতোয়া কুর'আন-সুন্নাহর প্রমাণিত দলিলের বিপরীত দেখতে পাবে, তখনই তা ত্যাগ করবে, কোনো প্রকার গোঁড়ামী করবে না, এরূপ ব্যক্তির জন্য

---

৩৮৭. *প্রাগুক্ত*

৩৮৮. আল কুরআন, ০৯:৩১

৩৮৯. *মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

তাকলীদকে কিছুতেই অবৈধ বলা যেতে পারে না। কারণ, রাসূল (স.) এর সে যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত মুসলিমদের মধ্যে ফতোয়া চাওয়া এবং ফতোয়া দেয়ার এ নিয়মই অবিচ্ছিন্নভাবে চলে আসছে। সুতরাং এ নীতিতে আমল করার পর এক ব্যক্তির কাছে সবসময় ফতোয়া কিংবা বিভিন্ন ফকীহর নিকট বিভিন্ন সময় ফতোয়া চাওয়া উভয়টাই বৈধ।[৩৯০]

➢ কুর'আন-হাদীসের শাব্দিক অনুসরণ এবং ইস্তেখরাজ

তাকলীদের পর মুসলিমদের মধ্যে সবচাইতে বড় সমস্যার কারণ হয়েছে কুর'আন-হাদীসের শাব্দিক অনুসরণ এবং ইস্তেখরাজ।
এখানে দু'টি নিয়ম রয়েছে। একটি হলো, কুর'আন ও হাদীসের শাব্দিক অনুসরণ। আর দ্বিতীয়টি হলো, মুজতাহিদ ইমামদের প্রণীত উসূলের ভিত্তিতে মাসায়েল ইস্তিম্বাত করা। শরয়ী দিক থেকে এ দু'টি নিয়মই সর্বস্বীকৃত। সকল যুগের বিজ্ঞ ফকীহগণ দু'টি বিষয়ের প্রতিই গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তবে কেউ একটির প্রতি অধিক মনোনিবেশ করেন, আবার কেউ অপরটির প্রতি বেশী যত্নবান হন। কিন্তু কোনো একটিকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ কেউ করেননি। সুতরাং হক পথের কোনো পথিকেরই কেবল একটি মাত্র পন্থার প্রতি সম্পূর্ণ ঝূঁকে পড়া উচিত নয়। অথচ দুঃখের বিষয়, বর্তমানকালে এ প্রবণতাই তাদের গোমরাহীর জন্য দায়ী। এ দু'টি পন্থার একটিকে বাদ দিয়ে বাকী একটি দ্বারা হিদায়াতের রাজপথের সন্ধান পাওয়া খুবই দুষ্কর। সঠিক নীতি হচ্ছে, উভয় পন্থাকে পার্থক্য করে না দিয়ে উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা। একটি দ্বারা আরেকটির কাঠামোকে আঘাত না করে একটির সাহায্যে আরেকটিকে ত্রুটিমুক্ত করা। কেবল এভাবেই অটল মযবুত ভিতের ওপর দ্বীনী বিধানের এক দুর্ভেদ্য প্রাসাদ নির্মিত হতে পারে। এভাবেই তাতে কোনো ভ্রান্তির প্রবেশ পথ বন্ধ হতে পারে। এ নীতির প্রতিই আমাদেরকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখিয়েছেন হযরত হাসান আল বসরী (র.)। তিনি বলেছেন:

"আল্লাহর কসম, তোমাদের পথ হচ্ছে, সীমা থেকে দূরে অবস্থান এবং সীমাতিক্রম এ দূ'টির মাঝখানে।"[৩৯১]

➢ কুর'আন ও সুন্নাতে রাসূলের অনুসরণ ও অনুকরণ

তৃতীয় যে জিনিসটি মুসলিমদের মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি করেছে, তা হলো শরয়ী বিধান জানার জন্যে কুর'আন ও সুন্নাতে রাসূলের অনুসরণ ও অনুকরণগত তারতম্য।

---

৩৯০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩
৩৯১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

শরয়ী বিধান অবগত হবার জন্য কুর'আন ও হাদীসের যে অনুসরণ করা হয়, তার মধ্যে মাত্রাগত পার্থক্য রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সর্বোত্তম মর্যাদা হলো, কুর'আন-সুন্নাহর আলোকে শরয়ী বিধানসমূহ সম্পর্কে এতোটা বিজ্ঞতা অর্জন করা, যাতে করে প্রশ্নকর্তাদের প্রায় সমস্ত প্রশ্নের জবাব অতি সহজেই দেয়া যায় এবং মানব জীবনে সংঘটিত সকল ঘটনাবলীর শরয়ী সমাধান অবগত হবার জন্য তার অনেক দীর্ঘ সময় ব্যয় করতে হয়, অনেক নীরবতা অবলম্বন করতে হয়। এটা হচ্ছে ইজতিহাদের মর্যাদা। আর এর যোগ্যতা অর্জন করার কয়েকটি পন্থা রয়েছে:-

➢ ক. চিন্তা-গবেষণা

কখনো এ যোগ্যতা অর্জিত হয় হাদীসের ভান্ডার নিয়ে চিন্তা-গবেষণা ও সংগ্রহ-সংকলনের কাজে আত্মনিয়োগ করা এবং শায ও গরীব হাদীসসমূহের নিরীক্ষণের মাধ্যমে। এ মত পোষণ করেছেন ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র.)। কিন্তু এ কথা মনে করা ঠিক হবে না যে, কেবল চিন্তা-গবেষণা ও যাচাই বাছাইর কাজই এ বিজ্ঞতা অর্জন করার জন্যে যথেষ্ঠ। বরঞ্চ সে সাথে এরূপ ব্যক্তিকে ভাষাতত্ব ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সুপণ্ডিত হতে হবে। প্রাচীন আলিমগণ বিরোধপূর্ণ হাদীসের মধ্যে কীভাবে সমতা বিধান করেছেন এবং তাঁদের দলিল গ্রহণ পদ্ধতি কী ছিলো, সে সম্পর্কেও অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে।[৩৯২]

➢ খ. উসূলসমূহকে পুরোপুরি আয়ত্ত করা

কখনো এ যোগ্যতা অর্জিত হয় তাখরীজের উসূলসমূহকে পুরোপুরি আয়ত্ত করার মাধ্যমে। কিন্তু এজন্য কেবল ইমাম মুজতাহিদ প্রণীত উসূলের ভিত্তিতে মাসায়েল ইস্তিম্বাত করার পন্থা অবগত হওয়াই যথেষ্ট নয়। বরঞ্চ হাদীস এবং আছারের একটা বিরাট অংশ তাঁর আয়ত্তে থাকতে হবে। যাতে করে সর্বসম্মত কোনো মতের সাথে তাঁর ইস্তিম্বাত সাংঘর্ষিক হয় কিনা তা তিনি জানতে পারেন। এটাই হচ্ছে তাখরীজকারীদের পন্থা।[৩৯৩]

➢ গ. সঠিক পন্থা অবলম্বন

দুই বলয়ে অবস্থিত উপরোক্ত দু'টি পন্থার মধ্যবর্তী ও সঠিক পন্থা হচ্ছে কুর'আন-সুন্নাহ সম্পর্কে এতোটা অবগত থাকা, যাতে করে ফিকহের উসূল ও মৌলিক মাসায়েলসমূহ এবং সেগুলোর দলিল প্রমাণ সংক্রান্ত জ্ঞান অতি সহজেই অর্জন করা যায়। তাছাড়া এরূপ ব্যক্তিকে কিছু কিছু ইজতিহাদী মাসয়ালা, সেগুলোর দলিল-আদিল্লাহ ও একটিকে আরেকটির ওপর অগ্রাধিকার দেয়ার ব্যাপারে পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। অন্যদের তাখরীজের ত্রুটি নির্দেশ এবং খাঁটি ও মেকীর মধ্যে পার্থক্য করার মতো যোগ্যতার

---

৩৯২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫
৩৯৩. *প্রাগুক্ত*

অধিকারী হতে হবে। তবে একজন মুজতাহিদ মতলককে যতোটা ব্যাপক ও সমুদ্রসম জ্ঞান, দূরদৃষ্টি ও অন্তরদৃষ্টির অধিকারী হতে হয়, তার মধ্যে সেসব শর্ত পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান না থাকলেও চলবে। এ পর্যায়ে পৌছার পর বিভিন্ন মাযহাবের ত্রুটিপূর্ণ মতসমূহের সমালোচনা করা তাঁর জন্যে বৈধ। তবে সমালোচনা করার পূর্বে তাঁকে অবশ্য সেগুলোর পক্ষে তাদের যেসব দলিল প্রমাণ আছে, সেগুলো অবহিত হতে হবে। এ পর্যায়ে পোঁছে বিভিন্ন মাযহাবের মতামতের দলিল প্রমাণ পর্যালোচনার পর তিনি যদি এ মাযহাবের কিছু এবং ঐ মাযহাবের কিছু মত গ্রহণ করেন এবং তাঁর গবেষণায় ভুল প্রমাণিত হওয়ায় সব মাযহাবেরই কিছু মতের সমালোচনা করেন এবং বর্ণনা করেন, যদিও প্রাচীনরা তা গ্রহণ করেছেন, তবে এমনটি করাও তাঁর জন্যে বৈধ।[৩৯৪]

এ কারণে দেখা যায়, যেসব আলিমরা নিজেদেরকে মুজতাহিদ মতলক বলে দাবী করতেন না, তাঁরা ফিকহী গ্রন্থাবলী রচনা করেছেন, মাসয়ালা সংকলন করেছেন, তাখরীজ করেছেন এবং পূর্ববর্তী আলিমগণের একটি মতকে আরেকটি মতের ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন, কারণ ইজতিহাদ আর তাখরীজ তো মূলত একই জিনিসের দু'টি অংশ। আর উভয়টিরই উদ্দেশ্য কোনো বিষয়ে সত্যের কাছাকাছি পৌঁছা বা সত্যিকার ধারণা লাভ করা।[৩৯৫]

এবার ওইসব লোকদের কথায় আসা যাক, যারা মাসায়েল যাচাই বাছাই করার মতো দ্বীনি জ্ঞানের অধিকারী নয়। তাদের উচিত প্রচলিত যাবতীয় বিষয়ে নিজেদের পূর্বপুরুষ ও স্থানীয় মুসলিমদের অনুসরণ করা, আর যখন কোনো নতুন বিষয় তাদের সামনে আসবে, সে বিষয়ে নিষ্ঠাবান মুফতীগণের নিকট ফতোয়া চাওয়া, আর মামলা মুকদ্দমার ক্ষেত্রে কাযীগণের ফায়সালা অনুসরণ করা। এটাই তাদের জন্যে সরল সঠিক ও উত্তম পন্থা।[৩৯৬]

➢ ইমাম আবু হানীফা (র.) এর বক্তব্য

প্রত্যেক মাযহাবের প্রাচীন ও আধুনিক মুহাক্কিক আলিমগণকে এরূপ চিন্তা-চেতনার অধিকারীই পাওয়া যায়। সকল মাযহাবের ইমামগণ তাঁদের সাথী ও ছাত্রদেরকে এ ধারণার অনুসরণেরই অসীয়ত করেছেন। 'ইয়াকুত ও জাওয়াহেরে' উল্লেখ আছে যে, ইমাম আবু হানীফা (র.) বলতেন:-

"আমার মতের পক্ষে গৃহীত দলিলসমূহ যার জানা নেই, আমার মতানুযায়ী ফতোয়া দেয়া তার উচিত নয়।"[৩৯৭] আবু হানীফা (র.) স্বয়ং কোনো ফতোয়া দেয়ার সময় বলতেন,

---

৩৯৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৫-১০৬
৩৯৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৬
৩৯৬. *প্রাগুক্ত*
৩৯৭. *প্রাগুক্ত*

"এটা নু'মান ইবন সাবিতের (অর্থাৎ আমার) মত। আমার নিজের বুঝ-জ্ঞান আনুযায়ী আমি এটাকেই উত্তম মনে করি।"[৩৯৮]

➢ ইমাম মালিক (র.) এর বক্তব্য

ইমাম মালিক (র.) বলতেন, "রাসূল (স.) ছাড়া এমন কোনো মানুষ নেই, যার পুরো বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে। তিনি ছাড়া আর সকলের বক্তব্যের কিছু অংশ গ্রহণযোগ্য এবং কিছু অংশ বর্জনীয়।"[৩৯৯]

➢ ইমাম শাফেয়ী (র.) এর বক্তব্য

মুসতাদরাকে হাকিম ও বায়হাকীতে বর্ণিত হয়েছে, শাফেয়ী (র.) বলতেন, "কোনো বিষয়ে সহীহ-বিশুদ্ধ হাদীস পাওয়া গেলে সে বিষয়ে সেটাই আমার মত।" অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে, শাফেয়ী (র.) বলেছেন, "তোমরা যখন আমার কোনো মতকে হাদীসের সাথে বিরোধপূর্ণ দেখতে পাবে, তখন তোমরা হাদীসের ভিত্তিতে আমল করবে এবং আমার মতকে দেয়ালের ওপাশে নিক্ষেপ করবে।"[৪০০]

শাফেয়ী (র.) একদিন ইমাম মুযনীকে লক্ষ্য করে বলেন, "হে আবু ইব্রাহীম! আমার প্রতিটি কথার অন্ধ অনুকরণ (তাকলীদ) করো না। বরং সে বিষয়ে নিজেও চিন্তা গবেষণা করা উচিত। কারণ, এটা যা-তা ব্যাপার নয়, দ্বীনের ব্যাপার।"[৪০১] তিনি আরও বলতেন, "রাসূলুল্লাহ (স.) ছাড়া আর কারো কথার মধ্যে কোনো হুজ্জত নেই, তাদের সংখ্যা যদি বিরাটও হয়।"[৪০২]

➢ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) এর বক্তব্য

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র.) বলতেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথার সাথে বিরোধপূর্ণ হলে কোনো ব্যক্তির কথাই গ্রহণযোগ্য নয়।"[৪০৩] তিনি এক ব্যক্তিকে বলেছিলেন:

"আমার তাকলীদ করো না। মালিক, আওযায়ী, ইব্রাহীম নখয়ী প্রমূখ কারোই তাকলীদ করো না। তারা যেমন কিতাব ও সুন্নাহ থেকে মাসয়ালা গ্রহণ করেছেন, তোমরাও অনুরূপভাবে কুর'আন ও সুন্নাহ থেকেই মাসয়ালা গ্রহণ করো। সকল ইমামের মাযহাব ও

---

৩৯৮. *প্রাগুক্ত*
৩৯৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৬-১০৭
৪০০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭
৪০১. *প্রাগুক্ত*
৪০২. *প্রাগুক্ত*
৪০৩. *প্রাগুক্ত*

মতামত সম্পর্কে অবগত হওয়া ছাড়া কারোই ফতোয়া দেয়া উচিত নয়। কারো নিকট যদি এমন কোনো মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করা হয়, যেটির বিষয়ে স্বীকৃত ইমামগণ একমত পোষণ করেছেন সেটির সে সর্বসম্মত জবাবটি বলে দেয়াতে কোনো দোষ নেই। কারণ এরূপ ক্ষেত্রে সেটা তার নিজস্ব মতামত নয়, বরং ইমাম মুজতাহিদগণের মতেরই ভাষ্য বলে গণ্য হবে। তার নিকট যদি কেউ কোনো মতবিরোধপূর্ণ মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করে, সেক্ষেত্রে এটা অমুকের মতে জায়েয আর অমুকের মতে নাজায়েয জবাব দেয়াতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে এক পক্ষের মত বলে দেয়া উচিত নয়।"[৪০৪]

➢ ইমাম আবু ইউসুফ ও যুফার (র.)

ইমাম আবু ইউসুফ ও যুফার (র.) প্রমুখ বলেছেন, "এমন কোনো ব্যক্তির আমাদের মত অনুযায়ী ফতোয়া দেয়া উচিত নয়, যিনি আমাদের মতের ভিত্তি সম্পর্কে অবগত নন।"[৪০৫] ইমাম আবু ইউসুফ (র.) কে বলা হয়, 'আবু হানীফার সাথে আপনার ব্যাপক মতপার্থক্য লক্ষ্য করছি।' তিনি তাকে জবাবে বলেন "এর কারণ, আবু হানীফাকে যতোটা বুঝ জ্ঞান দেয়া হয়েছে, ততোটা আমাদেরকে দেয়া হয়নি। তিনি তাঁর বুঝ জ্ঞানের মাধ্যমে যা অনুধাবন করেছেন, তার সবটা বুঝা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আর তাঁর যে বক্তব্য আমরা উপলব্ধি করতে পারি না, তা দিয়ে ফতোয়া দেয়া আমাদের জন্যে বৈধ হতে পারে না।"[৪০৬]

➢ ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান (র.)

ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান (র.) কে জিজ্ঞাসা করা হয়, "কখন একজন লোক ফতোয়া দেয়ার বৈধতা অর্জন করে?" জবাবে তিনি বলেন, "ইজতিহাদের যোগ্যতা অর্জন করলে।" জিজ্ঞাসা করা হয়, 'কীভাবে ইজতিহাদের যোগ্যতা অর্জন হয়?' জবাবে তিনি বলেন, "যখন কোনো ব্যক্তি কিতাব ও সুন্নাহর ভিত্তিতে মাসায়েলের সকল দিকের ওপর নযর দিতে পারেন এবং তার মতের বিরোধিতা করা হলে যুক্তিসঙ্গত জবাব দিতে পারেন, তখন তিনি ইজতিহাদের যোগ্যতা অর্জন করেন।"[৪০৭]

কেউ কেউ বলেছেন, "ইজতিহাদের নুন্যতম শর্ত হলো 'মাবসূত' গ্রন্থ মুখস্থ থাকা" ইবনুস সিলাহ বলেছেন, "শাফেয়ী মাযহাবের কোনো ব্যক্তির নযরে যদি এমন কোনো হাদীস পড়ে, যেটি শাফেয়ীর মতের সাথে সাংঘর্ষিক, এরূপ ক্ষেত্রে তিনি যদি ইজতিহাদে মতলকের অধিকারী হন কিংবা সে বিষয় বা মাসয়ালাটি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হন, তবে বিষয়টি সম্পর্কে গবেষণা করার পর হাদীসটি বিশুদ্ধ প্রমাণিত হলে, সেক্ষেত্রে

৪০৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭-১০৮
৪০৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ.-১০৮
৪০৬. *প্রাগুক্ত*
৪০৭. *প্রাগুক্ত*

হাদীসটির ওপর আমল করা এবং তাকলীদ পরিহার করা তাঁর জন্য জরুরী। আর তিনি যদি এরূপ যোগ্যতার অধিকারী না হন আর দেখেন যে, অপর কোনো ইমামের মত হাদীসটির অনুরূপ। সে ক্ষেত্রেও হাদীসটির ওপরই আমল করা তাঁর জন্য জরুরী। কারণ, এতে করে তাঁর কোনো না কোনো ইমামের তাকলীদ করা হয়ে যাচ্ছে।" ইমাম নববীও এ মতই পোষণ করেন।[৪০৮]

➢ ফকীহদের পারস্পরিক মতপার্থক্যের সমাধান

চতুর্থ সমস্যাটি সৃষ্টি হয়েছে ফকীহদের পারস্পরিক মতপার্থক্যকে কেন্দ্র করে। অথচ ফকীহদের মধ্যে তো মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেসব বিষয়ে, যেসব বিষয়ে স্বয়ং সাহাবায়ে কিরামের (রা.) নিকট থেকেই পার্থক্যপূর্ণ মত (ইখতেলাফ) পাওয়া গেছে। যেমন, তাশরীক ও দুই ঈদের তাকবীর, মুহরেমের (যিনি ইহরাম বেঁধেছেন) বিয়ে, ইবন আব্বাস ও ইবন মাসউদের (রা.) তাশাহুদ, বিসমিল্লাহ এবং আমীন সশব্দে কিংবা নিঃশব্দে পড়া প্রভৃতি বিষয়ে। এসব ক্ষেত্রে তাঁরা একটি মতকে আরেকটি মতের ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন মাত্র।[৪০৯]

অতীত আলিমগণের মতপার্থক্য মূল শরীয়তের ব্যাপারে ছিলো না। মতপার্থক্য হয়েছে আনুসঙ্গিক বিষয়াদিতে। আর সেসব মতপর্থক্যও ছিলো নেহাতই সাধারণ ধরনের। মতপার্থক্য ছিলো দু'টি বিষয়ের মধ্যে কোনটি উত্তম, তাই নিয়ে। কেউ মনে করেছেন এটি উত্তম, আবার কেউ মনে করেছেন ওটি উত্তম। যেমন, কারীগণের কিরা'আতের পার্থক্য। বিভিন্ন কারী বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে তিলাওয়াত করেন। একই শব্দ বা আয়াত এর তিলাওয়াতের ক্ষেত্রেও তাদের মধ্যে বেশ পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়। ফকীহদের মতপার্থক্যের ধরনও অনুরূপ। ফকীহগণ তাঁদের মতপার্থক্যের কারণ হিসেবে বলেছেন, এ মতও সাহাবীদের থেকে পাওয়া গেছে, ঐ মতও সাহাবীগণের (রা.) নিকট থেকে পাওয়া। অর্থাৎ তাদের মধ্যেও পারস্পরিক মতপার্থক্য ছিলো এবং তা সত্ত্বেও তাঁরা সকলেই হিদায়াতের ওপর ছিলেন। এ কারণে হকপন্থী আলিমগণ ইজতিহাদী মাসায়েলের ক্ষেত্রে সকল মুজতাহিদের ফতোয়াকেই জায়েয মনে করেন, সকল কাযীর ফায়সালাকেই স্বীকার করেন এবং অনেক সময় নিজ মাযহাবের বিপরীত মতের ওপরও আমল করেন। এ কারণেই দেখা যায়, তারা মাসয়ালার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং ইখতেলাফী দিকসমূহ আলোচনার পর বলে দিতেন, 'আমার মতে এটাই উত্তম', 'আমার মতে এটা গ্রহণ করা ভালো'। আবার কখনো বলতেন, 'আমি কেবল এতোটুকুই জানতে পেরেছি।' 'আল মাবসূত' আছারে মুহাম্মাদ এবং শাফেয়ী (র.) এর বক্তব্যের মধ্যেও এ কথাগুলোরই স্বাক্ষ্য পাওয়া যায়।[৪১০]

---

৪০৮. *প্রাগুক্ত*
৪০৯. *প্রাগুক্ত*
৪১০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. -১০৯

অতঃপর দ্বীনের সে মহান খাদিমগণের কাল অতিক্রান্ত হয়। তাদের পরে এমনসব লোকের আগমন ঘটে, যারা সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হবার কারণে হিংসা বিদ্বেষ ও বিবাদের ঝড় বইয়ে দেন। মতপার্থক্যপূর্ণ বিষয়গুলোর কোনো একটিকে আঁকড়ে ধরে এ মতের অধিকারীদের এক পক্ষ আর ঐমতের অধিকারীদের আরেক পক্ষ হিসেবে ভাবতে থাকেন। এভাবেই শুরু হয় ফিরকা-পুরস্তী। এতে করে মানুষের মধ্য থেকে বিলুপ্ত হয়ে পড়ে তাহকীক ও চিন্তা গবেষণার জযবা। তারা নিজ নিজ ইমামের মাযহাবকে আকড়ে ধরে অন্ধভাবে।[৪১১]

অথচ এসব মতপার্থক্যপূর্ণ বিষয়ে সাহাবী, তাবেয়ী ও তাদের পরবর্তী মহান আলিমগণের অবস্থা! তাঁরা (সালাতে) কেউ বিসমিল্লাহ পড়তেন, আবার কেউ পড়তেন না। কেউ তা সশব্দে পড়তেন, আবার কেউ নিঃশব্দে পড়তেন। কেউ ফজরে দোয়ায়ে কুনূত পড়তেন, আবার কেউ তা পড়তেন না। কেউ নকসীর[৪১২], বমি ও ক্ষৌরকার্য করার পর অযু করতেন, আবার কেউ করতেন না। কেউ কামনার সাথে স্বীয় লিঙ্গ এবং স্ত্রীকে স্পর্শ করলে অযু করতেন, আবার কেউ করতেন না। কেউ রান্না করা খাদ্য খেলে অযু করতেন আবার কেউ করতেন না। তাদের কেউ উটের গোশত খেলে অযু করতেন আবার কেউ করতেন না। এতদসত্ত্বেও তাঁদের একজন অপরজনের পিছনে সালাত পড়তেন। যেমন, ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর সাথীরা এবং শাফেয়ী প্রমুখ মদীনার ইমামদের পিছনে সালাত পড়তেন। অথচ তাঁরা ছিলেন মালিকী ও অন্যান্য মতের লোক এবং তাঁরা সশব্দে কিংবা নিঃশব্দে বিসমিল্লাহও পড়তেন না। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) খলীফা হারুনুর রশীদের পিছে সালাত পড়েছেন। অথচ হারুনুর রশীদ ক্ষৌরকার্য করার পর নতুন করে অযু করতেন না। কারণ ইমাম মালিক (র.) ফতোয়া দিয়েছেন যে, ক্ষৌরকার্য করার পর অযু করার প্রয়োজন নেই। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র.) ক্ষৌরকার্য এবং নকসীর এর জন্যে অযু করার কথা বলেছেন।[৪১৩]

কিন্তু যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, "যদি ইমামের শরীর থেকে রক্ত বের হয় আর তিনি অযু না করেন, তবে কি আপনি তার পিছে সালাত পড়বেন?" জবাবে তিনি বললেন 'কেমন করে আমি মালিক ও সায়ীদ ইবন মুসাইয়্যেবের পিছে সালাত না পড়ে থাকতে পারি?'[৪১৪]

'আল বাযাযিয়া' গ্রন্থে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, একবার তিনি হাম্মাম থেকে গোসল করে এসে জুমুআর সালাত পড়ান। সালাত শেষে লোকেরা চলে যাবার পর তাঁকে জানানো হয়, তিনি যে কুয়োর পানি দিয়ে গোসল করেছিলেন, তাতে মরা ইঁদুর পাওয়া গেছে। খবরটি শুনে তিনি বললেন, "ঠিক আছে, এ বিষয়ে এখন আমরা আমাদের মদীনার ভাইদের (মালিকী মাযহাবে) মতের অনুসরণ করলাম যে, দুই

---

৪১১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯-১১০

৪১২. গরমের প্রকোপে নাক দিয়ে যে রক্ত বের হয়, তাকে নকসীর বলে।

৪১৩. *মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১০

৪১৪. *প্রাগুক্ত*

কুল্লা পরিমাণ পানি থাকলে তা অপবিত্র হয় না। কারণ, এ পরিমাণ পানির বিধান 'অধিক পানির' বিধানের মতো।"[৪১৫]

ইমাম খানজাদীকে শাফেয়ী মাযহাবের এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, যে ব্যক্তি এক বা দুই বছরের সালাত ছেড়ে দিয়েছিল, অতঃপর ইমাম আবু হানীফার মাযহাব গ্রহণ করে। এখন সে কোন মাযহাবের রীতিতে সালাতগুলো কাযা করবে? শাফেয়ী মাযহাবের রীতিতে নাকি হানাফী মাযহাবের রীতিতে? জবাবে ইমাম খানজাদী বলেন "সে বৈধ মনে করে, এমন যে কোনো মাযহাবের রীতিতে পড়লেই সালাত আদায় হয়ে যাবে।"[৪১৬]

➢ ঐক্যের স্বার্থে সংবাদ যাছাই করা

যে কোন সংবাদ পেলেই বিশ্বাস করা যাবে না। কারণ এতে দ্বন্দ ও সংঘাতের সৃষ্টি হয়। একে অপরের প্রতি অপবাদ আরোপ করার কারণে বহু মারামারি দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়। এক দল আরেক দলের প্রতি, একদেশ আরেক দেশের প্রতি বিরোপ প্রতিক্রিয়া দেখায়। এমনকি কখনো কখনো যুদ্ধও লেগে যায়। অতীতে এমন অসংখ্য রেকর্ড রয়েছে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

"হে ঈমানদারগণ যদি কোন ফাসিক তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তার সত্যতা যাছাই করে নাও, তা না হলে তোমরা অজ্ঞতাবশতঃ কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে বসবে, অতঃপর তোমরা যা করেছ সে জন্য তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হবে।"[৪১৭]

আল্লাহু আকবার! আলোচ্য আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তা'আলা কোন মুসলিম ব্যক্তিও যদি কোন কাফিরের বিষয়ে মুসলিম কর্তৃপক্ষকে কোন তথ্য দেয় তাহলে তা যাছাই করে নিতে আদেশ করেছেন। সেখানে মুসলিমদের বিষয়ে যদি হয় তাহলে আরো কতটা সতর্কতার সাথে যাছাই করা দরকার! অথচ আজকে সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও দেশের বিষয়ে এমন অনেক ভুল তথ্য প্রচলিত রয়েছে যে তথ্যগুলো অমুসলিমরা দিয়েছে এবং যে তথ্যের ওপর ভিত্তি করে অসংখ্য মুসলিম ব্যক্তিকে মেরে ফেলা হয়েছে। অসংখ্য দেশকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। যেমন, 'ওসামা বিন লাদেন আমেরিকার টুইন টাওয়ারে হামলা করেছেন' এ তথ্য ফাসিক, অমুসলিমরাই প্রচার করেছে। আর এ তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই আমেরিকা তাঁকেসহ লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ আফগান মুসলিম নর-নারী ও

---

৪১৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১
৪১৬. *প্রাগুক্ত*
৪১৭. আল কুরআন, ৪৯:০৬

শিশুকে হত্যা করেছে। এমনকি একটি স্বাধীন সার্বভৌম ঐতিহ্যবাহী মুসলিম দেশ আফগানিস্তানকে ধ্বংস করে দিয়েছে। ভুয়া তথ্যের ভিত্তিতেই মুসলিম জাহানের চতুর্থ খলীফা যিন নূরাইন হযরত উসমান (রা.)-কে শহীদ করা হয়েছে। মুসলিম বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয় কলঙ্কজনক যুদ্ধ উষ্ট্রের যুদ্ধও ভুয়া তথ্যের কারণেই সংগঠিত হয়েছিল। ইরাকে জীবানু অস্ত্র আছে ভুয়া খবর দিয়ে সভ্যতার নগরী ইরাক, বাগদাদ, কুফাসহ বহু মুসলিম দেশ ও নগরীকে ইসলামের শত্রুরা মৃত্যুপুরীতে পরিণত করেছে। আমাদের দেশেও এমন বহু ঘটনা পাওয়া যায় যেগুলো ভুয়া। যেমন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে আগরতলা মামলার আসামী করা হয়েছিল।

➢ দুই গ্রুপ ঝগড়ায় লিপ্ত হলে করণীয়

প্রায়শই দেখা যায় এক মুসলিম ব্যক্তি আরেক মুসলিম ব্যক্তির ওপর, একগোষ্ঠী আরেক গোষ্ঠীর ওপর, এক দল আরেক দলের ওপর, এক সম্প্রদায় আরেক সম্প্রদায়ের ওপর, এক দেশ আরেক দেশের ওপর অন্যায়, যুল্ম করে, ঝগড়ায় লিপ্ত হয়, যুদ্ধ বিগ্রহে জড়িয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয়ভাবে একটা টীম বা অর্গানাইজেশন থাকা দরকার যে টীমের করণীয় হবে এ জাতীয় ঝগড়া-বিবাদ কুর'আন-সুন্নাহ বর্ণিত পন্থায় নিরসন করে দেয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"যদি মু'মিনদের দুইদল যুদ্ধে লিপ্ত হয় তবে তোমরা তাদের মাঝে মীমাংসা করে দাও; অতঃপর যদি তাদের একদল অন্য দলের ওপর বাড়াবাড়ি করে তাহলে যে দল বাড়াবাড়ি করবে তোমরা তার বিরুদ্ধে লড়বে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে তাহলে তোমরা উভয়ের মধ্যে ন্যায়ের সাথে মীমাংসা করে দিবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চই আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালবাসেন।"[৪১৮]

➢ মুসলিম পরস্পর ভাই ভাই

বর্তমানে মুসলিমদের একমাত্র মযবুত অস্ত্র, ঢাল ও দূর্গ হচ্ছে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব।[৪১৯] মুসলিম পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক, দেশীয় এবং অন্তজার্তিক সকল ক্ষেত্রে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অটুট রেখে যাবতীয় কাজ করে

৪১৮. আল কুরআন, ৪৯:০৯

৪১৯. বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী, *আল মাকতুবাত*, মুসলিম ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব অধ্যায় (লিবার্টি প্রকাশনী, উত্তরা, ঢাকা, মে ২০১৩), পৃ. ৫৮

যেতে হবে। এ বন্ধন যেন কখনো ছিঁড়ে না যায় এজন্য এক ভাই যেমন অন্য ভাইয়ের বিষয়ে সতর্ক থাকে, গোটা মুসলিম উম্মাহর প্রতিজন সদস্য পরস্পরের বিষয়ে তেমনিভাবে সতর্ক থাকা উচিৎ।

কোন অমুসলিম, কোন ফাসিক যেন কোন মুসলিমের গায়ে হাত তুলতে না পারে, কোন মুসলিম দেশের ওপর যেন কোন অমুসলিম দেশ কোন ধরনের চক্রান্ত ষড়যন্ত্র না করতে পারে, কোন ধরনের আগ্রাসনের দুঃসাহস কখনো দেখাতে না পারে এক্ষেত্রে সকলকেই সচেতন হতে হবে এবং সতর্ক থাকতে হবে।

➢ ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে অটুট রাখতে করণীয়

ভ্রাতৃত্বের এ বন্ধনকে সুদৃঢ় করার জন্য কয়েকটি করণীয় নিম্নে উল্লেখ করা হলো:-

➢ ক) সালামের প্রচলন

ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধির জন্য এবং শত্রুতা ও বিদ্বেষ থেকে মুক্তি লাভের জন্য রাসূল (স.) পারস্পরিক সালামের প্রসার ঘটাতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর সত্যিকারার্থেই পরস্পর পরস্পরকে নিয়মিত সালাম দিলে নিজেদের মাঝে একটা আন্তরিকতা ও ভালবাসা তৈরী হয়। সাম্প্রতিক সময়ে লক্ষ্য করা যাচ্ছে সমাজে সালামের প্রচলন কমে যাচ্ছে। এটা কোন মুসলিম সমাজের জন্য কাম্য নয়। বরং একজনের সাথে আরেকজনের দেখা হলে প্রথমেই সালাম দিবে এটাই বিশ্ব নবী (স.) শিখিয়েছেন। তিনি বলেছেন:

أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ

"তোমরা মানুষকে সালাম দিবে, খানা খাওয়াবে। মানুষ যখন ঘুমে থাকে সালাত আদায় করবে। এতে নিরাপদে তোমরা জান্নাতে পবেশ করবে।"[৪২০]

বিশ্ব নবী (স.) আরো বলেছেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (স.) বলেছেন, "তোমরা ঈমান না আনা পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর পরস্পর পরস্পরকে না ভালবাসা পর্যন্ত ঈমান আনতে পারবে না। আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি বিষয়ের সংবাদ দিব যখন তোমরা তা করবে তখন পরস্পর পরস্পরকে পছন্দ করবে ভালবাসবে। তাহলো, 'তোমরা নিজেদের মাঝে সালামের প্রচলন কর'।"[৪২১]

---

৪২০. *সুনানুত তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৪০৯

৪২১. *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৮১

➢ খ) আত্মীয়তার সম্পর্ক সুদৃঢ়করণ

আত্মীয়-স্বজন আল্লাহ তা'আলার বিরাট নিয়ামত। যার আত্মীয়-স্বজন যত বেশি সে সমাজে ততবেশি সম্মানিত। এ আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক ও সদ্ব্যবহার করতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.) কঠোরভাবে আদেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"অতএব (হে মু'মিনগণ) তোমরা আত্মীয়দেরকে তাদের হক দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকেও। যারা আল্লাহর সন্তোষ কামনা করেন তাদের জন্য এটা খুবই উত্তম। তারাই ঐ সব লোক যারা সফল।"[৪২২]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"আর আল্লাহকে ভয় কর, যারা নামে তোমরা একে অপরের নিকট অধিকার চেয়ে থাক এবং আত্মীয়স্বজনের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চই আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন।"[৪২৩]

বিভিন্ন হাদীসে বিশ্বনবী (স.) এ বিষয়ে বার বার তাকীদ দিয়েছেন। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীদের বিষয়ে ভয়াবহ আযাবের বিষয়েও তিনি হুঁশিয়ারী দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে সে যেন আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে সে যেন বলতে চাইলে ভাল কিছু বলে অথবা চুপ থাকে।"[৪২৪] অপর এক হাদীসে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার সাথে বান্দার সম্পর্ক থাকা না থাকার জন্যও আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখা না রাখাকে শর্ত ও কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আম্মাজান আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (স.) বলেছেন: "আত্মীয়তার সম্পর্ক আল্লাহর আরশের সঙ্গে ঝুলে থেকে বলতে থাকে, যে আমাকে জুড়ে রাখল, আল্লাহ তাকে জুড়ে রাখুন, আর যে আমাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল আল্লাহ তাকে বিচ্ছিন্ন করুন।"[৪২৫] নবী (স.) আরো বলেছেন:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

---

৪২২. আল কুরআন, ৩০:৩৮

৪২৩. আল কুরআন, ০৪:০১

৪২৪. *সহীহ বুখারী ও মুসলিম*, প্রাগুক্ত

৪২৫. *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৬৩৫

“যে ব্যক্তি তার রিযিকের প্রশস্ততা দেখে চক্ষু শীতল করতে চায় এবং চায় তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হোক, তার উচিৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা।”[৪২৬]

নবী (স.) আরো বলেছেন:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ

“আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না।”[৪২৭]

- **গ) অন্যকে ক্ষমা করে দেয়া**

নিজেদের মাঝে ঐক্য ও সম্প্রীতি তৈরি ও ধরে রাখার জন্য দোষীকেও ক্ষমা করে দেয়া উচিৎ। আল্লাহর নবী হযরত ইউসূফ (আ.)-এর দশ ভাইকে ক্ষমা করে দেয়ার ঐতিহাসিক ঘটনা এক্ষেত্রে বিশ্ববাসির সামনে দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। মক্কা বিজয়ের দিনে বিশ্ব নবী মুহাম্মাদ (স.) কর্তৃক সকল যালিম কুরাইশ কাফিরদেরকে ক্ষমা করে দেয়ার বিস্ময়কর ঘটনা এক্ষেত্রে স্পষ্ট উদাহরণ।

- **ঘ) অন্যকে খাওয়ানো**

মহানবী (স.) এর সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবন সালাম (রা.) বলেন, নবী কারীম (স.) মদীনায় আসার পর আমি তাঁর কাছে হাযির হলাম। আমি তাঁর পবিত্র চেহারা দেখেই বুঝে ফেললাম এই চেহারা কোন মিথ্যাবাদির চেহারা নয়। এরপর তিনি আমার সামনে প্রথম কথা এটাই বলেছিলেন যে:

أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ

‘হে লোক সকল সালাম দিতে থাক, অন্যকে খাবার খাওয়াও, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা কর, রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন নামাজ পড় আর জান্নাতেও নিরাপদে প্রবেশ করবে।’[৪২৮]

- **ঙ) প্রতিবেশির সাথে সর্বোত্তম ব্যবহার**

প্রতিবেশির সাথে ভাল ব্যবহার করার জন্য আল্লাহ তা‘আলা সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

---

৪২৬. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫৫২৬
৪২৭. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫৫২৫
৪২৮. প্রাগুক্ত

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

"আর তোমরা সবাই আল্লাহর দাসত্ব কর; কোন কিছুকে তাঁর শরীক করবে না। পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাগগ্রস্থ, নিকট প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চই আল্লাহ আত্মম্বরী ও দাম্ভিককে ভালবাসেন না।"[৪২৯]

বিশ্বনবী (স.) বলেছেন:

وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ قَالُوا وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْجَارُ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا بَوَائِقُهُ قَالَ شَرُّهُ

"আল্লাহর কসম! সে মু'মিন নয়, আল্লাহর কসম সে মু'মিন নয়, আল্লাহর কসম সে মু'মিন নয়। জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহর রাসূল (স.) কে? তিনি বললেন, ঐ প্রতিবেশি যার প্রতিবেশি তার কষ্টদায়ক আচরণ থেকে নিরাপদ থাকে না।"[৪৩০]

নবী (স.) আরো বলেছেন:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

"সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যার প্রতিবেশি তার দুর্বৃত্তপনা থেকে নিরাপদ নয়।"[৪৩১]

➢ চ) মেহমানের উত্তম মেহমানদারী করা

মেহমানের উত্তম মেহমানদারী করা বিশ্ব নবী (স.) এর সুন্নাত। আল্লাহর সকল নবীর বৈশিষ্ট্যই ছিল মেহমানদের উত্তম মেহমানদারী করা। এ ক্ষেত্রে কুর'আনুল কারীমে আল্লাহর নবী হযরত ইবরাহীম (আ.) এর মেহমানগণের গল্প আল্লাহ তা'আলা নিজেই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ

"আপনার কাছে ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের খবর পৌঁছেছে কি? যখন তারা তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন সালাম, জবাবে তিনিও বলেছিলেন, সালাম, তোমরা দেখছি অচেনা মানুষ! অতঃপর ইবরাহীম তাঁর পরিবারের কাছে গেলেন এবং একটি ভুনা করা গো-বাছুর নিয়ে এলেন।"[৪৩২]

---

৪২৯. আল কুরআন, ০৪:৩৬
৪৩০. *মুসনাদু আহমাদ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৭৫৩৯
৪৩১. *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৬৬
৪৩২ আল কুরআন, ৫১:২৪-২৬

➢ ছ) অধীনস্থদের সাথে সর্বোত্তম ব্যবহার

অধীনস্থদের সাথে সর্বোত্তম ব্যবহার করতে হবে। নিজে যা খাবে অধীনস্থদের তা খেতে দিতে হবে। নিজে যা পড়বে অধীনস্থদের তা পড়তে দিবে। প্রিয় নবী (স.) মৃত্যুর সময়ও সালাত এবং অধীনস্থদের বিষয়ে নসীহত করে গেছেন।

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَال كَانَ آخِرُ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

> 'হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) এর শেষ কথা ছিল, 'আস সালাত ও তোমাদের অধীকারভুক্ত দাস-দাসী।' (এ বিষয়ে তোমরা সচেতন ও সতর্ক থেকো)।'[৪৩৩]

➢ জ) প্রতিশোধ না নেয়া

ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য এ এক কার্যকর বিরাট ঔষধ। মানুষ মাত্রই ভুল করা স্বাভাবিক। ভুল করে কেউ যদি শত্রুতা ও ক্ষতি করে থাকে, প্রতিশোধ নেয়ার মত সময় সুযোগ পেলে প্রতিশোধ না নিয়ে তাকে ক্ষমা করে দেয়া। যদি তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয় তবে সে-ই হতে পারে সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু। আল্লাহ তা'আলা কুর'আনুল কারীমে বিশাল জান্নাতের জন্য প্রতিযোগিতা করার আহবান জানিয়ে বলেছেন, তা মুত্তাকীদের প্রস্তুত আছে। আর মুত্তাকীর পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "যারা ক্রোধকে দমন করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে দেয়।" আল্লাহ তা'আলা বলেন:

> وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
>
> "আর তোমরা প্রতিযোগিতা কর স্বীয় রবের নিকট থেকে ক্ষমা এবং জান্নাতের জন্য, যার প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর সমান যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আর আল্লাহ কল্যাণকারীদের ভালবাসেন।"

হযরত ইউসুফ (আ.) এর অপরাধী দশ ভাই ও বিশ্ব নবী (স.) কে মক্কা থেকে বের করে দেয়া যালিম কুরাইশদের ক্ষমা করে দেয়ার ঘটনাই এক্ষেত্রে প্রেরণাদায়ক উদাহরণ। হযরত আলী (রা.) যুদ্ধ ময়দানে একজন কাফিরকে হত্যা করতে যেয়ে সে তার মুখে থুতু নিক্ষেপ করার কারণে তাকে ছেড়ে দিলেন। কাফির তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আমায়

---

৪৩৩ *সুনান ইবন মাযাহ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৬৮৯

ছেড়ে দিলে কেন?' তিনি বললেন, 'যুদ্ধ করছিলাম আমার আল্লাহর জন্য, কিন্তু তুমি যখন আমার মুখের ওপর থুতু নিক্ষেপ করলে সে অবস্থায় তোমাকে হত্যা করা আমার নিজের জন্য প্রতিশোধ নেয়া হয় এ আশংকায় তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি।'

➢ ঝ) ধৈর্য ধারণ করা

আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয়বন্ধু নবী (স.) ও সাহাবীগণকে সর্বোত্তমভাবে ধৈর্যধারণের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তা মৃত্যু পর্যন্ত। ঐ ধৈর্য কিছুক্ষণের জন্য বা বিশেষ বিশেষ সময়ের জন্য নয়। মুসলিমকে ধৈর্যধারণ করতে হবে মৃত্যু পর্যন্ত। আল্লাহর ধৈর্যধারণের এ নির্দেশ তাঁর পক্ষ থেকে এক প্রকারের সাহায্যদান। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ

"অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর, যেমন ধৈর্যধারণ করেছিলেন সুদৃঢ় সংকল্পের অধিকারী রাসূলগণ। আর তাদের জন্য তাড়াহুড়া করো না। তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল, সেদিন তারা তা প্রত্যক্ষ করবে, মনে হবে তারা পৃথিবীতে এক দিনের কিছু সময় অবস্থান করেছে। সুতরাং এটা এক ঘোষণা, তাই পাপাচারী কাওমকেই ধ্বংস করা হবে।"[৪৩৪]

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

"আমি তোমাদেরকে ভয়ভীতি, ক্ষুধা, ধনসম্পদ, জীবন ও ফলন হ্রাস দ্বারা পরীক্ষা করবো। তুমি ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দাও। তাদের ওপর বিপদ এলে তারা বলে, 'আমরা তো আল্লাহরই এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।"[৪৩৫]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের কষ্টদায়ক কথাবার্তার দরুণ মনোকষ্টের জন্য ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিয়ে বলেন:

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ- فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ- وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

---

৪৩৪. *আল কুর'আন*, ৪৬:৩৫
৪৩৫. *আল কুর'আন*, ০২:১৫৫-১৫৬

"আর অবশ্যই আমি জানি যে, তারা যা বলে তাতে তোমার অন্তর সঙ্কুচিত হয়। সুতরাং তুমি তোমার রবের প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ কর এবং সিজদাহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও। আর ইয়াকীন (মৃত্যু) আসা পর্যন্ত তুমি তোমার রবের ইবাদাত কর।"[৪৩৬]

চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে, সিজদারত অবস্থায় মাথা ও পিঠে উটের নাড়ি-ভুঁড়ি চাপিয়ে দিয়ে, তায়েফে পাথরের আঘাতে রক্তাক্ত করে চরম কষ্ট দেয়ার পরও বিশ্বনবী (স.) অন্যায়-অত্যাচারের পরিবর্তে একমাত্র সত্য দ্বীন, ইসলামের শাশ্বত বাণীর দিকে মানুষকে আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু সন্ত্রাসীরা হয়ে ওঠে বিদ্রোহী। তারা বাড়িয়ে দেয় মহানবী (স.) এর ওপর অত্যাচার-নির্যাতনের মাত্রা। কিন্তু সর্বশেষ প্রিয় নবী (স.) তাদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জবাব রাগ ও সন্ত্রাস দ্বারা না দিয়ে অত্যন্ত ধৈর্য ও শান্তি প্রিয়তার পরিচয় দ্বারা দিয়েছেন। হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স.) বলেছেন:

لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِيْ يُملك نفسه عند الغضبِ.

"ঐ ব্যক্তি শক্তিশালী নয়, যে অন্যকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয়। বরং (প্রকৃত) শক্তিশালী সে-ই যে রাগের সময় নিজকে সংবরণ করতে পারে।"[৪৩৭]

আল কুর'আন সর্বাত্মকভাবে পরম ধৈর্যের শিক্ষা দিয়েছে, আচারে-ব্যবহারে, কথাবার্তা ও বাকশৈলীতে নম্রতা, ভদ্রতা ও বিনয়ই আল কুর'আনের শিক্ষা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

"তুমি সংযতভাবে চলাফেরা কর এবং তোমার কণ্ঠস্বর নীচু কর; নিশ্চই স্বরের মধ্যে গর্দভের স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।"[৪৩৮] আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল (স.) এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

"নিশ্চই তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন, তা তাঁর জন্য কষ্টদায়ক যা তোমাদেরকে পীড়া দেয়। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী, মু'মিনদের প্রতি স্নেহশীল, পরম দয়ালু।"[৪৩৯]

---

৪৩৬. আল কুর'আন, ১৫:৯৭-৯৯

৪৩৭. *সহীহ বুখারী*, বাবু আল হাজরু মিনাল গাদাবি, প্রাগুক্ত, হাদিস নং. ৫৬৪৯

৪৩৮. আল কুর'আন, ৩১:১৯

➢ কোমল হৃদয়ের অধিকারী হওয়া

রাসূল (স.) ছিলেন কোমল হৃদয়ের অধিকারী। রাসূল (স.) এর সঙ্গে সাহাবীদের সম্পর্ক বর্ণনা করে রাসূলকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের কারণেই তুমি তাদের জন্য নম্র হয়েছিলে। আর যদি তুমি কঠোর স্বভাবের, কঠিন হৃদয়সম্পন্ন হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরার্মশ কর। অতঃপর যখন সংকল্প করবে তখন আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করবে। নিশ্চই আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদেরকে ভালবাসেন।"[৪৪০]

➢ কাফিরদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করা

বর্তমান পৃথিবীর সমগ্র কুফরি শক্তি মুসলিমদের সমূলে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে চক্রান্ত ষড়যন্ত্র করছে এবং যুদ্ধও করছে। এতে তারা মুসলিমদের কী পরিমাণ ক্ষতি করছে তা ভাষায় প্রকাশ করে শেষ করা যাবে না। মুসলিমদের অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে তারা এ অন্যায় যুদ্ধ ইচ্ছাকৃতভাবে মুসলিম উম্মাহর ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। কোন মুসলিম দেশ কোন কাফির রাষ্ট্রের উপর হামলা করেছে এমন কোন নজীর বর্তমান পৃথিবীর কেউ দেখাতে পারবে না। কোন মুসলিমও কোন কাফির ব্যক্তির ওপর অন্যায়ভাবে আক্রমণ করেছে এমন নযীরও সচরাচর চোখে পড়ে না। কিন্তু আমরা দেখতে পাই ২০০১ সালে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে বর্তমান পরাশক্তি দাবিদার আমেরিকা কোন নীতি নৈতিকতার তোয়াক্কা না করে আফগানিস্তানে হামলা করে বসল। সেখানে আজ পর্যন্ত তাদের অনৈতিক তাণ্ডব চলছে। যে তথ্যের ভিত্তিতে হামলা করার অনৈতিক অযুহাত দেখালো অবশেষে সেটাও যে ভুয়া এটা আবার তারাই স্বীকার করল। কিন্তু মাঝখানে শান্তিপূর্ণ একটা মুসলিম দেশ আফগানের যে কত পরিমাণ ক্ষতি করল তার কি কোন হিসাব আছে? তার কোন ক্ষতিপূরণ কি আমেরিকা দিতে পারবে? একই অবস্থা করেছে ইরাকে, লিবিয়ায়, সিরিয়ায়। এজন্যই যেন আল্লাহ তা'আলা বহু

৪৩৯. আল কুর'আন, ০৯:১২৮
৪৪০. আল কুর'আন, ০৩:১৫৯

আগেই বলে রেখেছেন কুফরি শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করার জন্য। এমনকি তিনি তাদেরকেই পছন্দ করেন যারা কুফরি শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করে। পবিত্র কুর'আনে তিনি বলেন:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ

"নিশ্চই আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন যারা সারিবদ্ধভাবে (ঐক্যবদ্ধভাবে) তাঁর পথে লড়াই করে, যেন তারা সীসাঢালা প্রাচীর।"[৪৪১]

- **প্রতিরোধ যুদ্ধের সূচনা**

বর্তমান মুসলিমগণ দীর্ঘদিন ঐক্যবদ্ধভাবে এক নেতার নেতৃত্বে কোন লড়াই ও সংগ্রামের সুযোগ পাচ্ছেন না। যদি মুসলিমদের হাতে কাফির ও মুশরিক কিংবা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এজেন্ডা থাকতো তবে নিঃসন্দেহে সবাই তাতে ঐক্যবদ্ধভাবে সে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করতো। এতে ছোট খাট বিষয় নিয়ে নিজেদের মাঝে যে দ্বন্দ ও অনৈক্য তা দূর হয়ে যেত। সুতরাং সময় হয়েছে বিশ্ব মুসলিমদের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক যুলমের মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ যুদ্ধের শুভ সূচনা করা। এতে দু'টো উপকার; **এক.** নিজেদের হারানো অধিকার ফিরে পাওয়া যাবে, **দুই.** ছোট-খাট মতপার্থক্য ভুলে সব এক হয়ে যাবে। অতীতে এমন অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। যেমন, আরব ইসরাঈল যুদ্ধের সময় সব মুসলিম দেশগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

- **গণীমত লাভের প্রেরণা**

আজকে মুসলিম দেশগুলোতে প্রচুর পরিমাণ সম্পদ থাকার পরও কোটি কোটি বেকার যুবক রয়েছে যাদের কোন কর্মসংস্থান নেই, কোন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করে দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। যার কারণে লক্ষ লক্ষ মুসলিম যুবক সামান্য রুটি-রোজগারের আশায় বিবিধ কিংবা অবৈধভাবে ভুমধ্য সাগরসহ বিভিন্ন সাগর নদ-নদী ও সীমান্ত পারি দিতে গিয়ে নির্মম মৃত্যুর শিকার হচ্ছে, শিকার হচ্ছে সলীল সমাধির। মুসলিম যুবকদের যদি যোগ্য করে গড়ে তুলে অমুসলিম ও যালিমদের অন্যায় আগ্রাসন রুখে দাঁড়ানোর সুযোগ দেয়া হত তাহলে তারা সুনাম, সুখ্যাতি ও কৃতিত্বের সাথে তাদের রুখে দাঁড়াতে পারত। তারা ভিন দেশে পাড়ি জমিয়ে অপদস্ত, অপমানিত ও জীবন মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়া লাগতো না। আর সবচেয়ে বড় বিষয় ছিল মুসলিম দেশগুলোর কোন সম্পদ কোন কাফির মুশরিক কিংবা কোন পরাশক্তি ছিনিয়ে নিতে পারতো না। অতীত ইতিহাসের নিরীখে বলা যায় মুসলিমরা যদি ঐক্যবদ্ধ থাকতো তাহলে অমুসলিমদের সকল অন্যায় আগ্রাসন যুল্ম নির্যাতন রুখে দিতে পারতো। ওদের পক্ষ থেকে চাপিয়ে দেয়া প্রতিটি যুদ্ধে মুসলিমরা বিজয়ী হতো। প্রতিটি যুদ্ধে প্রচুর পরিমাণ গণীমত লাভ হতো। মুসলিমগণ এখনো যদি

---

৪৪১. আল কুর'আন, ৬১:০৪

ঐক্যবদ্ধ হতে পারেন তবে তা এখনো সম্ভব। কারণ ঐক্যই শক্তি, ঐক্যই বল। গণীমাত লাভের বিষয়ে একটি হাদীস উল্লেখ করা যায়:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً وَأَنَا فِيهِمْ قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوا إِبِلًا كَثِيرَةً فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمْ اثْنَا عَشَرَ بَعِيرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا

"হযরত ইবন ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) নাজদ অভিমূখে একটি ক্ষুদ্র যোদ্ধা দল প্রেরণ করলেন। আমিও সে দলের মধ্যে ছিলাম। তারা গণীমতের প্রচুর উট লাভ করেছিলেন। তাদের প্রত্যেকের ভাগে ১২টি করে উট পড়েছিল। এরপরও তাদেরকে আরো একটি করে বাড়িয়ে দেয়া হল।" এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, গাযীকে গণীমতের মাল থেকে নির্ধারিত অংশ ছাড়াও আরো মাল সম্পদ দেয়া হতো এবং তা দেয়া যায়।[৪৪২]

প্রেরণাদায়ক এ জাতীয় ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো আজকের মুসলিম যুব সমাজকে বেশি বেশি স্মরণ করিয়ে দেয়া দরকার। আশা করছি এতে তাদের চেতনা ফিরে আসবে। তারা বিভক্ত এ জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে তৎপর হয়ে ওঠবে।

- **কুর'আনের শিক্ষা**

কুর'আন ও কুর'আনের জ্ঞান অনুধাবন এক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার। ব্যক্তি যখন কুর'আন শিখবেন, কুর'আন বুঝবেন তখন তিনিই ভালো করে উপলব্ধি করতে পারবেন যে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা কী বলেছেন? তখন তার করণীয় কী? তা তিনি সহজে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। আল্লাহ তা'আলা কুর'আনুল কারীমের সূরা হুজরাতে বলেছেন:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"নিশ্চই মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা তোমাদের ভাইদের মাঝে মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আশা করা যায় তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হবে।"[৪৪৩]

- **পারিবারিক শিক্ষা**

পারিবারিকভাবেও ঐক্যের শিক্ষা দিতে হবে। কীভাবে মিলে মিশে থাকা যায় এ শিক্ষা যদি পরিবারের পক্ষ থেকে পেয়ে শিশু বড় হাতে পারে এ শিক্ষা তাকে সারা জীবন ঐক্যের চিন্তা লালনকারী হিসেবে পরিগণিত করতে পারে। ছোট বেলায় শিখানো সে গল্পটি সকল শিশুকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে, এক বৃদ্ধ বাবা মৃত্যুর পূর্বে তাঁর দশ

৪৪২. হাফেজ ইবনু হাজার আসকালানী (র.), *বুলূগুল মারাম* (সৌদি আরব, রিয়াদ, মাকতাবাতুস সালাম, প্রকাশকাল-২০০৭) ২য় খন্ড, পৃ. ১৩৩২

৪৪৩. *প্রাগুক্ত*

ছেলেকে ডেকে বললেন, 'তোমরা প্রত্যেকে একটা করে লাঠি নিয়ে এসো।' সকলে একটা করে লাঠি নিয়ে এলে তিনি সবগুলোকে একত্রে আটি বেঁধে সব চেয়ে শক্তিশালী ছেলেকে বললেন, 'এটা ভাঙ্গ'। ছেলে বহু চেষ্টা করেও পারল না, অন্যদেরকেও দিলেন কেউই পারল না। এবার তিনি আটি খুলে প্রত্যেককে একটি করে দিয়ে বললেন, 'এবার ভাঙ্গ', এবার সবাই যার যার লাঠি সহজেই ভাঙ্গতে সক্ষম হলেন। জ্ঞানী বৃদ্ধ বাবা এবার তাঁর সন্তানদের নসীহত করলেন, 'তোমরা সব সময় ঐক্যবদ্ধ থাকবে তাহলে কেউ তোমাদের টলাতে পারবে না, তোমাদের কেউ কখনো হারাতেও পারবে না।' এ জাতীয় শিক্ষা পারিবারিকভাবে প্রতিটি সন্তানকে দিতে হবে।

- **মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষা**

মসজিদে যদি ঐক্যের বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে মসজিদের ইমাম সাহেব নিয়মিত মুসুল্লিদের তা'লীম তারবিয়াহ প্রদান করেন সময়ের ব্যবধানে এর সুফল গোটা সমাজ, দেশ ও বিশ্ববাসী লাভ করবে।

- **জুমুআর খুৎবায় ঐক্যের আলোচনা**

ঐক্যের ভিত রচনা করতে পারে জুমুআর খুৎবাহ। ইমাম এবং খতীব যদি জুমুআর খুৎবার মূল টার্গেট রাখেন মুসল্লিদের ঐক্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা তাহলে গোটা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা অসম্ভব নয় বরং অল্প দিনের মধ্যেই ঐক্যের সুবাতাস বইবে। গোটা জাতি ঐক্যবদ্ধ হবে।

- **টিভি মিডিয়ায় ঐক্য সংক্রান্ত প্রচারণা**

টিভি মিডিয়ায় ঐক্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করে সরকার যদি চান যে, আমার জাতিকে ঐকবদ্ধ করবো তাহলে তা অনেক সহজ। টিভি মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার প্রচারণা চালাতে পারলে সর্ব মহলে এটার গুরুত্ব ছড়িয়ে পড়বে। জাতি আস্তে আস্তে ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত হবে।

- **বিশ্ব শান্তির জন্য ঐক্য**

বিশ্ব যতদিন মুসলিম নেতৃত্বের অধীনে ছিল ততদিন বিশ্বে শান্তি বিরাজমান ছিল। কিন্তু যখন থেকে মুসলিমগণকে বিশ্ব নেতৃত্ব থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হল তখন থেকেই বৈশ্বিক অশান্তি শুরু হল। আজকে গোটা দুনিয়াব্যাপী যে অশান্তির দাবানল তা মূলত মুসলিমদের পতনের কারণে। মুসলিমদের হাতে নেতৃত্ব থাকলে পৃথিবীর ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা হয়। আর মুসলিম নেতৃত্বের জন্য মুসলিম ঐক্যের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনেক বেশি। মুসলিমগণ

ঐক্যবদ্ধ হলে আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবেন বলে আল কুর'আনে ঘোষণা করেছেন।

➢ খিলাফত ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা

ইসলামী খিলাফত মুসলিম উম্মার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অনেক বেশি প্রয়োজন। হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য সর্বোপরি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি খিলাফত টিকে থাকে নিভু নিভু হলেও অবশ্যই এমন সময় আসবে যখন খিলাফত স্বীয় মহিমায় জাগ্রত হবে।

মুসলিমগণ, মুসলিম জনপদ ও দেশগুলো একে একে খিলাফতের পতাকা তলে একত্রিত হবে। পক্ষান্তরে খিলাফত না থাকলে মুসলিমদের একত্রিত হওয়া খুবই কঠিন ও অতি দুরহ ব্যাপার। খিলাফত টিকে না থাকা বড় বিপদ! খলিফা না থাকা মহা বিপদ! আজকে মুসলিম উম্মাহ যেটা হারে হারে উপলব্ধি করছে।[৪৪৪]

➢ কোন মুসলিমকে ঘৃণা না করা

ছোটখাট কোন দোষের কারণে কোন মু'মিন কিংবা কোন মুসলিমকে ঘৃণা করা উচিৎ নয়। বাস্তবতার দৃষ্টিকোন থেকে বিবেচনা করলে বোঝা যায় মু'মিনদের পরস্পরের মাঝে হিংসা বিদ্বেষ ঘৃণা ও শত্রুতা পোষণ করা অনেক বড় অপরাধ।[৪৪৫] মু'মিনদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করে সংশোধনের জন্য চেষ্টা করা ও আল্লাহর কাছে তার হিদায়াতের জন্য দু'আ করা অন্য মুসলিমের কর্তব্য।

➢ পারস্পরিক সাক্ষাত

একটা সমাজ এবং দেশের লোকগুলোকে একতাবদ্ধ রাখার জন্য একে অপরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও সাক্ষাৎ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষত কেউ কারো সাক্ষাত পেলে অনেক হৃদ্যতাপূর্ণ কথা বলা যায়। একের প্রতি আরেকজনের দরদ ও আন্তরকিতা বেড়ে যায়। এতে তাদের মাঝে কোন দুরত্ব তৈরী হলেও তা দূর হয়ে যায়। সে স্থানে একের প্রতি আরেকজনের জন্য শ্রদ্ধাবোধ ও ভালবাসা তৈরী হয়। হিংসা-বিদ্বেষ দূরীভূত হয়, সমাজটা হয়ে ওঠে শান্তিপূর্ণ।

➢ মতবিনিময়

---

৪৪৪. মূল ড. রাগেব সারজানি, অনু. মাওলানা আব্দুল আলিম, *তাতারিদের ইতিহাস* (মাকতাবাতুল হাসান, মাদানী নগর মাদরাসা রোড, চিটাগং রোড, নারায়ণগঞ্জ, প্রকাশকাল, জানু. ০৮), পৃ. ১৮২-১৮৩

৪৪৫. মুহাম্মদ ইরফান হাওলাদার, *বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসী এবং রিসালায়ে নুর* (গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, প্রকাশকাল ফেব্রু-২০২০), পৃ. ৯৬

কোন বিষয়ে কোন মুসলিম ভাই, কোন আলেম, কোন সংগঠন বা দল বা কোন দেশ ত্রুটি করছে মর্মে নযরে আসলে খুবই সম্মানের সাথে তাদের সাথে মতবিনিময় করা। হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশ তৈরী করে সে বিষয়টির সুন্দর ব্যাখ্যা চাওয়া। সঠিক ব্যাখ্যা দিলে মেনে নেয়া অন্যথায় সঠিক বিষয়টি সবার সামনে সুন্দর উপস্থাপনার মাধ্যমে তুলে ধরা। সবাই যেন তা পালনে আন্তরিক হতে পারেন এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

- **সংলাপ**

কোন বিষয়ে বিভ্রান্তি দেখা দিলে অথবা কোন মুসলিম দল অথবা দেশের মাঝে কোন বিষয়ে ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দিলে তাদের বিষয়ে তরিৎ কোন সিদ্ধান্ত না নিয়ে উভয়ে এক সাথে বসা, সংলাপ করা এবং নিজেদের মাঝের যে কোন সমস্যাকেই যে কোন ভাবেই হোক সমাধানের চেষ্টা করা। এ সকল সমস্যার সমাধান অন্য কোন অমুসলিম ব্যক্তি বা জাতির কাছে না চাওয়া। নিজেদের সমস্যার সমাধান নিজেরাই করার যোগ্যতা অর্জন করা।

দ্বাদশ অধ্যায়

উম্মাহর ঐক্যের সুফল

➢ ভারতীয় মুসলিমদের দৃষ্টান্ত

ইন্দিরা গান্ধীর দাপটের সময় ভারতের সকল ইসলামী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ 'মজলিসে মুশাওয়ারাত' নামে একমঞ্চে সমবেত হওয়ায় সেখানকার মুসলিম জনতার ঐতিহাসিক তিন দফা দাবী আদায় করা সম্ভব হয়েছিল। দাবীগুলো হল:-

১. মুসলিম পারিবারিক আইনে হস্তক্ষেপ করা চলবে না।
২. উর্দূ ভাষাকে শাসনতন্ত্রে দেওয়া মর্যাদা অনুযায়ী বহাল রাখতে হবে।
৩. আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দেয়া চলবে না।[৪৪৬]

➢ ভারত বর্ষ থেকে ইংরেজদের উৎখাত

ভারত বর্ষে দখলদার ইংরেজদের ২০০ বছরের অপশাসনের বিরুদ্ধে এ অঞ্চলের মুসলিমগণ যখন একতাবদ্ধ হলেন, এমনকি হিন্দুরাও যখন নিজেদের অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্য মুসলিমদের সাথে যুগপৎ আন্দোলন শুরু করল তখন দখলদার বৃটিশরা ভারত বর্ষ ছাড়তে বাধ্য হল। সেখান থেকে স্বাধীন পাকিস্তান সৃষ্টি হল। তারই ধারাবাহিকতায় আমরা পেলাম সোনার বাংলাদেশ।

➢ পাকিস্তানে সফল ওলামা সম্মেলন

১৯৫১ সালে পাকিস্তানে সর্বদলীয় ওলামা সম্মেলনে ইসলামী শাসনতন্ত্রের ২২ দফা মূলনীতি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হওয়ার কারণে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে ইসলামী আদর্শ প্রস্তাব স্থায়ী মর্যাদায় বহাল রয়েছে। এমনকি ১৯৭৩ সালে মি. ভুট্টোর আমলে প্রণীত শাসনতন্ত্রেও ইসলামী আদর্শ প্রস্তাব ও ২২ দফাকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব হয়নি।[৪৪৭]

---

৪৪৬. *ঐক্য প্রচেষ্টা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০
৪৪৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০

➢ **কু-ব্যর্থ করে দেয়া হল**

২০১৬ সালে তুর্কিতে বিপদগামী কিছু ষড়যন্ত্রকারী সামরিক অফিসার পশ্চিমাচক্র ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী গোষ্ঠীর ইন্ধনে তুর্কির গণতান্ত্রিকভাবে বারবার নির্বাচিত সফল সরকারের বিরুদ্ধে কু-করার অপচেষ্টা চালায় কিন্তু সকল দলের ঐক্যবদ্ধ বলিষ্ঠ অবস্থানের কারণে তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়।

➢ **সোভিয়েত ইউনিয়নের পরাজয়**

১৯৮০-এর দশকে আফগানিস্তানের ইসলামী দলগুলো যদি ঐক্যবদ্ধ থাকত তাহলে সোভিয়েত রাশিয়া দেশটিকে দখল করতে পারত না এবং তাদেরকে দেশ থেকে পালিয়ে ইরান, সৌদি আরব ও পাকিস্তানে আশ্রয় নিতে হত না। নির্বাসিত অবস্থায় তারা ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য হন এবং সম্মিলিত হয়ে লড়াই করেই দখলদার সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বিজয়ী হন। কিন্তু বিজয়ের পর আবার অনৈক্যের পরিণাম স্বরূপ নতুনভাবে তারা পরাধীন হন। নেতৃত্বের কোন্দলের কারণেই তাদের ঐক্য বিনষ্ট হয় এবং তাদের ওপর পুনরায় বিপর্যয় নেমে আসে।

➢ **বাংলাদেশের দু'টি নির্বাচন**

২০০২ সালে পাকিস্তানে ইসলামী দলগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনে অবতীর্ণ হওয়ার ফলে তারা বিস্ময়কর বিজয় লাভ করে।[৪৪৮] একই বছর বাংলাদেশেও চার দলীয় জোট একতাবদ্ধ হয়ে নির্বাচন করার কারণে বিপুল ভোটে বিজয় লাভ করে ক্ষমতায় আরোহন করে। ২০০৯ সালে ১৪ দলীয় মহাজোট গঠন করে নির্বাচনের সুবাদে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়ে তারা ক্ষমতায় আরোহন করে।

➢ **বাংলাদেশে ইসলামী ঐক্য**

বাংলাদেশের আলেম-ওলামা ও ইসলামী দলগুলোর বিচ্ছিন্ন অবস্থা এবং ঐক্যের বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে আন্তর্জাতিক একজন ইসলামী চিন্তাবিদ বলেছেন, 'আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করাই যদি ইসলামী দলসমূহের আসল লক্ষ্য হয় তাহলে তাদের ঐক্য হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। নেতৃত্বের লোভ থেকে মুক্ত হতে পারলেই ঐক্য বাস্তব রূপ লাভ করতে পারে।'[৪৪৯]

➢ **বাংলাদেশে হেফাযতে ইসলামের সফলতা**

৪৪৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩
৪৪৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৪

বাংলাদেশ বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। এদেশের মাটিতে শুয়ে আছেন লক্ষ লক্ষ পীর-আওলিয়া, ওলামায়ে কিরাম, যুগসেরা মুসলিম রাজনীতিবিদ ও তাওহীদি জনতা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য সে ঐতিহ্যবাহি দেশ আমাদের প্রিয় বাংলাদেশের রাজধানির শাহবাগে ইসলামের বিষয়ে অজ্ঞ কিছু উচ্ছৃংখল যুবক যুবতী কালজয়ী ইসলাম, ইসলামের নবী, এমনকি স্বয়ং আল্লাহকে নিয়ে কুৎসাচার ও ব্যাঙ্গ চিত্র তৈরী করে তা প্রদর্শন করে। এতে গোটা দেশের তাওহীদি জনতা সোচ্চার হয়ে উঠেন। তাওহীদি জনতার কণ্ঠস্বর হিসেবে সামনে এগিয়ে আসে হিফাযতে ইসলাম বাংলাদেশ। দলমত নির্বিশেষে দেশের আপামর তৌহিদি জনতাকে সাথে নিয়ে তারা এক পর্যায়ে ঢাকা অবরোধ করেন। এর মধ্য দিয়ে ইসলাম বিদ্বেষী সেই গোষ্ঠীটি শাহবাগ থেকে তাদের দীর্ঘ দিনের ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড বন্ধ করে ও তাদের অবস্থান থেকে সড়ে যায়। আর এর মধ্য দিয়ে গোটা জাতি একটা অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে রক্ষা পায়।

➢ কওমী মাদরাসার সনদ লাভ

হিফাযতের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের মাধ্যমেই এদেশের সম্পূর্ণ বেসরকারি ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা কাওমীধারার শিক্ষা ব্যবস্থা সরকারী মান প্রাপ্ত হয়েছে। ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের কারণেই কাওমী সনদ রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পেয়েছে। কিছু মন্ত্রী, আমলা ও বুদ্ধিজীবির প্রচণ্ড বিরোধীতা সত্ত্বেও শুধু ওলামায়ে কিরামের ঐক্যমত্যকে মূল্যায়ন করে সরকার এ স্বীকৃতি ঘোষণা করেছেন। এর মাধ্যমেই বুঝা যায় ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালালে দেশে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অনেক বড় কিছু অর্জন সম্ভব হয়। দেশে এবং আন্তর্জাতিক বিশ্বে এ জাতীয় আরো বহু উদাহরণ রয়েছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ঐক্য প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান

ঐক্য প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অসংখ্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যেগুলো বিশ্ববাসীকে বিশেষত মুসলিম বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। থিসিসের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় অল্প কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম তুলে ধরা হল:

➢ ওআইসি

ওআইসির স্লোগান: "মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা অগ্রগতি ও মঙ্গল নিশ্চিতকরণ।"[৪৫০]

ওআইসি গঠনের পটভূমি

বিশ্ব নবী (স.) এর নবুওয়্যাতের প্রায় তেরশত বছর পর ১৯২৪ সালে ইসলামী খিলাফতের নির্মম অবসান ঘটে। তুরস্কের উসমানী খিলাফতের বিলোপের সাথে সাথে মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের শিথিল বন্ধনটিও ছিন্ন হয়ে যায়। এক দিকে পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহে নতুনভাবে জাতীয়তাবাদের জাগরণের সাথে সাথে ধূর্ত ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের

৪৫০. উইকিপিডিয়া

মধ্যে জায়নবাদের সুপ্ত চেতনা আর অন্য দিকে ইসলামে পরিত্যাজ্য গোত্রীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মাঝে পারস্পরিক সংঘাত মুসলিম ঐক্যের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। বিশাল তুর্কি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিরাজমান অসন্তোষ, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জাতীয় আকাঙ্ক্ষা বা প্রাদেশিক গভর্নরদের ক্ষমতার অবৈধ উচ্চাভিলাষ এসব অঞ্চলে বহিঃশত্রুর ষড়যন্ত্র বিস্তারের বিরাট সুযোগ তৈরী করে দেয়। তুরস্ক ছিল ছিল প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পরাজিত শক্তি জার্মানির অন্যতম সহযোগী। তাই যুদ্ধের শুরুতেই মিত্র শক্তি, বিশেষ করে বৃটেন আর ফ্রান্স তুরস্কের অধীনে বিভিন্ন অঞ্চলের ক্ষমতালিপ্সু গভর্নরদের সাথে গোপন চুক্তি স্থাপন শুরু করে। তুরস্কের সরকারি শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও মিত্র শক্তিকে যুদ্ধে সহযোগিতা করার প্রতিদান স্বরূপ যুদ্ধের শেষে এসব অঞ্চলকে স্বাধীন হিসেবে ঘোষণা করে চুক্তিবদ্ধ বিশ্বাসঘাতক গভর্নরদের সুলতানরূপে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল এ সকল চুক্তির প্রধান শর্ত। এ ধরনের এক গোপন চুক্তির অংশীদার ছিলেন হিজায বা মক্কার গভর্নর শরীফ হোসাইন।[৪৫১]

এদিকে জায়নবাদকে একটি রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপদানের মাধ্যমে রাশিয়াসহ পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী ইয়াহুদীরা ফিলিস্তিন অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। ইংল্যাণ্ডের প্রভাবশালী রথশীল্ড পরিবার সহ পশ্চিমা বিশ্বের বহু বিত্তশালী ইয়াহুদী নাগরিক ও জায়নবাদী সংগঠন ফিলিস্তিনে উদ্বাস্তু ইয়াহুদীদের পূনর্বাসনের জন্য আর্থিক সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসে। আমারিয়া, জুডা, গেলিলিসহ ফিলিস্তিনের বিভিন্ন অঞ্চলে ইয়াহুদীদের নতুন নতুন কলোনী গড়ে ওঠতে থাকে। পরিকল্পিতভাবে জায়নবাদি আন্দোলন এক পর্যায়ে এসে ফিলিস্তিনে ইহুদীদের জাতীয় আবাসভূমি স্থাপনের আন্দোলনে পরিণত হয়।[৪৫২]

১৯১৭ সালে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে ব্যালফোর ঘোষণার মাধ্যমে ফিলিস্তিনে ইহুদীদের জাতীয় আবাসভূমি স্থাপনের প্রস্তাবকে সমর্থন করা হয়। পরবর্তী ফরাসী ও ইতালী সরকার এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলসন এ প্রস্তাবের পক্ষে তাদের সমর্থনের কথা ব্যক্ত করেন। স্বাভাবিকভাবেই এ ঘটনা এক দিকে ইয়াহুদীদের যেমন অবৈধ অনুপ্রেরণা দেয় অন্যদিকে ফিলিস্তিনীসহ গোটা মুসলিম বিশ্বকে চরমভাবে নিরাশ করে। ১৯৪২ সালের মে মাসে নিউইয়র্কে অবস্থিত জায়নবাদি সংগঠন American Zionist Organization (AZO) ফিলিস্তিন সংক্রান্ত একটা নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করে। এ কর্মসূচীর আওতায় ছিল ফিলিস্তিনে অবৈধভাবে ইয়াহুদীদের আবাসস্থল প্রতিষ্ঠা করা, একটি সেনাবাহিনী গঠন করা, ১৯৩৯ সালে বৃটিশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত

৪৫১. *বাংলাদেশ ও ওআইসি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭-৩৮
৪৫২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮

ফিলিস্তিন সংক্রান্ত শ্বেতপ্রত্রকে অগাহ্য করা। পরবর্তীতে এ কর্মসূচীই ফিলিস্তিনে ইয়াহুদীদের জন্য প্রধান রাজনৈতিক কর্মসূচী হিসেবে পরিণত হয়।[৪৫৩]

১৯৪৭ সালের মে মাসে জাতিসংঘে মোট ১১টি দেশের সদস্য নিয়ে একটি বিশেষ কমিটি ঘোষণা করা হয়। এ কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিকল্পনায় ফিলিস্তিনকে একটি আরব রাষ্ট্র, একটি ইয়াহুদী রাষ্ট্র এবং জেরুজালেমকে আন্তঃরাষ্ট্রীয়করণের সুপারিশ করা হয় এবং একই পরিকল্পনায় ফিলিস্তিনে দেড়লক্ষ নতুন ইয়াহুদী পূনর্বাসনের সুযোগ দেয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়। উক্ত প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে যখন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের একটি সভার বিশেষ এডহক কমিটিতে নানারকম বিতর্ক শুরু হয়, ঠিক তখনই জায়নবাদিরা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে অবৈধ কুটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ সালের ২৯ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ভোটাভুটির মাধ্যমে সম্পূর্ণ অন্যায্য ও অন্যায়ভাবে ফিলিস্তিনকে ভাগ করার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ১৯৪৮ সালের ১৪ মে ইয়াহুদীদের প্রতিনিধিবৃন্দ স্বাধীন ইসরাঈল রাষ্ট্রের কথা ঘোষণা করে।[৪৫৪]

আরব ইসরাঈল যুদ্ধ

আরবের বুকে নতুন ইসরাঈল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণার সাথে সাথে গোটা আরব বিশ্বে যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। জর্ডান, সিরিয়া, মিশর ও লেবাননের বিশাল সম্মিলিত বাহিনী ফিলিস্তিনের দিকে অগ্রসর হয় এবং দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল লড়াই শুরু হয়। যুদ্ধের এক পর্যায়ে যখন ইসরাইলি বাহিনী পরাস্ত হতে শুরু করে ঠিক তখনই জাতিসংঘের আহবানে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়। এ সুযোগে রাশিয়াসহ অন্যান্য বৃহৎ শক্তিগুলো ইসরাইলকে প্রচুর সামরিক সাহায্য দিতে শুরু করে এবং ইহুদীরা বিভিন্ন দেশ থেকে ইহুদি স্বেচ্ছাসেবক নামে সৈন্য সংগ্রহ করে নিজেদের শক্তিশালী করে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করে। এবার জাতিসংঘ কর্তৃক ষড়যন্ত্রের শিকার আরবগণ ইসরাইলি বাহিনীর সাথে পেরে উঠেনি এবং ফিলিস্তিনের ইতিহাসে এই যুদ্ধ পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণ পাল্টে দেয়।[৪৫৫]

১৯৬৭ সালে আরববিশ্ব পুনরায় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এবারও ইউরোপ ও আমেরিকার প্রত্যক্ষ মদদে ইসরাঈল যুদ্ধে জয়ী হয়। যুদ্ধের শুরুতেই ইসরাইলী বিমানবাহিনীর অতর্কিত হামলায় মিসরের বিমানবহর প্রায় সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কথিত বিজয়ী ইসরাঈল আন্তর্জাতিক সকল বিধি বিধানের মূলে কুঠারাঘাত করে ১৯৬৯ সালের ২১ আগস্ট জেরুজালেমের পবিত্র মাসজিদুল আকসায় আগুন ধরিয়ে দেয়। সারা বিশ্বের মুসলিমসহ শান্তি প্রিয় সকল মানুষ এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে।[৪৫৬]

---

৪৫৩. *প্রাগুক্ত*
৪৫৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯
৪৫৫. *প্রাগুক্ত*
৪৫৬. *প্রাগুক্ত*

প্রতিষ্ঠার কারণ

আরব দেশগুলোর সাথে অবৈধ ইয়াহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈলের ১৯৬৭ সালের ছয় দিনের যুদ্ধের পর ১৯৬৯ সালের ২১ আগস্ট যখন ইসরাইল জেরুজালেমের পবিত্র মাসজিদুল আকসায় অগ্নিসংযোগ করে। এর ফলে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়ায় ২৫ আগস্ট ১৪ টি আরব দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ মিশরের রাজধানী কায়রোতে এক জরুরী বৈঠকে মিলিত হয়। ওই বছরেরই ২২-২৫ সেপ্টেম্বর মরক্কোর রাজধানী রাবাতে ২৫ টি মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানদের নিয়ে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে ২৫ টি মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণের সিদ্ধান্তক্রমে Organization of the Islamic Conference নামে এ প্রতিষ্ঠানটি আত্মপ্রকাশ করে। মধ্যপ্রাচ্যসহ, উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ৫৭টি ইসলামী রাষ্ট্র নিয়ে এ সংস্থা গঠিত। এ সংস্থা মূলতঃ মুসলমানদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। ওআইসি জাতিসংঘের স্থায়ী প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা। ওআইসির একটি জাতিসংঘের স্থায়ী প্রতিনিধি দল রয়েছে এবং বৃহত্তম রাষ্ট্রসংঘের বাইরে আন্তর্জাতিক সংগঠন। ওআইসির সরকারি ভাষা আরবি, ইংরেজি এবং ফরাসি। এককথায় বলা যায় ওআইসি মুসলিম বিশ্বের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর।

সংস্থাটির বর্তমান মহাসচিব ইউসেফ আল-ওথাইমিন, বর্তমান সদস্যসংখ্যা ৫৭। ১৯৬৯ সালে মরোক্কোর রাবাতে এর প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিষ্ঠাকাল ও নামকরণ

অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কো-অপারেশান (Organization of the Islamic Co-operation) বা সংক্ষেপে ওআইসি বিশ্বের ৫৭ টি মুসলিম স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সংগঠন। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ ও জনগোষ্ঠীর ঐক্য ও সংহতির প্রতীক। এটি একটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় আন্তর্জাতিক সংস্থা। মুসলিম বিশ্ব এবং এর পাশাপাশি গোটা বিশ্ব পরিবারে এ সংস্থার গুরুত্ব অত্যধিক।[৪৫৭]

১৯৭১ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারী থেকে ৪ মার্চ পর্যন্ত সৌদি আরবের জেদ্দায় ঐতিহাসিক ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিশটি মুসলিম দেশের অংশগ্রহণে এ সম্মেলনে Organization of the Islamic Co-operation-এর খসড়া চার্টার অনুমোদিত হয়। ওআইসির বিধিবদ্ধ যাত্রা শুরু তখন থেকেই।[৪৫৮] ১৯৬৯ সালের ২২-

৪৫৭. *বাংলাদেশ ও ওআইসি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
৪৫৮. *প্রাগুক্ত*

২৫ সেপ্টেম্বর সময়কালকে ওআইসির প্রতিষ্ঠাকাল ধরা হয়। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে এর নাম ছিল Organization of the Islamic Conference পরবর্তীকালে ২০০৮ সালে পরিবর্তিত হয়ে Organization of the Islamic Countries এবং সর্বশেষ ২৮ জুন ২০১১ তারিখে নাম পরিবর্তন করে Organization of the Islamic Co-operation বা 'ইসলামী সহযোগী সংস্থা' নামকরণ করা হয়। তবে শুরু থেকে সংস্থাটির নাম 'ওআইসি' অপরিবর্তিত রয়েছে।[৪৫৯]

ওআইসি গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রচলিত রীতি মেনে পৃথিবীর প্রায় সব কয়টি স্বাধীন রাষ্ট্রের সংবিধানে একটি উপক্রমনিকা (Preamble) সংযোজিত হয়েছে। উপক্রমনিকা হল সংবিধান তথা রাষ্ট্র ও জাতির নির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং আদর্শের একটি স্বচ্ছ দর্পন। ওআইসি হল বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম আন্তঃরাজনৈতিক সংস্থা। ওআইসির সংবিধান হল তার সনদ। এ সংস্থাটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মাধ্যমে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের সকল জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নতি লাভের ঐকান্তিক ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটেছে। ১৯৭১ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারী থেকে ৪ মার্চ পর্যন্ত জেদ্দায় ইসলামী দেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সেখানে Organization of the Islamic Conference-এর খসড়া চার্টার অনুমোদিত হয়। তখন থেকেই এর বিধিবদ্ধ যাত্রা শুরু। ১৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত চার্টারের দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে এ সংস্থা গঠনের ৭টি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সেগুলো হল:-

১। সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ইসলামী সংহতি বৃদ্ধি করা

২। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহে সদস্যরাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সহযোগিতা সংহত করা এবং আন্তর্জাতিক ফোরামসমূহে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করা

৩। সকল প্রকার বর্ণ বৈষম্যের মূলোচ্ছেদ এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতি প্রয়োজনীয় সমর্থন দান

৪। পবিত্র স্থানসমূহের নিরাপত্তা বিধানের সংগ্রামকে সমন্বিত এবং সুসংহত করা এবং ফিলিস্তিনি জনগণের ন্যায্য সংগ্রামকে সমর্থন করা এবং তাদের অধিকার আদায় এবং স্বদেশ রক্ষা করার কাজে সাহায্য প্রদান

৪৫৯. *প্রাগুক্ত*

৫। মুসলিমদের মান মর্যাদা, স্বাধীনতা এবং জাতীয় অধিকার সংরক্ষণের সকল সংগ্রামে মুসলিম জনগণকে শক্তি যোগানো

৬। সদস্য রাষ্ট্রসমূহ এবং অন্যান্য দেশের মধ্যে সহযোগীতা এবং সমঝোতা বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা

৭। সুবিচার ভিত্তিক আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতি প্রয়োজনীয় সমর্থন প্রদান করা।[৪৬০]

পরবর্তীকালে ১৪ মার্চ ২০০৮ তারিখে সংশোধিত চার্টার অনুমোদিত হয়। সংস্থাটির কার্যক্রম মূল্যায়ন ও চূড়ান্ত বিচার-বিশ্লেষণের জন্য এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আলোচনা পর্যালোচনা প্রয়োজন। এখানে সর্বশেষ সংশোধিত ও অনুমোদিত চার্টারের উপক্রমণিকা এবং প্রথম অধ্যায়ের ধারা (১)-এর ২০ টি উপধারা এবং ধারা (২)-এর ৮ টি উপধারা উল্লেখ করা হলো:-

০১. ইসলামের ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের মহান মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হতে এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের অভিন্ন স্বার্থ সংরক্ষণে ঐক্য সংহতিকে সমুন্নত ও সুসংহত রাখার অপরিহার্যতার প্রতি অঙ্গীকার জ্ঞাপন

০২. জাতিসংঘ সনদ বর্তমান সনদ এবং আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি আমাদের অঙ্গীকার জ্ঞাপন

০৩. মানবিক মর্যাদা, শান্তি, সহমর্মিতা, সহনশীলতা, সাম্য, ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে ইসলামের সুমহান মূল্যবোধ সমুন্নত রাখা

০৪. সদস্য রাষ্ট্রসমূহের টেকসই উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে ইসলামের অগ্রসৈনিকের ভূমিকা পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রচেষ্টা

০৫. মুসলিম জাতিসমূহ এবং সদস্য রাষ্ট্রসমূহের ঐক্য ও সংহতি সমুন্নত ও জোরদার করা; ০৬. সকল সদস্য রাষ্ট্রের জাতীয় সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা এবং ভৌগোলিক অখণ্ডতাকে সংরক্ষণ ও সম্মান জানানো

০৭. বিভিন্ন সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং ধর্মের মধ্যে সমঝোতা এবং সংলাপ এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সমর্থন এবং বন্ধুত্বপূর্ণ ও সুপ্রতিবেশীমূলক সম্পর্ক এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও উন্নয়ন, উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান

---

৪৬০. *বাংলাদেশ ও ওআইসি*, প্রাগুক্ত

০৮. সদস্য রাষ্ট্রের সাংবিধানিক আইন ব্যবস্থা অনুযায়ী মানবাধিকার, মৌলিক অধিকার, সুশাসন, আইনের শাসন, গণতন্ত্র এবং জবাবদিহিতার লালন ও উন্নয়ন

০৯. সদস্য রাষ্ট্র ও অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আস্থা, বন্ধুত্বের সম্পর্ক, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা প্রদান

১০. ধৈর্য, সহনশীলতা, বৈচিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা, মূল্যবোধ এবং ইসলামের প্রতীক, ঐতিহ্য এবং সাধারণ উত্তরাধিকার সংরক্ষণ ও ইসলাম ধর্মের বিশ্বজনীনতাকে সমর্থন প্রদান

১১. বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের লক্ষ্যে ইসলামের সুউচ্চ আদর্শ ভিত্তিক জ্ঞান অর্জন ও জনপ্রিয়করণের জন্য প্রচেষ্টা চালানো

১২. অংশিদারিত্ব ও সমতার ভিত্তিতে বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কার্যকর অংশগ্রহণের নিমিত্তে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সহযোগিতা সম্প্রসারণ

১৩. সকল সদস্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা, অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা এবং স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা

১৪. ফিলিস্তিনি জনগণের যারা বর্তমানে বিদেশি দখলদারদের অধীনে আছেন, সংগ্রামকে সমর্থন এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারসহ তাদের অবিচ্ছেদ্য অধিকারসমূহ এবং আল-কুদস আশ-শরীফে রাজধানীসহ সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অধিকার এবং একই সাথে এর ঐতিহাসিক ইসলামী পবিত্র স্থানসমূহ সংরক্ষণের অধিকার অর্জনে তাদের ক্ষমতা প্রদান

১৫. সদস্য রাষ্ট্রসমূহের আইন ও বিধান অনুযায়ী জীবনের সকল স্তরে নারীর অংশগ্রহণ এবং নারীর অধিকার সংরক্ষণ সমুন্নত রাখা

১৬. মুসলিম শিশু ও যুবকদের যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা এবং তাদের সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও নৈতিক আদর্শ জাগ্রত করার জন্য শিক্ষার মাধ্যমে মূল্যবোধ এর উন্মেষ ঘটানো

১৭. সদস্য রাষ্ট্রের বাইরে অন্যান্য দেশের সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের মর্যাদা, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পরিচয় সংরক্ষণের জন্য তাদের সহায়তা প্রদান

১৮. এ সনদ জাতিসংঘ সনদ এবং আন্তর্জাতিক আইনের উদ্দেশ্য এবং নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা এবং একই সাথে কোন রাষ্ট্রের নিজস্ব বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতিতে অটল থাকা

১৯. আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুশাসন কায়েমের জন্য প্রচেষ্টা চালানো এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ক্ষমতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক এবং কোন দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা

২০. অতঃপর এ লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সহযোগিতার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং সংশোধিত সনদের প্রতি ঐক্যমত্য পোষণ করা হয়।[৪৬১]

উপক্রমনিকাতে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ ও মুসলিম জনগণের মধ্যে ইসলামের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা এবং ঐতিহাসিক ইসলামী পবিত্র স্থানসমূহ সংরক্ষণ এবং ইসলামের সুমহান মূল্যবোধ লালনের বিষয়ে যেমন অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে, তেমনি আন্তর্জাতিক আইনের উদ্দেশ্য এবং নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা, বিশ্বের অপরাপর জনগণ ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক রক্ষার তাগিদ প্রদান এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সমর্থন ব্যক্ত করা হয়েছে।[৪৬২]

বর্ণিত অবস্থায় ইসলামী বিশ্বের প্রাণের চাওয়া একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী সংগঠন হিসেবে 'ইসলামী সম্মেলন সংস্থা' যা বর্তমানে ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও নীতিমালা সম্বলিত প্রথম অধ্যায়ের ধারা (১)-এর ২০টি উপধারা এবং ধারা (২)-এর ৮টি উপধারা রয়েছে।[৪৬৩]

০১. সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সংহতির বন্ধন দৃঢ় করা।

০২. সদস্য রাষ্ট্রসমূহের অভিন্ন স্বার্থ রক্ষা, সংরক্ষণ এবং মুসলিম বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিশেষভাবে এবং আন্তর্জাতিক বিশ্বের জন্য সাধারণভাবে সদস্য রাষ্ট্রের প্রচেষ্টা সমন্বয় এবং একীভূত করা।

০৩. প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা এবং ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার সহ অন্য রাষ্ট্রের নিজস্ব বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা।

০৪. আগ্রাসনের শিকার দখলাধীন কোন সদস্য রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ সার্বভৌমত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক সংস্থার সহযোগিতা নিয়ে আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তিতে সমর্থন প্রদান।

০৫. সদস্য রাষ্ট্রসমূহের অভিন্ন স্বার্থ সংরক্ষণে তাদের বিশ্বরাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

---

৪৬১. *বাংলাদেশ ও ওআইসি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২-৬৪
৪৬২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪
৪৬৩. *প্রাগুক্ত*

০৬. বিশ্বশান্তি, নিরাপত্তা ও সৌহার্দ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুবিচার, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কের ভিত্তিতে আন্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক উন্নয়ন।

০৭. জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক আইনে বিধৃত জাতিসমূহের অধিকারের প্রতি সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করা।

০৮. ফিলিস্তিনি জনগণের আল-কুদস আশ-শরীফে রাজধানীসহ সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা প্রদানের এবং এর ঐতিহাসিক ও ইসলামি বৈশিষ্ট্য সহ এখানে অবস্থিত পবিত্র স্থানসমূহের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করা।

০৯. ইসলামিক কমন মার্কেট প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সংহতি অর্জনের নিমিত্ত আন্তঃইসলামী অর্থনীতি ও বাণিজ্য সহযোগিতা জোরদার করা।

১০. সদস্য রাষ্ট্রসমূহের টেকসই এবং মানব উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক কল্যাণ অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়াস চালানো।

১১. সংযম ও সহনশীলতার ভিত্তিতে ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রচার-প্রসার ও সংরক্ষণ, ইসলামী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও প্রসার ঘটানো।

১২. ইসলামের সার্বিক ভাবমর্যাদা রক্ষা ও সংরক্ষণ, ইসলামের অবমাননা প্রতিরোধ করা এবং সভ্যতা ও ধর্মসমূহের মধ্যে সংলাপ উৎসাহিত করা।

১৩. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসার। এ সকল ক্ষেত্রে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে গবেষণা ও সহযোগিতা উৎসাহিত করা।

১৪. মানবাধিকার এবং নারী, শিশু, যুব ও প্রবীণদের বিশেষ যত্নের প্রয়োজন। এরূপ ব্যক্তিদের অধিকারসহ মৌলিক অধিকারের লালন ও সংরক্ষণ এবং ইসলামী পারিবারিক মূল্যবোধের সংরক্ষণ।

১৫. সমাজের স্বাভাবিক ও মৌলিক একক হিসেবে পরিবারের ভূমিকার সম্প্রসারণ, সংরক্ষণ এবং গুরুত্ব প্রদান।

১৬. সদস্য বহির্ভূত মুসলিম সম্প্রদায় এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার, মর্যাদা এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয় সুরক্ষা।

১৭. আন্তর্জাতিক ফোরামসমূহে অভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর সমন্বিত অবস্থানের প্রসার ও সমর্থন।

১৮. সকল রূপে ও আকারে সন্ত্রাস দমনে সহযোগিতা, সংঘটিত অপরাধ, মাদক পাচার, দুর্নীতি, মুদ্রাপাচার, কালো টাকা সাদাকরণ এবং মানব পাচার রোধে সহযোগিতা প্রদান।

১৯. প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো জরুরি অবস্থায় সহযোগিতা ও সমন্বয় করা।

২০. সদস্য দেশসমূহের মধ্যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং তথ্য ক্ষেত্র সম্প্রসারণে সহযোগিতা প্রদান।[৪৬৪]

ধারা (২) -এর ৮ টি উপধারা

ধারা (২) এর ৮টি উপধারা হলো:- সদস্য রাষ্ট্রসমূহ অঙ্গীকার করছে যে, ধারা ০১-এ বিবৃত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নে তারা ইসলামের মহান শিক্ষা ও মূল্যবোধে উজ্জীবিত হয়ে এবং নিম্নবর্ণিত নীতিমালা অনুযায়ী কাজ করবেন।

০১. সকল সদস্য রাষ্ট্র জাতিসংঘ সনদের উদ্দেশ্য ও নীতিমালার প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকবেন। ০২. অধিকার ও দায়িত্বে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ সার্বভৌম, স্বাধীন ও সমান।

০৩. সকল সদস্য রাষ্ট্র তাদের বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা করবেন এবং পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ বা বলপ্রয়োগের হুমকি থেকে বিরত থাকবেন।

০৪. সকল সদস্য রাষ্ট্র অঙ্গীকার করছে যে, তারা অপরের জাতীয় সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা, ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবেন; অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকবেন।

০৫. সকল সদস্য রাষ্ট্র অঙ্গীকার করছে যে, তারা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় অংশগ্রহণ করবে এবং বর্তমান সনদ, জাতিসংঘ সনদ, আন্তর্জাতিক আইন ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বিধান অনুযায়ী একে অন্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকবে।

০৬. এ সনদে যাই থাক না কেন, তদ্বারা জাতিসংঘ সনদে যেরূপে বিধৃত আছে, এটি কোন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অনুমোদন দিবে না।

০৭. সদস্য রাষ্ট্রসমূহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুশাসন, গণতন্ত্র, মানবাধিকার, মৌলিক অধিকার এবং আইনের শাসনের সম্প্রসারণ ঘটাবে।

০৮. সদস্য রাষ্ট্রসমূহ পরিবেশ সুরক্ষা ও সংরক্ষণে প্রচেষ্টা চালাবে।[৪৬৫]

---

৪৬৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫-৬৬

গভীরভাবে লক্ষ্য করলে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এসব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে কোন আগ্রাসী নীতি অন্তর্ভুক্ত হয়নি; বিশ্ব মানবিক সংহতি ও ঐক্য পরিপন্থী কোন সংকীর্ণ চিন্তার প্রতিফলনও ঘটেনি। যুগ যুগ ধরে হামলা, ধ্বংস, বিপর্যয় ও পরাধীনতার শিকার হলেও এবং আল-কুদসে অগ্নিসংযোগের মত ভয়াবহ ঘটনার প্রেক্ষিতে ১৯৬৯ সালে ওআইসি আত্মপ্রকাশ করলেও মুসলিম বিশ্বের আত্মরক্ষা, কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সহযোগিতা ও সমঝোতা বৃদ্ধির পরিবেশ সৃষ্টি এবং সুবিচার ভিত্তিক আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতি প্রয়োজনীয় সমর্থন দানই এ সংস্থার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঘোষিত হয়। ওআইসি এর চার্টারে মুসলিমদের নিজস্ব ক্ষেত্রে আত্মরক্ষা ও আত্মউন্নয়নমূলক এবং বিশ্ব মানবের প্রতি সার্বজনীন সৌহার্দ্য, মৈত্রি ও সম্প্রীতিমূলক চেতনাই বিধৃত হয়েছে।[৪৬৬]

বাস্তবতা

ওপরে ওআইসি প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও এর ধারাগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। স্পষ্টত যে বিষয়টি উল্লেখ করা যায় তা হল এর প্রতিষ্ঠার প্রথম যে উদ্দেশ্যটি ছিল আজ পর্যন্ত তা বাস্তবায়ন হয়নি। যা বড়ই দুঃখজনক বিষয় আর তা হল মসজিদে আকসাকে উদ্ধার করা যা আজো দখলদার ইয়াহুদীদের কবল থেকে উদ্ধার করা যায়নি। ১৯৬৭ সালের ২১ আগস্ট ইসরাইল জেরুজালেমের পবিত্র মসজিদুল আকসায় অগ্নিসংযোগ করে। যা গোটা মুসলিম বিশ্বের সকল জনতার হৃদয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। সে ইস্যুতে প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠান আজো সেটা উদ্ধার করতে না পারা বড়ই হাতাশা ও ব্যাথার বিষয়। তা-ই অন্য বিষয়গুলো নিয়ে দীর্ঘ পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে বলে আর মনে হয় না।

তবে আশার দিক হল হাটিহাটি পা পা করে আজকে এ প্রতিষ্ঠান ৫৭ টি মুসলিম দেশের আন্তর্জাতিক ঐক্যবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।[৪৬৭] আন্তর্জাতিক বিশ্বে জাতিসংঘের পরেই তার অবস্থান। কাঙ্খিত নেতৃত্ব পেলে আগামীর পৃথিবীকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য তা জাতি সংঘের চেয়েও গুরত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে বলে সচেতন ইসলামিক স্কলারগণ মতামত দিয়ে থাকেন। তবে জাতিসংঘ কিংবা কোন পরাশক্তির এজেণ্ডা বাস্তবায়নে সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান না হয়ে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বিষয়টি সামনে রেখে তা বাস্তবায়নেই যথাযথ কর্তৃপক্ষকে বলিষ্ঠতার সাথে কাজ করতে হবে।

---

৪৬৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬-৬৭
৪৬৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭
৪৬৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৬

➢ ডি. ৮

D-8 Organization for Economic Cooperation

উন্নয়নশীল মুসলিম ৮টি দেশ নিয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থা D-8 (Developing Eight) নামে পরিচিত। এ সংস্থাটি একটি অর্থনৈতিক উন্নয়ন জোট। বাংলাদেশ, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ইরান, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান এবং তুরস্ক এ ৮ টি দেশ নিয়ে ডি-৮ সংস্থা গঠিত।

উন্নয়নশীল ৮ বা D-8। তুরস্কের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নাজমুদ্দিন প্রতিষ্ঠা করেন। ডি-৮ ১৯৯৭ সালে জুনের ১৫ তারিখে ইস্তাম্বুল ঘোষণার মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে।

ডি-৮ এর উদ্দেশ্য হল উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নতি সাধন করা ও বিশ্ব অর্থনীতিতে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করা, পারস্পরিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক ও সুবিধা বৃদ্ধি করা , আর আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সকলের অংশ গ্রহণ বৃদ্ধি করা ও মানসম্মত জীবন যাপন নিশ্চিত করা। ডি-৮ এর সহযোগিতার প্রধান খাত গুলোর মধ্যে রয়েছে, আর্থিক, ব্যাংকিং, গ্রামীন উন্নয়ন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, মানব কল্যাণ ও মানবাধিকার, কৃষি, জালানি, পরিবেশ এবং স্বাস্থ্য ইত্যাদি।[৪৬৮]

---

৪৬৮. *উইকিপিডিয়া*

➢ ইত্তেহাদুল 'আলামী লি উলামাইল মুসলিমীন

এটি সমগ্র পৃথিবীর মুসলিম আলিমগণকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিখ্যাত ইসলামিক স্কলার শায়খ ড. ইউসুফ আল কারযাভীর নেতৃত্বে ২০০৪ সালে গঠিত হয়। এর অধীনে বিভিন্ন দেশ ও মাযহাবের ৯০ হাজার ওলামায়ে কিরাম রয়েছেন। এর হেড কোয়ার্টার কাতারের রাজধানী দোহায় অবস্থিত।

এটি স্বনির্ভর একটি ইলমী সংস্থা। এর অন্যতম কাজ হল বিশ্বের ওলামায়ে কিরামগণের মাঝে সম্প্রীতির বন্ধন তৈরী করা। ফিকহী বিষয়ে সকলে একমত হয়ে কাজ করা এবং এশিয়া ইউরোপ, আফ্রিকাসহ সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, মহাদেশ ও অঞ্চলে বসবাসকারী মুসলিমদের দীনী প্রয়োজন পূরণে সম্মিলিত ফতোয়া প্রদানের ব্যবস্থা করা। আধুনিক ও জটিল সমস্যাসমূহের শরয়ী সমাধান প্রদান করা এবং গবেষণামূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ করা।[৪৬৯]

---

৪৬৯. *উইকিপিডিয়া*

➢ সার্ক

বাংলাদেশের নেতৃত্বে দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং নিজেদের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক) গঠিত হয়। উন্নয়ন আঞ্চলিক কৌশলের ওপর ভিত্তি করে স্থাপিত। এটি মূলত একটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতার আঞ্চলিক সংগঠন। দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতার ধারণাকে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সহযোগিতার মাধ্যমে পূর্ণতা প্রদানই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। এ দর্শনকে সামনে রেখেই ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা গঠনের উদ্যোগ নেন। ১৯৮০ সালের মে মাসে তিনি দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে এ মর্মে বাংলাদেশের একটি আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পেশ করেন। জিয়াউর রহমান চেয়েছিলেন এ অঞ্চলের জনগণের মধ্যে অর্থনীতি, প্রযুক্তি, শিক্ষা, বিজ্ঞান, কারিগরি, সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সহজ ও স্বাভাবিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়ে সামগ্রিক উন্নয়ন ও সম্ভাবনা দৃঢ় হোক। দক্ষিণ এশীয় সাতটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানরা এ প্রস্তাবে প্রাথমিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে সাড়া দেন। ১৯৮১ সালের ২১ থেকে ২৩ এপ্রিল কলম্বোতে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশীয় রাষ্ট্রগুলোর প্রথম পররাষ্ট্র সচিব সম্মেলনে কাঙ্ক্ষিত সংগঠন গঠনের ব্যাপারে কিছু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়। এরপরই ১৯৮৩ সালের আগস্ট মাসে এ অঞ্চলের সাতটি দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা দিল্লীতে তাদের প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠকে মিলিত হন। এ বৈঠকে মন্ত্রিবর্গ একীভূত বা যৌথ কর্মসূচি বা Integrated Programme of Action (IPA) নামে একটি প্রোগ্রাম গ্রহণ করেন। এ কর্মসূচির আওতায় সার্কভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সহযোগিতার মাধ্যম হিসেবে বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের জন্য নয়টি ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়। অতঃপর

১৯৮৫ সালের ০৭-০৮ ডিসেম্বর ঢাকা সম্মেলনের মাধ্যমে (SAARC-South Asian Association for Regional Co-operation) বা দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার আনুষ্ঠানিক সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদিত হয় এবং তার যাত্রা শুরু হয়।

সার্ক ৭টি রাষ্ট্র নিয়ে শুরু করলেও বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ৮টা। সার্কের ১৭তম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে মালদ্বীপের আদ্দু সিটিতে এবং ১৮তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে নেপালে। বলাবাহুল্য এর সদর দফতর নেপালে অবস্থিত।[৪৭০]

সার্কের সদস্য রাষ্ট্র

দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি দেশের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য ১৯৮৫ সালে শুরু হওয়া সার্ক ইতোমধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করেছে। সার্কে আফগানিস্তানের অন্তর্ভুক্তির ফলে বর্তমানে সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছে আটে। এর সদস্য রাষ্ট্রগুলো হচ্ছে : ১. বাংলাদেশ ২. ভারত ৩. পাকিস্তান ৪. নেপাল ৫. শ্রীলঙ্কা ৬. ভুটান ৭. মালদ্বীপ ৮. আফগানিস্তান।[৪৭১]

সার্কের পর্যবেক্ষক দেশসমূহ

চীন ও জাপানের মতো উন্নত প্রযুক্তিশীল রাষ্ট্র সার্কের পর্যবেক্ষক। এছাড়া দক্ষিণ কোরিয়া, আমেরিকা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ইরান ও মরিশাসকে সার্কের পর্যবেক্ষকের মর্যাদা দেয়া হয়।[৪৭২]

সার্কের অবকাঠামো

সার্ক সনদে এ সংস্থার জন্য একটি পাঁচ স্তর বিশিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বিধান রাখা হয়েছে। এ কাঠামো হচ্ছে:-

১. সদস্য দেশসমূহের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানদের শীর্ষ সম্মেলন

সার্ক সনদ অনুযায়ী প্রতি বছরই এই শীর্ষ সম্মেলন হওয়ার কথা। নিয়ম অনুযায়ী সব সদস্য রাষ্ট্র বা সরকারের প্রতিনিধিত্ব ছাড়া সার্ক শীর্ষ সম্মেলন হতে পারে না। প্রতিষ্ঠার

৪৭০. *দৈনিক সংগ্রাম*, বুধবার ১০ ডিসেম্বর-২০১৪
৪৭১. *উইকিপিডিয়া*
৪৭২. *উইকিপিডিয়া*

পর এ পর্যন্ত সার্কের ১৮টি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত দু'বছর নেপাল সম্মেলন করতে পারেনি।[৪৭৩]

২. পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন

সদস্য রাষ্ট্রগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা সাধারণত বছরে দু'বার মিলিত হন। সম্ভব না হলে বছরে অন্তত একবার মিলিত হবেন। এ সম্মেলনগুলোতে বিভিন্ন এজেণ্ডা ও সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করা হয়।

৩. স্ট্যান্ডিং কমিটি

সদস্য রাষ্ট্রগুলোর পররাষ্ট্র সচিবদের সমন্বয়ে এ কমিটি গঠিত। সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলোর পরিকল্পনা, অনুমোদন, তদারকি ও সমন্বয় সাধন এ কমিটির প্রধান কাজ। এ কমিটি প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোনো সময় বৈঠকে বসবেন এবং সংস্থার কার্যাবলী সম্পর্কে স্ব স্ব দেশের মন্ত্রিপরিষদের কাছে নিয়মিত রিপোর্ট পেশ করবেন।

৪. টেকনিক্যাল কমিটি

সার্কের সব কর্মসূচি কতগুলো নির্দিষ্ট সহযোগিতার ক্ষেত্রের মাধ্যমে পরিচালিত। এসব কর্মসূচি টেকনিক্যাল কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধি নিয়ে এ কমিটি গঠিত হয়।

৫. সচিবালয়

সার্ক সনদের ৮নং ধারায় সার্ক সচিবালয় সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত সার্কের দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলনে সচিবালয়ের গঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। নেপালের রাজধানী কাঠমণ্ডুতে সার্ক সচিবালয় স্থাপন করা হয়েছে। ১৯৮৭ সালে এর কার্যক্রম শুরু হয়। সার্কের কর্মকান্ড পরিচালনার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করার ক্ষেত্রে সচিবালয় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে থাকে।[৪৭৪]

সার্কের মূলনীতি

সার্কের মূলনীতিগুলো হলো নিম্নরূপ:-

১. সার্কের যে কোনো সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত হতে হবে।

---

৪৭৩. *দৈনিক সংগ্রাম*, বুধবার ১০ ডিসেম্বর-২০১৪
৪৭৪. *প্রাগুক্ত*

২. দ্বিপক্ষীয় বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো এ সংস্থায় তোলা হবে না।

৩. প্রত্যেকটি সদস্য রাষ্ট্র পরস্পরের আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে, কেউ কারুর অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। তদুপরি তারা পারস্পরিক লাভালাভের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল থাকবে।

৪. এ অঞ্চলের দেশগুলোর আশা-আকাঙ্খক্ষার প্রতি লক্ষ্য রেখে সার্ক ভূমিকা পালন করবে।[৪৭৫]

পর্যালোচনা

সার্কের মূলনীতি বিষয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ভারত ৩নং বিষয়ে বারবার সার্কের স্বপ্নদ্রষ্টাদেশ বাংলাদেশের অখণ্ডতায় হস্তক্ষেপ করছে। সীমান্তে নির্বিচারে মানুষ হত্যা করছে, পানির ন্যায্য হিস্যা দিচ্ছে না। দেশের বিভিন্ন নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করার কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করছে। এছাড়াও প্রভাব বিস্তার করার জন্য আরো বিভিন্নমূখী তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে যা সুস্পষ্টভাবে সার্কের মূলনীতি বহির্ভূত। এ বিষয়ে বাংলাদেশ এবং সার্কের পক্ষ থেকে ভারতকে স্মরণ করিয়ে দেয়া দরকার।

সার্কের সহযোগিতার ক্ষেত্র

সার্কের সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে নিম্নরূপঃ

১. কৃষি ২. পল্লী উন্নয়ন ৩. স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা ৪. নারী উন্নয়ন ৫. পরিবেশ ও আবহাওয়া ৬. বনায়ন ৭. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ৮. মানবসম্পদ উন্নয়ন ৯. পরিবহন ও যাতায়াত ১০. পর্যটন ১১. ডাক ও তার ১২. শিশু অধিকার সংরক্ষণ ১৩. মাদক পাচার ও ব্যবহার রোধ ১৪. শিক্ষা, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি।[৪৭৬]

সার্ক সনদ

১৯৮৫ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় প্রথম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনেই অনুমোদিত হয় সার্ক সনদ। এ সনদের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হচ্ছেঃ-

১. দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের কল্যাণ সাধন এবং তাদের উৎকর্ষ বৃদ্ধি।

২. এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সামাজিক অগ্রগতি এবং সাংস্কৃতিক বিকাশ দ্রুততর করা।

---

৪৭৫. *প্রাগুক্ত*
৪৭৬. *প্রাগুক্ত*

৩. দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর যৌথভাবে আত্মনির্ভরশীলতার প্রসার ও শক্তিবর্ধনে সাহায্য করা।

৪. পরস্পরের সমস্যা অনুধাবন, পারস্পরিক বিশ্বাস ও বুঝাপড়ায় সাহায্য করা।

৫. অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, কারিগরি, বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে সক্রিয় সহযোগিতা এবং পারস্পরিক সাহায্যের পরিস্থিতি সৃষ্টি।

৬. অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের সঙ্গে সহযোগিতা বৃদ্ধি।

৭. সম স্বার্থ বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহের মোকাবিলায় নিজেদের মধ্যে সহযোগিতার প্রসার।

৮. অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণের জন্য অন্যান্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করা।[৪৭৭]

সার্কের সফলতা

দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সংস্থা সার্ক তৃতীয় দশকে পদার্পণ করেছে। সময়টা খুব দীর্ঘ না হলেও একটি আঞ্চলিক সংগঠনের পরিপক্কতার জন্য যথেষ্ট। এদিক থেকে সার্ককে মোটামুটিভাবে সফল বলা যায়। এ প্রতিষ্ঠানটি টিকে থাকার মতো যথেষ্ট সামর্থ্য দেখিয়েছে বলে মনে হয়। দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতার সম্প্রসারণের জন্য এটি একটি প্লাটফরম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ প্লাটফরম এ অঞ্চলে অরাজনৈতিক বিষয়ে সহযোগিতার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে। সার্কের একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে ওঠেছে যা আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। এর একটি আনুষ্ঠানিক সনদ রয়েছে এবং কাঠমুন্ডুতে সচিবালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সার্ক এ অঞ্চলে রাজনৈতিক নেতাদের থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সবাইকে একে অপরের কাছাকাছি আসার সুযোগ করে দিয়েছে। এর ফলে একে অন্যের সমস্যা, আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে জানতে পারছে। এতে অনেক ভুল বুঝাবুঝিরও অবসান ঘটানোর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।[৪৭৮]

সার্কের সাফল্যগুলো নিম্নরূপ

- প্রতিষ্ঠার পর থেকে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বড় কোনো সংঘাত হয়নি। এর কারণ সার্কের মূল্যবোধ।

৪৭৭. *প্রাগুক্ত*
৪৭৮. *প্রাগুক্ত*

- সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রায়ই আন্তর্জাতিক ফোরামে অভিন্ন নীতি গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে।
- সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বা সহযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- সার্কের আওতায় কৃষিতথ্য কেন্দ্র (Agricultural Information Centre), খাদ্য সুরক্ষণ ব্যবস্থাপনা ও দারিদ্র্য দূরীকরণের কমিশন গঠন সার্কের একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য।
- সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সাফ গেমস সার্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক বিষয়।
- সার্ক সদস্য দেশগুলোর সন্ত্রাস দমন সংক্রান্ত একটি কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছে। এটি কার্যকর হলে সদস্যভুক্ত দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ ও সীমান্তবর্তী সন্ত্রাস হ্রাস পাবে।
- সার্ক দেশগুলোর সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে UNCTAD-এর সঙ্গে সার্কের একটি সমঝোতা স্মারক, দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য ESCAP ও UNDP এর সঙ্গে এগ্রিমেন্ট, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জাপানের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক, শিশুদের অধিকার নিশ্চিতকরণ ও উন্নয়নের জন্য ইউনিসেফের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। আঞ্চলিক সংস্থা হিসেবে এ ধরনের পদক্ষেপ সার্কের অন্যতম সাফল্য।[৪৭৯]
- SAFTA চুক্তি সম্পাদন সার্কের একটি বড় ধরনের সাফল্য। সার্কভুক্ত দেশগুলোর অর্থনৈতিক সংযুক্তিকরণ এবং দক্ষিণ এশীয় বাণিজ্যে পারস্পরিক পক্ষপাতমূলক কাঠামো রচনার আলোকে এ চুক্তি সম্পাদিত হয়। ১৯৯৩ সালে SAFTA স্বাক্ষরিত হয় যা ১৯৯৫ সালে কার্যকর হয়। SAFTA এর আওতায় প্রতিটি পণ্যের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা যাচাই করে শুল্কহার কমিয়ে আনার প্রচেষ্টা নেয়া হয়। চাহিদাভিত্তিক একটি উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালনার স্বার্থে একাধিক দেশের উৎপাদনের উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বিকাশের একটি নতুন পরিবেশ তৈরি এবং একটি অভিন্ন বাজার প্রতিষ্ঠার গুরুত্বকে সার্ক স্বীকৃতি দিয়েছে। SAFTA এর একটি উদ্দেশ্য হলো ক্রমান্বয়ে আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্যের উদারীকরণ, যার মাধ্যমে SAFTA (South Asian Free Trade Area) বা মুক্তবাণিজ্য অঞ্চল গড়ে তোলার একটি স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে। ১৯৯৭ সালের ১২ থেকে ১৪ মে মালদ্বীপে অনুষ্ঠিত নবম শীর্ষ সম্মেলনে

---

৪৭৯. *সেমিনার প্রবন্ধ সংকলন*-২০১০ (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, প্রকাশকাল জানুয়ারী-২০১১) পৃ. ২১৯-২৩০

২০১১ সালের মধ্যে এশিয়াকে একটি মুক্তবাণিজ্য অঞ্চল এবং একটি অর্থনৈতিক গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। SAFTA এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে সম্পদ, সেবা, বিনিয়োগ এবং জনগণের মুক্ত যাতায়াত নিশ্চিত করবে। অবাধ বাণিজ্য অঞ্চল গঠনের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে SAFTA-এর আওতায় ২২৬ পণ্য এবং দ্বিতীয় দফায় ২০০ পণ্যের ১০% থেকে ৫০% শুল্ক কমানো হয়।[৪৮০]

- সার্কের উদ্যোগে সার্ক টিউবারকিউলোসিস সেন্টার (SAARC Tuberculosis Centre), সার্ক ডকুমেন্টেশন সেন্টার (SAARC Documentation Centre, সার্ক আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্র (SAARC Meta Research), প্রভৃতির মাধ্যমে এ অঞ্চলে উল্লিখিত বিষয়ের ওপর উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।
- চতুর্দশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে সার্ক পাসপোর্ট প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে সার্কভুক্ত দেশগুলোতে অবাধ চলাচল বৃদ্ধি পাবে। বিভেদের দেয়াল অর্থহীন হয়ে পড়বে এবং রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে জনবসতি ঘনত্বের সমতা আসবে। এছাড়া সম্মেলনে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে একটি অভিন্ন 'সার্ক মুদ্রা' চালুর প্রস্তাব রাখা হয়েছে। অভিন্ন সার্ক মুদ্রা চালু হলে উন্নত দেশের মুদ্রানীতির আধিপত্য থেকে দক্ষিণ এশিয়ার জনগণ রেহাই পাবে।
- সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চুর্তদশ সম্মেলনে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। এ ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস হবে নয়াদিল্লিতে, বাংলাদেশে হবে একটি শাখা ক্যাম্পাস। এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে সার্কভুক্ত অঞ্চলে শিক্ষার বিস্তার ঘটবে।[৪৮১]
- জরুরী খাদ্য সঙ্কট, খাদ্য ঘাটতি এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় সার্ক ফুড ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ ব্যাংকে থাকবে ২ লাখ ৪১ হাজার ৫৮০ মেট্রিক টন চাল ও গম।
- দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে পণ্য ও জনগণের অবাধ চলাচল নিশ্চিত করতে সার্ক দেশগুলোর রাজধানীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। চতুর্দশ সম্মেলনের মূল বিষয়বস্তু ছিল কানেক্টিভিটি বা যোগাযোগ।[৪৮২]

---

৪৮০. *প্রাগুক্ত*
৪৮১. *প্রাগুক্ত*
৪৮২. *প্রাগুক্ত*

- চতুর্দশ শীর্ষ সম্মেলনে সার্কের অবয়বগত পরিবর্তন ঘটেছে। কনিষ্ঠতম সদস্য হিসেবে আফগানিস্তানের অন্তর্ভুক্তি সার্ককে দক্ষিণ এশিয়ার পরিচিতির ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতা প্রদান করেছে। সার্ককে পূর্ণ অবয়বে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আফগানিস্তানের অন্তর্ভুক্তি অত্যন্ত ইতিবাচক দিক।
- দক্ষিণ এশিয়ার সার্কভুক্ত দেশগুলোতে উৎপাদিত ও বাজারজাত করা পণ্যের অভিন্ন মান নির্ণয় ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সার্কের দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক মান নিয়ন্ত্রণ সংস্থা স্থাপন করা হয়েছে। এর সদর দফতর ঢাকা।
- নারী ও শিশু উন্নয়ন, শান্তি প্রতিষ্ঠা, দারিদ্রতা দূরীকরণ, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এসব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য ২০০৪ সাল থেকে সার্ক অ্যাওয়ার্ড দেয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
- সার্ক এর পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শীর্ষ সম্মেলনে সদস্য দেশগুলোর উন্নয়নের লক্ষ্যে ত্রিশটিরও বেশি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।[৪৮৩]

সার্ক কার্যক্রমের একটি বিশ্লেষণ

প্রতিষ্ঠার পর থেকে গত প্রায় তিন দশকে সার্কের আওতায় প্রায় তিন ডজন চুক্তি এবং অনেকগুলো ঘোষণা আসলেও তার অধিকাংশই বাস্তবায়নের মুখ দেখেনি। ২০০০ সালের মধ্যে এ অঞ্চলের প্রতিটি মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য সার্ক যে অঙ্গীকার করেছিল তা যেমন বাস্তবায়িত হয়নি তেমনি ২০০২ সালের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়াকে দারিদ্র্যমুক্ত করার ঘোষণাও এখনো স্বপ্নই রয়ে গেছে। বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে SAPTA ও SAFTA-র মতো চুক্তি করা হলেও গত ৩০ বছর দক্ষিণ এশিয়ায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বেড়েছে মাত্র ৫.৮ শতাংশ। সন্ত্রাস দমনে একযোগে কাজ করার কথা থাকলেও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিস্তার ও উৎস নিয়ে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহের বেড়াজাল। পক্ষান্তরে সদস্য দেশগুলোর সাধারণ মানুষ মনে করে যে, প্রতিষ্ঠার পর থেকে সার্ক নেতৃবৃন্দ যে সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা বাস্তবায়িত হলে দক্ষিণ এশিয়ার চেহারা পাল্টে যেত। অনেকে মনে করেন সদস্য দেশগুলোর পারস্পরিক অবিশ্বাস, তাদের মধ্যে সম্প্রীতির অভাব এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্ব সার্ককে অনেকটাই অকার্যকর করে তুলেছে।[৪৮৪]

বাংলাদেশের উদ্যোগে ১৯৮৫ সালে ঢাকায় দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশ নিয়ে সার্কের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। ২০০৭ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত চতুর্দশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে

---

৪৮৩. *প্রাগুক্ত*
৪৮৪. *প্রাগুক্ত*

আফগানিস্তানকে অষ্টম সদস্য দেশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইতোমধ্যে গত ৩০ বছরে সার্কের আওতায় ২৬টি চুক্তি এবং ১৮টি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হয়েছে। সার্ক দেশগুলোর মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ানোর জন্য সাপটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পরের বছর থেকে তা কার্যকর করার কথা থাকলেও স্পর্শকাতর পণ্যের তালিকা নিয়ে দুই প্রভাবশালী সদস্য রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানের অনমনীয় দৃষ্টিভঙ্গির কারণে চুক্তিটির বাস্তবায়ন আজো আটকে আছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে ভারতের বেনিয়া ও সংরক্ষণনীতি। এছাড়াও আছে স্পর্শকাতর পণ্যের তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সদস্য রাষ্ট্রগুলো পরস্পর পরস্পরকে ছাড় না দেয়ার প্রবণতা। ফলে আন্তঃবাণিজ্য সম্প্রসারণ কঠিন হয়ে পড়েছে। ১৯৮৫ সালে সার্ক যখন যাত্রা শুরু করেছিল তখন এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্যের হার ছিল ৩.২ শতাংশ। ৩০ বছর পর এখন এ হার মাত্র ৫.৮ শতাংশ। পক্ষান্তরে আসিয়ানের (ASEAN) ক্ষেত্রে আন্তঃবাণিজ্যের হার ২৫ শতাংশ এবং ইউরাপীয় ইউনিয়নের ক্ষেত্রে তা ৬০ শতাংশের বেশি, সার্কের আওতায় প্রথমে সাপটা ও পরে সাফটা স্বাক্ষরের পরও আন্তঃবাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি আসেনি। বস্তুতঃ ইউরোপীয় ইউনিয়নের আদলে দক্ষিণ এশীয় ইউনিয়ন গঠনের উদ্যোগের কথা বলা হলেও সার্ক দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড এখনও খুব কম। এর আগের কয়েকটি শীর্ষ সম্মেলনে দক্ষিণ এশিয়ার সাধারণ মানুষের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির অঙ্গীকার করা হলেও আশানুরূপ তেমন অগ্রগতি আসেনি। নিকট প্রতিবেশী হওয়া সত্ত্বেও সার্ক দেশগুলোর সাধারণ মানুষ পরস্পর পরস্পরের বন্ধু হতে পারেনি।[৪৮৫]

প্রায় প্রতিটি সম্মেলনে সন্ত্রাস দমনে সার্ক নেতারা জোরালো অঙ্গীকার করলেও বাস্তবে এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নে ফলপ্রসূ কেনো পদক্ষেপের অভিব্যক্তি ঘটেনি। বরং বড় একটি সদস্য দেশ প্রতিবেশী দেশগুলোতে সন্ত্রাস সৃষ্টিতে মদদ দেয়ার অভিযোগ ওঠেছে। বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং মাওবাদী সন্ত্রাসে জর্জরিত এ দেশটি নিজ দেশে সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থ হয়ে তা অন্যদেশে রফতানি করে তার ভার লাঘবে এখন বদ্ধপরিকর। প্রতিবেশি দেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় দেশটি সন্ত্রাসকে এখন পুঁজি হিসেবে গ্রহণ করেছে বলে অনেকে মনে করেন। সন্ত্রাসের বিস্তার ও সন্ত্রাসীদের আশ্রয় নিয়ে প্রতিবেশি দেশসমূহের মধ্যে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ চলছে।[৪৮৬]

সার্কের চ্যালেঞ্জসমূহ

১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ঐক্যবদ্ধভাবে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে ৭টি দেশের অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর মোকাবেলা এবং সমৃদ্ধি ও প্রবৃদ্ধির হার ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে

---

৪৮৫. *প্রাগুক্ত*
৪৮৬. *প্রাগুক্ত*

সার্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ সাতটি দেশ পরস্পর পরস্পরের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী এবং অত্যন্ত কাছাকাছি অবস্থিত হলেও ইউরোপীয় ইউনিয়ন কিংবা আসিয়ানের ন্যায় তাদের মধ্যে আন্তঃবাণিজ্যের হার বৃদ্ধি পায়নি, বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং সদস্য দেশগুলোর মধ্যে নতুন বাজার সৃষ্টি, দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনৈতিক অগ্রগতির পূর্বশর্ত। এ শর্ত পূরণে আঞ্চলিক এ সংস্থাটির ভূমিকা অত্যন্ত সীমিত বলে প্রতীয়মান হয়। সদস্য দেশগুলোর ওপর ভারতের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রবণতা এর জন্য প্রধানতঃ দায়ী।[৪৮৭] সার্কের সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যের সমস্যাও রয়েছে। একটি বড় ও শক্তিধর দেশ হিসেবে ভারত অন্যান্য দেশগুলোকে সার্কের সম অংশীদার বলে মনে করে না। সার্ক দেশসমূহের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যের অভাব, প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে ভারত সম্পর্কে তিক্ততা ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রবণতা আঞ্চলিক এ জোটের ঐক্য ও সংহতিকে বাধাগ্রস্ত করছে। এর ফলে বাণিজ্যিক চুক্তিসমূহের ফলপ্রসূ বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে পড়েছে। এতে করে সদস্য দেশগুলোকে জোট ও চুক্তির বাইরে এসে একক ও দ্বিপাক্ষিক উদ্যোগ গ্রহণ করে স্বস্ব বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করতে দেখা যায়।[৪৮৮]

সার্কের তিন দশকের কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে আরো দেখা যায় যে, দক্ষিণ এশিয়ার আর্থ সামাজিক নীতির স্থপতি হিসেবে নয়, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও সম্মেলনের মাধ্যমে আঞ্চলিক আলাপ-আলোচনা উৎসাহিত করার একটি ফোরাম হিসেবেই সার্কের কর্মকাণ্ড বেশি পরিচিতি লাভ করেছে। একটি আঞ্চলিক সংস্থা বা জোট হিসেবে এ প্রতিষ্ঠানটির কার্যকারিতা কতিপয় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। সার্কের কাঠামোটি প্রকৃতপক্ষে আঞ্চলিক সহযোগিতার অনুকূল নয়। সার্ক শীর্ষ সম্মেলনই হচ্ছে সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক কর্তৃপক্ষ। শীর্ষ সম্মেলনের অংশীদার যে কোনও একটি দেশ অনীহা প্রকাশ করলে সম্মেলন পণ্ড হয়ে যেতে পারে। কার্যত হয়েছেও তাই। সার্ক প্রতিষ্ঠার পর থেকে গত ৩২টি বছরে এর সনদ অনুযায়ী ৩২টি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার কথা থাকলেও হয়েছে মাত্র ১৮টি। অবশিষ্ট ১৪টি হয়নি। এর প্রধান কারণ ভারতের বিরোধিতা।[৪৮৯] ভৌগোলিক আয়তন, অর্থনৈতিক অবস্থা, সামরিক শক্তি এবং আন্তর্জাতিক প্রভাব এর সব ক'টি দৃষ্টিকোণ থেকেই ভারত দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে একটি শক্তিধর দেশ। এ প্রেক্ষিতে আঞ্চলিক আধিপত্যবাদী একটি শক্তি হিসেবে ভারতের সম্ভাবনা আসিয়ানের তুলনায় সার্ককে একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জোটে পরিণত করেছে। সার্ক ভারতীয় আধিপত্যবাদের খপ্পরে পড়ে যাবে এ ভয়ে প্রাথমিক অবস্থায় পাকিস্তান এতে যোগ দিতে চায়নি। ভারত সার্ককে তার স্বার্থ উদ্ধারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের একাধিক নযিরও

---

৪৮৭. *প্রাগুক্ত*
৪৮৮. *প্রাগুক্ত*
৪৮৯. *প্রাগুক্ত*

ইতোমধ্যে স্থাপন করেছে। এর ট্রানজিট ও আঞ্চলিক হাইওয়ে এবং কানেক্টেভিটি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রকৃতপক্ষে ছিল ভারত প্রভাবিত। বাংলাদেশের ওপর দিয়ে তার উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সংঘাত মুখর রাজ্যগুলোতে উৎপাদিত পণ্যের আনা নেয়া নিশ্চিতকরণই ছিল এর লক্ষ্য। প্রতিবেশী প্রত্যেকটি সদস্যদেশ সার্ক এর ওপর ভারতীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার বিরোধী; তাদের ধারণা এর ফলে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহেযাগিতার পরিবেশ ক্ষুণ্ন হতে বাধ্য। আবার ভারতের তরফ থেকে কয়েকটি প্রতিবেশী দেশকে নাম মাত্র কয়েকটি প্রস্তাব দেয়া ছাড়া দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর ভয় ও আশংকা দূর করার কোনও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। তাদের প্রতি ভারতের আচরণ কখনো বন্ধুসুলভ ছিল না, এখনো নেই।[৪৯০]

অভিন্ন অন্তর্জাতিক নদী উজানে বাঁধ দিয়ে ভারত বাংলাদেশে কৃষি ব্যবস্থা ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। পাকিস্তান, নেপাল ও ভুটানও তার আগ্রাসনের শিকার। বাংলাদেশের সাথে ভারতের দীর্ঘ মেয়াদী সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে সমুদ্র সীমা নির্ধারণ নিয়ে বিরোধ, আন্তর্জাতিক নদীসমূহের পানি ভাগাভাগি ও ব্যবস্থাপনা সমস্যা, সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ, সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক হরহামেশা বিনা উস্কানিতে গুলী বর্ষণ, বাংলাদেশীদের হত্যা ও তাদের ছত্রছায়ায় বাংলাদেশ ভূখণ্ডে ঢুকে ভারতীয়দের জমি দখল, চাষাবাদ, লুটপাট প্রভৃতি। এ সমস্যাগুলো জিইয়ে রেখে ভারত কৌশলে বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে বন্দর, করিডোর, ট্রানজিট, গ্যাস, ফেনি নদীর পানি ও কয়লা ব্যবহারের সুবিধা আদায় করে নিয়েছে যা দেশের ১৬ কোটি মানুষ সহজভাবে মেনে নিতে পারছে না। সাধারণ মানুষের এ প্রতিক্রিয়া উভয় দেশের জনগণের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় বাধা হয়ে রয়েছে যা সার্ক এর দর্শনকে দুর্বল করছে। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে রয়েছে বিশাল ঘাটতি। আনুষ্ঠানিক বাণিজ্যে এ ঘাটতির পরিমাণ গড়ে বছরে প্রায় ১৮ হাজার কোটি টাকা। অনানুষ্ঠানিক বাণিজ্য বিশেষ করে চোরা কারবারকে অন্তর্ভুক্ত করা হলে এর পরিমাণ বছরে ৬০ হাজার কোটি টাকা অতিক্রম করে। সার্ক এর সাপটা, সাফটা কিংবা উভয় দেশের মধ্যে সম্পাদিত কোনও প্রকার বাণিজ্য চুক্তিই এই ব্যবধান হ্রাস করতে পারছে না। ভারতের শুল্ক ও শুল্ক বহির্ভূত বিধি নিষেধ এর জন্য প্রধানত দায়ী।[৪৯১]

---

৪৯০. *প্রাগুক্ত*
৪৯১. *প্রাগুক্ত*

চতুর্দশ অধ্যায়

মুসলিম চিন্তা নায়কদের কয়েকজন ও তাঁদের ঐক্য প্রচেষ্টা

- **বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী (র.)**

গত শতাব্দির শুরুর দিকে ইসলামী খিলাফত তথা উসমানী খিলাফার সর্বশেষ সূর্য যেখানে অস্তমিত হয় তার মূল কেন্দ্র ছিল বর্তমান তুরস্ক। যা এশিয়া ও ইউরোপ দু'টি মহাদেশের সংযোগ স্থলে অবস্থিত। আর এ দেশের তাওহীদি জনতার হৃদয়ের স্পন্দন ছিলেন তুর্কিদের আধ্যাত্মিক নেতা ও সু-পুরুষ রণাঙ্গনের বীর বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী (র.)। তিনি খিলাফা হারিয়ে যাওয়া দেশে ইসলামের বাতিকে প্রজ্জলিত রাখার জন্য তৎকালিন তুরস্কে সর্বোচ্চ চেষ্টা সাধনা করতে থাকেন। তারই অংশ হিসেবে তিনি রচনা করেন মহাগ্রন্থ আল কুর'আনের অমর ব্যাখ্যা সমেত সাহিত্য সম্ভার 'রিসালায়ে নূর'। কালজয়ী অনেকগুলো প্রবন্ধের মাঝে তিনি এতে দু'টি প্রবন্ধ রচনা করেন। একটি মুসলিমদের ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব সংক্রান্ত বিষয়ে। এতে অত্যন্ত দরদ মাখা হৃদয় দিয়ে খিলাফা হারানো ভগ্নহৃদয়ের মু'মিনদেরকে ইসলামী ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব এবং ভালোবাসার দিকে আহ্বান জানান। তিনি এতে যা উল্লেখ করেন তা নিম্নরূপ:-

মুমিনদের ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ

"মুমিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে।"[৪৯২]

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

"আর ভালো ও মন্দ সমান নয়। জবাবে তাই বলুন যা উৎকৃষ্ট। তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে সেও যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু।[৪৯৩]

৪৯২. আল কুরআন, ৪৯:১০

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَّ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

> "যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে। বস্তুত আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকেই ভালোবাসেন।"[৪৯৪]

মু'মিনদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে ঝগড়া-বিবাদ, দলাদলি, রেষারেষি ও হিংসা পরস্পরের মাঝে বিদ্বেষ ও বৈরীতার জন্ম দেয়। মহোত্তম মানবধর্ম ইসলামের হেকমত এ সাক্ষ্য দেয় যে, পারস্পরিক বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করা জঘন্য ও ক্ষতিকর বিষয়। এগুলো মানুষের জীবনে বিষের মতো। উপরোল্লিখিত বিদ্বেষ ও শত্রুতার অগণিত আঙ্গিকের মধ্য থেকে লেখক এখানে ছয়টি আঙ্গিকের আলোচনা করেছেন।[৪৯৫]

১. একটি দোষের কারণে কোনো মু'মিনকে ঘৃণা করা যায় না

বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলেই বুঝা যায় যে, মু'মিনদের পরস্পরের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ এবং ঘৃণা ও শত্রুতা পোষণ করা অনেক বড় অপরাধ। লেখক এতে উল্লেখ করেন, 'মু'মিনদের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা পোষণকারী হে অবিবেচক! মনে কর তুমি একটি জাহাজে কিংবা বাড়িতে নয়জন নির্দোষ ও একজন দোষী ব্যক্তির সাথে অবস্থান করছ। এখন কেউ যদি ঐ একজন দোষী ব্যক্তির কারণে জাহাজটিকে ডুবিয়ে দিতে চায় অথবা বাড়িটিতে আগুন দিতে উদ্যত হয় তাহলে নিশ্চই তুমি বুঝতে পারছ যে, কাজটি কতো বড় অন্যায় হিসেবে বিবেচিত হবে। তুমি অবশ্যই এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে গগণবিদারী ফরিয়াদ করবে। এমনকি যদি ঐ জাহাজে একজনও নির্দোষ ব্যক্তি এবং নয়জন দোষী ব্যক্তি থাকতো তবুও তো জাহাজটিকে ডুবিয়ে দেয়া ইনসাফের পরিপন্থি হতো।[৪৯৬]

তেমনি একজন মু'মিন ব্যক্তি যাকে রব্বানী ঘর[৪৯৭] এবং ইলাহী জাহাজের[৪৯৮] মতো, তার মাঝে শুধু নয়টি নয় বরং ঈমান, ইসলাম এবং সংশ্লিষ্ট মনোভাব ইত্যাদির মতো আরো বিশটিরও অধিক নিষ্কলুষ গুণাবলি রয়েছে। তা সত্ত্বেও এখন যদি তার মধ্যে একটি মাত্র দোষ পাওয়া যায়, যা তোমার ক্ষতির কারণ হয় অথবা তোমাকে অসন্তুষ্ট করে অথবা একটি মাত্র অপরাধমূলক স্বভাব পাওয়ার কারণে যদি তুমি তার আধ্যাত্মিক শরীরকে ধ্বংস ও পোড়াতে উদ্যত হও এবং অনিষ্ট করে ডুবিয়ে দিতে উদ্যত হও অথবা এমন

---

৪৯৩. আল কুরআন, ৪১:৩৪
৪৯৪. আল কুরআন, ০৩:১৩৪
৪৯৫. বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী, *মাকতুবাত* (ঢাকা, উত্তরা, লিবার্টি প্রকাশনী, প্রকাশকাল, মে-২০১৩), পৃ. ৪৪
৪৯৬. *প্রাগুক্ত*
৪৯৭. রবের ঘর অর্থাৎ আল্লাহর ঘর
৪৯৮. আল্লাহর জাহাজ

কোনো আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করো তাহলে তুমি নিজেও তার মতো চরম নিষ্ঠুর ও নির্দয় হিসেবে গণ্য হবে।'[৪৯৯]

২. কোনো মুসলিমের সাথে কথা বন্ধ করা উচিত নয়

এমনিভাবে জ্ঞান ও বিবেচনার দৃষ্টিতেও হিংসা, বিদ্বেষ, দলাদলি, রেষারেষি ও ঝগড়া-বিবাদ অন্যায় কাজ। কেননা সকলেই জানেন যে, শত্রুতা ও ভালোবাসা হচ্ছে দু'টি বিপরীত বিষয়। যেমন আলো ও আধার বিপরীত বিষয়। বাস্তবিক অর্থে শত্রুতা ও ভালোবাসার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে এ দু'য়ের মাঝে সামঞ্জস্য ঘটানো সম্ভব নয়।

ভালোবাসার কারণসমূহ যদি অন্তরে সত্যিকারভাবে সুদৃঢ় হয় তাহলে শত্রুতা রূপক ও কাল্পনিক হয়ে যায় তাহলে অন্তরে কোনো শত্রুতা থাকে না। এর পর শত্রুতা সহমর্মিতায় পরিণত হয়। হ্যাঁ, একজন মু'মিন তার ভাইকে ভালোবাসে। কিন্তু কোনো মু'মিনের মাঝে মন্দ কিছু দেখলে অন্য মু'মিন ব্যথিত হবে এটাই স্বাভাবিক। তবে তার প্রতি রূঢ় আচরণ না করে বরং তাকে সংশোধনের প্রচেষ্টায় তার দিকে করুণার হাত বাড়িয়ে দেয়া উচিত। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন:-

'কোন মু'মিনের উচিৎ নয় অন্য মু'মিন ভাইয়ের উপর রাগ করে তার সাথে তিন দিনের বেশী কথা না বলা।'[৫০০] পরস্পরের সাক্ষাত হলে একজন আরেকজন থেকে মুখ ফিরিয়ে না নেয়া। তাদের মধ্যে সে-ই উত্তম যে প্রথমে সালাম দিয়ে কথা বলে।'

পক্ষান্তরে অন্তরে যদি শত্রুতার কারণসমূহ প্রাধান্য লাভ করে এবং বিজয়ী হয় তাহলে অন্তরে শত্রুতা দৃঢ়তা লাভ করে এবং ভালোবাসা ও সহমর্মিতা তখন রূপক ও কাল্পনিক হয়ে যায়। অন্তরে ভালোবাসা ও সহমর্মিতা থাকে না। এরপর ভালোবাসা ও সহমর্মিতা কৃত্রিম ও লোকদেখানোর মতো হয়ে যায়।

হে বে-ইনসাফী ব্যক্তি! এখন দেখো, মু'মিন ভাইয়ের প্রতি ঘৃণা ও শত্রুতা পোষণ করা কত বড় অন্যায়। কারণ, যেমনিভাবে সাধারণ ছোটো পাথরকে কা'বা থেকে মূল্যবান এবং উহুদ পাহাড়ের চেয়ে বেশি সম্মানিত মনে করলে তুমি চরম বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দিবে। ঠিক তেমনিভাবে সম্মানের দিক দিয়ে কা'বার সমতুল্য ঈমান এবং উহুদ পাহাড়ের ন্যায় বিশাল ইসলামের অনেক বৈশিষ্ট্য ভালোবাসা ও ঐক্যকে আহ্বান করে। তা সত্ত্বেও একজন মু'মিনের বিরুদ্ধে শত্রুতার কারণে সামান্য পাথরতুল্য কিছু ত্রুটিকে ঈমান ও

---

৪৯৯. বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী, *মাকতুবাত* (ঢাকা, উত্তরা, লিবার্টি প্রকাশনী, প্রকাশকাল, মে-২০১৩), পৃ. ৪৪

৫০০. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫৭, ৬২ ; *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৩, ২৫, ২৬; *সুনানে আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, হাদীস ৪৭; *সুনানে তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২১ ; *মুসনাদে আহমাদ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১/১৭৬, ১৮৩; ৩/১১০, ১৬৫, ১৯৯, ২০৯, ২২৫; ৪/২০, ৩২৮; ৫/৪১৬, ৪২১, ৪২২

ইসলামের উপর স্থান দেয়া খুবই বড় ধরনের অন্যায় ও নির্বুদ্ধিতা এবং বড় এক অবিচার। তোমার বিবেক-বুদ্ধি থাকলে তুমি তা অবশ্যই বুঝতে পারবে।[৫০১]

হ্যাঁ, ঈমানের ঐক্য অবশ্যই অন্তরের ঐক্যকে দাবি করে এবং ই'তিকাদ ও বিশ্বাসের ঐক্য সামাজিক ঐক্যকেও আবশ্যক করে তোলে। কারো সাথে একই সৈন্যদলে অবস্থান করায় তার প্রতি গভীর বন্ধুত্বের বন্ধন অনুভব করছ এবং একই সেনাপ্রধানের অধীনে থাকায় তার প্রতি সহমর্মিতার হাত প্রসারিত করছ। তেমনিভাবে একই শহরে থাকায় ভ্রাতৃত্বময় এক সম্পর্ককে উপলব্ধি করছ। তুমি এ বিষয়টিকে অস্বীকার করতে পারো না। অথচ ঈমান-প্রদত্ত নূর ও সচেতনতা তোমাকে দেখাচ্ছে ও জানাচ্ছে যে, মু'মিনদের মাঝে আল্লাহর নামসমূহের সমপরিমাণ ঐক্যের সংযোগ এবং একতার বন্ধন ও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক বিদ্যমান।

উদাহরণস্বরূপ, তোমাদের দু'জনের স্রষ্টা এক, মালিক এক, উপাস্য এক এবং তোমাদের রিযিকদাতাও এক ও অভিন্ন। এমনিভাবে হাজারো জিনিস তোমাদের জন্য এক ও অভিন্ন। তোমাদের নবী এক, দীন এক এবং কেবলাও এক ও অদ্বিতীয়। এরূপ শত শত জিনিস তোমাদের জন্য এক ও অদ্বিতীয়। তোমাদের গ্রাম এক, দেশ এক, প্রদেশ এক; এমন আরো দশ দিক এক। এত কিছু এক, ঐক্য ও মিল ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বকে প্রয়োজনীয় করে তোলে এবং বিশ্বজগত ও গ্রহ-নক্ষত্রকে অদৃশ্য এক শিকল-বন্ধনে পরস্পরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত করার শক্তি বহন করে। অতএব, অনৈক্য ও কপটতা এবং ঘৃণা ও শত্রুতা পোষণ করা এবং মাকড়সার জালের ন্যায় মূল্যহীন ও ক্ষণস্থায়ী কিছুকে গ্রহণ করা মারাত্মক বোকামি। তাছাড়া প্রকৃত অর্থেই মু'মিনের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও ঘৃণা পোষণ করা সে ঐক্যের বন্ধনের প্রতি অবজ্ঞা করা এবং ভালোবাসার কারণসমূহের প্রতি অবহেলা এবং ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের প্রতি অনেক বড় অন্যায় ও অবিচার। তোমার অন্তরের মৃত্যু না হলে এবং বিবেক-বুদ্ধি নিষ্প্রভ না হয়ে থাকলে তুমি নিজেও তা বুঝতে পারবে।[৫০২]

৩. কারো দোষের কারণে তার নিকটাত্মীয়দেরকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰى

"কেউ অন্যের বোঝা বহন করবে না।"[৫০৩]

৫০১. বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী, *মাকতুবাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫
৫০২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫-৪৬
৫০৩. আল কুরআন, ০৬:১৬৪

এ আয়াত নিখাদ সুবিচারকে ব্যক্ত করে। এ আয়াতের রহস্য অনুযায়ী কোনো এক মু'মিন ভাইয়ের একটি মাত্র দোষের কারণে তার অন্যান্য সুন্দর গুণকে অস্বীকার করে তার প্রতি শত্রুতা ও ঘৃণা পোষণ করা অনেক বড় অন্যায়। বিশেষ করে কোনো মু'মিনের মাত্র একটি দোষের কারণে তার ওপর রাগ হয়ে তার নিকটাত্মীয়দের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা –এটা তো আরো বড় অন্যায়। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

"নিশ্চই মানুষ অতিমাত্রায় সীমালঙ্ঘনকারী, বড় অকৃতজ্ঞ ।"[৫০৪]

এ আয়াতের মধ্যে কঠোর ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে যে, মানুষ অনেক বেশি অন্যায়কারী, সীমালঙ্ঘনকারী ও অকৃতজ্ঞ। বাস্তবতা, ইসলামের জ্ঞান ও দর্শন এবং শরিয়াত এ বিষয়টিই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। নিজের দোষের দিকে না তাকিয়ে বরং তোমার মু'মিন ভাইয়ের দোষের কারণে তার আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠদেরকে দোষী সাব্যস্ত করে কীভাবে নিজেকে সঠিক মনে করছ? "তাদের সাথে শত্রুতা করার অধিকার আমার আছে" একথা কীভাবে বলছ? বাস্তবতার দৃষ্টিতে শত্রুতা ও মনের কুকর্মসমূহ মন্দ ও মাটির মতো অসচ্ছ। এগুলো অন্যদের মাঝে সংক্রামিত না হওয়া প্রয়োজন। অন্য কেউ এর থেকে শিক্ষা নিয়ে মন্দ কাজ করলে সেটা ভিন্ন কথা। ভালোবাসার কল্যাণকর উপকরণসমূহ ভালোবাসার মতোই নূরানী। তাই এটি অবশ্যই সংক্রামিত ও প্রতিফলিত হয়ে থাকে। এজন্যেই "বন্ধুর বন্ধুকে বন্ধু হিসেবে গণ্য করা হয়।" কথাটি প্রবাদ হিসেবে আজও প্রচলিত।[৫০৫]

৪. ব্যক্তিগত জীবনেও মুসলিমের সাথে শত্রুতা পোষণ করা অন্যায়

ব্যক্তিজীবনের দৃষ্টিকোণ থেকেও কোনো মুসলিমের সাথে শত্রুতা পোষণ করা এবং ঘৃণা করা অনেক বড় অন্যায়। এ চতুর্থ আঙ্গিকের ভিত্তি হিসেবে নিচের কয়েকটি নীতি অনুসরণ করা।

ক) শুধু নিজের মতপথকেই সঠিক মনে না করা উচিত

সাঈদ নূরসী (র.) তাঁর রিসালায় আরো উল্লেখ করেন, 'তুমি যদি তোমার মতপথ ও চিন্তাধারায় সত্যের অনুসারী হয়ে থাক তাহলে "আমার পথ সত্য ও আরো সুন্দর" একথা বলার অধিকার তোমার আছে। তবে "একমাত্র আমার পথই সঠিক" একথা বলার অধিকার তোমার নেই।"

৫০৪. আল কুরআন, ১৪:৩৪
৫০৫. বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭

وَعَيْنُ الرِّضَا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ قَلِيْلَةٌ . وَلَكِنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تُبْدِى الْمَسَاوِيَا

> "সন্তুষ্টির দৃষ্টিতে দোষ-ত্রুটি ধরা পড়ে না। কিন্তু ক্রোধের দৃষ্টি ভুলত্রুটিকেই খুঁজে বেড়ায়।"[৫০৬]

এ কথার উদ্দেশ্য হলো এই যে, তোমার বে-ইনসাফী দৃষ্টিভঙ্গি ও নিচু মনোভাব কখনও সকল বিষয়ে সুষ্ঠু বিচার করতে পারবে না এবং অন্যের মতপথকে বাতিলও করতে পারবে না।

খ) সত্য বলবে তবে সব সত্য বলা সঠিক নয়

তোমার দায়িত্ব হল, যা তুমি বলবে সঠিক বলবে। কিন্তু সব সঠিক কথা বলা তোমার জন্য সঙ্গত নয়। তোমার সব কথাই সত্য হওয়া উচিত। কিন্তু সব সত্যই বলা সঠিক নয়। কারণ, তোমার মতো আন্তরিক ও বিশুদ্ধচিত্তের অধিকারী নয় এমন যে কেউ উপদেশ সাদরে গ্রহণ না করে বরং বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করবে।

গ) মু'মিনের মহানুভব হওয়া উচিত

শত্রুতা যদি করতেই চাও তবে তোমার মনের ভিতরের শত্রুর বিরুদ্ধে শত্রুতা কর। এটাকে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা কর। তোমার সবচেয়ে বেশী যা ক্ষতি সাধন করে তা হল নাফসে আম্মারা তথা কুমন্ত্রক আত্মা এবং মনের অহেতুক চাহিদা। এদের সাথে শত্রুতা কর। এদেরকে সংশোধন করার চেষ্টা কর। এ ক্ষতিকর নাফসের কারণে মু'মিনদের সাথে শত্রুতা পোষণ করো না। শত্রুতা যদি করতেই হয় তাহলে কাফির ও যিন্দিক-ই যথেষ্ট। তাদের বিরোধিতা করো। হ্যাঁ, ভালোবাসার গুণাবলি যেমন ভালোবাসা লাভের যোগ্য তেমনিভাবে শত্রুতার গুণাবলিও শত্রুতার মুখোমুখী হওয়ার যোগ্য। যদি তোমার শত্রুকে পরাজিত করতে চাও তবে তার মন্দ দিকগুলোর সাথে তোমার ভালো দিকগুলোর মোকাবেলা করো। কারণ তুমি যদি তাকে মন্দ দিয়ে মোকাবেলা করো তাহলে শত্রুতা আরো বৃদ্ধি পাবে। এক্ষেত্রে বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদি তোমার শত্রু পরাজিতও হয়, তারপরেও সে তার মনের মধ্যে বিদ্বেষ পোষণ করবে এবং শত্রুতা অব্যাহত রাখবে। কিন্তু যদি তাকে ভালো দিয়ে মোকাবেলা করো তাহলে সে অনুতপ্ত হবে এবং তোমার বন্ধু হবে।[৫০৭]

اِذَا اَنْتَ اَكْرَمْتَ الْكَرِيْمَ مَلَكْتَهُ . وَاِنْ اَنْتَ اَكْرَمْتَ اللَّئِيْمَ تَمَرَّدَا

---

৫০৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮, উদ্ধৃত; *আদাবুদ দুনইয়া ওয়াদ দীন*, আলি মাওয়ারদী, পৃ. ১০; উদ্ধৃত; *দিওয়ানুশ শাফেয়ী*, পৃ. ৯১

৫০৭. বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

"যখন তুমি সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মান করলে, সে তোমার আপন হবে, কিন্তু নিচু স্বভাবের মানুষকে সম্মান দিলে সে উদ্ধত ও অহঙ্কারী হবে।"[৫০৮]

এ মূলনীতি অনুযায়ী, মু'মিনের মহানুভব হওয়া দরকার। তার মহানুভবতা দেখেই শত্রুরা তার অনুগত হবে। বাহ্যিকভাবে কেউ নীচু মনের অধিকারী হলেও ঈমানের দিক থেকে দয়া পাওয়ার যোগ্য। প্রায়ই দেখা যায় যে, কোনো খারাপ লোককে যদি বারবার বলা হয় "তুমি ভালো, তুমি ভালো', তাহলে সে ভালো হয়ে যায় এবং কোন ভালো লোককে যদি বারবার বলা হয় "তুমি খারাপ, তুমি খারাপ," তাহলে সে খারাপ পথেই থেকে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:-

وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا

"এবং যখন তারা অসার ক্রিয়া কর্মের সম্মুখীন হয়, তখন মান রক্ষার্থে ভদ্রভাবে চলে যায়।"[৫০৯]

وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٍ

"যদি মার্জনা করো, উপেক্ষা করো এবং ক্ষমা করো, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল এবং করুণাময়।"[৫১০]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

"আর ভালো ও মন্দ সমান নয়, উৎকৃষ্ট দিয়ে মন্দকে দূর কর। তখন যাদের সাথে তোমার শত্রুতা আছে, সেও হয়ে যাবে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত।"[৫১১]

সুতরাং সকল মু'মিনের উচিৎ আল কুর'আনের উপরোক্ত পবিত্র নীতিমালা অনুধাবন করা। কারণ এতেই প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তা নিহিত রয়েছে।

ঘ) হিংসার ফলে হিংসুক নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়

---

৫০৮. *প্রাগুক্ত*, উদ্ধৃত; সৎ ও সম্মানের অধিকারী কারো উপকার করলে তার মন জয় করা যায়। অসৎ কারো কল্যাণ করলে সে আরো বেশী বেপরোয়া হয়ে যায়। আল উরফুত-তায়্যিব ফি শারহি দিওয়ানিত তায়্যিব ২/৭১০

৫০৯. আল কুরআন, ২৫:৭৯

৫১০. আল কুরআন, ৬৪:১৪

৫১১. আল কুরআন, ৪১:৩৪

হিংসা-বিদ্বেষকারীরা নিজেদের প্রতি, তাদের দ্বীনি ভাইদের প্রতি এবং আল্লাহর রহমতের প্রতি অবিচার ও সীমালঙ্ঘন করে। কারণ এ ধরনের মানুষ তাদের হিংসা ও শত্রুতা দ্বারা নিজেকে বেদনাদায়ক যন্ত্রণায় ফেলে দেয়। শত্রু ভালো কিছু অর্জন করলে তার মনোকষ্টের কারণ হয় এবং শত্রুর ভয় তাকে মানসিক যন্ত্রণায় ফেলে নিজের প্রতি যুল্‌ম করে। বৈরী মনোভাব যদি হিংসার কারণে হয়ে থাকে তবে তা মারাত্মক কষ্টের কারণ হয়। কেননা হিংসা প্রথমত হিংসুককে ক্ষতিগ্রস্ত করে, ধ্বংস করে এবং অন্তর্জ্বালা বাড়িয়ে দেয়। অথচ যার প্রতি হিংসা করা হয় সে খুব কমই ক্ষতিগ্রস্ত হয় অথবা আদৌ হয় না।[৫১২]

হিংসা থেকে বাঁচার উপায়

সেসব পরিণতি নিয়ে হিংসুকদের চিন্তা করা উচিত যেগুলো তার মনে অন্যের প্রতি হিংসার জন্ম দেয়। তাহলে সে বুঝতে পারবে যে শক্তি, সৌন্দর্য ও পদমর্যাদা এবং যে ধন সম্পত্তি তার প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে রয়েছে তা শুধুই ক্ষণস্থায়ী এবং ক্ষণিকের জন্য। এগুলো থেকে প্রাপ্ত উপকার খুবই সামান্য, অথচ এগুলো যে দুশ্চিন্তার জন্ম দেয় তা তো অনেক বেশী। যে আধ্যাত্মিক বিষয় আখেরাতে পুরস্কার লাভের কারণ হবে, তা হিংসার লক্ষ্যবস্তু হতে পারে না। কিন্তু যদি এ কারণেই কেউ অন্যকে হিংসা করে তাহলে হয় সে নিজে একজন লোকদেখানো আমলকারী হবে, যে তার নিজের আখেরাতের জন্য অর্জিত সওয়াবকে দুনিয়াতেই ধ্বংস করতে চায়। অথবা সে যার প্রতি হিংসা পোষণ করছে তাকেই লোকদেখানো আমলকারী মনে করছে। এভাবে তার প্রতি অবিচার ও অত্যাচার করছে। যদি সে তার ভাইয়ের দুঃখ-দুর্দশায় আনন্দ বোধ করে এবং তার নেয়ামতপ্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হয় তাহলে আসলেই সে তাকদীরের কারণে এবং সে ব্যক্তির ওপর আল্লাহর দয়া বর্ষণের কারণে মনোকষ্ট বোধ করে। এ ধরনের মনোভাব আল্লাহর রহমতের বিরুদ্ধে এবং তাকদীরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং বিরূপ সমালোচনা করার শামিল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর তাকদীরের বিরূপ সমালোচনা করে, সে যেন শক্ত কোন বস্তুতে নিজের মাথা ঠুকে। এতে তার নিজের মাথাই ফাটে।[৫১৩]

আল্লাহর রহমতের বিরোধিতাকারীরা নিজেই তা থেকে বঞ্চিত হয়। আরো বেশি আশ্চর্যের বিষয় হলো যে, একদিনের জন্য হলেও যে বিষয়ের ওপর শত্রুতা পোষণ করা মানায় না সে বিষয়ের ওপর এক বছর ধরে ঘৃণা ও শত্রুতা পোষণ করা কি কোন সুবিবেচনার বিষয় হতে পারে? কোনো সুস্থ বিবেক কি সেটাকে গ্রহণ করে নিতে পারে? এ অবস্থায় কোনো ঈমানদার ব্যক্তি কারো কোনো ক্ষতির কারণ হয়ে থাকলে তাকে পুরোপুরি দোষারোপ করা যায় না। কারণ,

---

৫১২. *মাকতুবাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯
৫১৩. *প্রাগুক্ত*

প্রথমত: এতে তাকদীরের সিদ্ধান্তের একটা অংশ রয়েছে। এ অংশটির ওপর সকলের সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

দ্বিতীয়ত: নাফস ও শয়তানের যে অংশ আছে তাও বাদ দেয়া উচিত। নিজ নফসের কুমন্ত্রণায় পরাজিত ব্যক্তির প্রতি শত্রুতা নয় বরং সদয় হওয়া এবং পরাজিত ব্যক্তির অনুতপ্ত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করা দরকার।

তৃতীয়ত: নিজের দোষত্রুটিকে দেখছে না। কিংবা দেখতে চাচ্ছে না। সেটাকে দেখা দরকার এবং একটি অংশ সেটিকে দেয়া দরকার। এর ওপর যে সামান্য অংশ রয়ে গেল তা মহানুভবতা ও ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা উচিৎ। কারণ তা যদি শত্রুর মনকে দ্রুত ও নিশ্চিতভাবে জয় করতে পারে তাহলে ব্যক্তিও অন্যায় ও ক্ষতি থেকে নিষ্কৃতি পাবে। অন্যথায় কাঁচ ও বরফের টুকরোকে হীরার মূল্যে ক্রয়কারী কোনো মাতাল ও পাগল ইয়াহুদী এক রত্নব্যবসায়ীর ন্যায়, শত্রুর সাথে এ দুনিয়াতে অনন্তকাল বাস করবে ভেবে দুনিয়ার মূল্যহীন, তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী দু'পয়সার মূল্যহীন বিষয়সমূহের কারণে শত্রুর প্রতি চরম শত্রুতা, স্থায়ী বিদ্বেষ ও চির শত্রুতা পোষণ করা হলে তা হবে অত্যাচার বা মাতলামি। এটি পাগলামীও বটে।[৫১৪]

এ পৃথিবী ক্ষণস্থায়ী ও ক্ষয়িষ্ণু। ফলে তা মূল্যহীন। সমগ্র পৃথিবীটাই যেখানে মূল্যহীন সেখানে তো এটা সুস্পষ্ট যে, পার্থিব জগতের সাধারণ বিষয়গুলো কত তুচ্ছ ও মূল্যহীন। আল্লামা হাফিয সিরাজী বলেন, "দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি ও নিরাপত্তা এ দু'টি বাক্যের মাঝেই নিহিত:

এক. বন্ধুর প্রতি উদার হও

দুই. শত্রুকে ক্ষমা কর।"[৫১৫]

সাঈদ নূরসীর একটা স্মরণীয় ঘটনা

তিনি তাঁর মাকতুবাতে উল্লেখ করেছেন যে, "একজন দ্বীনদার আলেমকে দেখলাম যে, তিনি দলীয় মতাদর্শ ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে ভিন্নমত পোষণকারী অন্য এক আলেমকে এমনভাবে দোষী সাব্যস্ত করছেন যে, মনে হয় যেন সে আলেম একজন কাফের। অথচ এ দীনদার আলেমই আবার রাজনৈতিক একাত্মতার কারণে একজন মোনাফেক তার প্রশংসা করায় তিনি আনন্দিত। আমি এ ধরনের রাজনৈতিক একাত্মতার অশুভ পরিণতি অনুধাবন করে ভীত ও আতঙ্কিত হলাম। তখন বললাম:

---

৫১৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১-৫২
৫১৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالسِّيَاسَةِ

'শয়তান এবং রাজনীতি থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি।' সে সময় থেকেই রাজনৈতিক জীবন ও পরিমণ্ডল থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিলাম।"[৫১৬]

৫. সামাজিক দিক থেকেও শত্রুতা ও বিদ্বেষ ক্ষতিকর

কাউকে ভালবাসা ও কারো সাথে শত্রুতা করা সবই হতে হবে আল্লাহর জন্য। এ মূলনীতি ব্যতীত জেদ ও পক্ষপাতিত্ব যে কতো বড় ক্ষতিকর বিষয় তা তুলে ধরে এ পঞ্চম আঙ্গিক বর্ণনা করা হল। বিশ্ব নবী (স.) বলেছেন

اَلْحُبُّ لِلّٰهِ وَالْبُغْضُ فِى اللهِ وَالْحُكْمُ لِلّٰهِ

"ভালবাসা হবে আল্লাহর জন্য। ঘৃণা আল্লাহর ব্যাপারে। বিধানও আল্লাহর জন্য।"[৫১৭]

এ সুমহান নীতিমালা ব্যক্তি-আচরণে প্রতিফলিত না হলে তা বিরোধ ও বিভাজনের জন্ম দিবেই। হ্যাঁ, وَالْبُغْضُ فِى اللهِ . وَالْحُكْمُ لِلّٰهِ (ঘৃণা আল্লাহর ব্যাপারে, বিধানও আল্লাহর জন্য) এ কথা যে না মানে এবং সে অনুযায়ী আচরণ না করে, তবে তার কর্মকাণ্ডে ন্যায়বিচারের পরিবর্তে অবিচারই প্রতিষ্ঠিত হবে।

শিক্ষণীয় ঘটনা

এ প্রসঙ্গে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা, 'হযরত আলী (রা.) যুদ্ধের ময়দানে এক কাফেরকে ধরাশায়ী করে হত্যা করার জন্য যখন তলোয়ার উত্তোলন করলেন তখন কাফের লোকটি তাঁর চেহারায় থুতু নিক্ষেপ করল। সে সময় আলী (রা.) তাকে হত্যা না করে ছেড়ে দিলেন। কাফের লোকটি বলল, "আপনি আমাকে হত্যা করলেন না কেন?" উত্তরে আলী (রা.) বললেন, "তোমাকে যে আমি হত্যা করতে চেয়েছিলাম সেটা ছিল একমাত্র আল্লাহর জন্য। কিন্তু যখন তুমি আমার প্রতি থুতু নিক্ষেপ করলে তখন তো আমি রাগান্বিত হয়ে গেলাম। ফলে এতে নিজের প্রতিশোধস্পৃহা জড়িত হওয়ায় আমার নিয়তের বিশুদ্ধতা কলুষিত হয়ে গিয়েছে। সেজন্যেই আমি তোমাকে হত্যা করিনি।"

একথা শুনে কাফের লোকটি বলল, আপনাকে রাগান্বিত করার উদ্দেশ্য ছিল, আপনি যাতে আমাকে দ্রুত হত্যা করেন। "আপনার দ্বীন-ধর্ম যদি এমন বিশুদ্ধ ও নিঃস্বার্থ হয় তাহলে তা নিশ্চই সত্য।"[৫১৮]

---

৫১৬. *মাকতুবাত*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪
৫১৭. *শুআবুল ঈমান লিল বাইহাকী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৯১৯১

দৃষ্টি আকর্ষণকারী এক ঘটনা

এক সময় এক চোরের হাত কাটার সময় বিচারকের চেহারায় রাগের লক্ষণ দেখে ন্যায়পরায়ণ প্রধান বিচারপতি তাকে বরখাস্ত করে দেন। কারণ আল্লাহর আইন মোতাবেক শরীয়তের বিচার অনুযায়ী হাত কাটলে বিচারকের মনে সমবেদনা উদ্রেক হতে পারে। কিন্তু তার অন্তরে রাগ বা দয়া কোনোটাই উদ্রেক হতে পারে না। যেহেতু বিচারকের আচরণে তার ব্যক্তিগত মনোভাব জড়িত ছিল তাই তার বিচারকার্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়নি।[৫১৯]

দুঃখজনক সামাজিক অবস্থা

বহিঃশত্রু এসে যখন আক্রমণ করে তখন অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-কলহ ভুলে যেতে হয়। পারস্পরিক শত্রুতা ভুলে যেতে হয়। সমাজকল্যাণের এটাই দাবি যা আদিম যুগের লোকেরাও জানতো এবং তাদের সমাজে প্রচলিতও ছিল। তাহলে ইসলামী দলগুলোর দাবিদারদের কী হলো যে, তারা নিজেদের তুচ্ছ বিভেদ ভুলে শত্রুর আক্রমণ মোকাবেলায় সুরক্ষিত দূর্গ রচনায় অসচেতন অথচ অগণিত শত্রু একের পর এক আক্রমণাত্মক অবস্থান গ্রহণ করে চলেছে? ইসলামী সমাজজীবনের বিরুদ্ধে এ যেন এক বিশ্বাসঘাতকতা, এক লজ্জাজনক বর্বরতা।[৫২০]

দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা

‘হাসানান’ নামক এক যাযাবর উপজাতি ছিল। এ উপজাতির দু’টি শাখাগোত্র পরস্পরের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে চলত। যদিও পারস্পরিক শত্রুতার কারণে এদের প্রত্যেক পক্ষেই প্রায় পঞ্চাশজনের মত নিহত হয়েছিল। কিন্তু যখনই অন্য কোন উপজাতি, যেমন ‘সিবগান’ বা ‘হায়দারান’ তাদেরকে আক্রমণ করতে এসেছিল তখনই হাসানানের এ দুই শত্রু-গোত্র নিজেদের শত্রুতা ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে আক্রমণকারী উপজাতিকে বিতাড়িত করার সংকল্প নেয়। তাদেরকে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। এসময় তারা নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিরোধের কথা একবারও স্মরণ করেনি।[৫২১] হে মু’মিন ভাইয়েরা, তোমরা কি জানো, শত্রুর কতো দল মু’মিনদেরকে আক্রমণ করতে ওঁৎ পেতে বসে আছে? একই বৃত্তাকারে অবস্থান গ্রহণকারী এসব দলের সংখ্যা শতাধিক। এমতাবস্থায় মু’মিনদের প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান সুদৃঢ়

৫১৮. প্রাগুক্ত, উদ্ধৃত; শায়খ শামসুদ্দিন সিওয়ানী, মিনাকিবে জিহার ইয়ারে গুযিন, পৃ. ২৯৪
৫১৯. বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী, প্রাগুক্ত
৫২০. *মাকতুবাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭
৫২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

করতে হবে, একে অন্যের নির্ভরতায় এগিয়ে আসতে হবে এবং বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। সুতরাং মু'মিনদের কি এটা মানায় যে, তারা নিজেদের পক্ষপাতদুষ্ট দলবাজি ও বিদ্বেষের অঙ্গার দ্বারা শত্রুর আক্রমণকে আরো সহজ করে তুলবে এবং শত্রুর জন্য দ্বার উন্মুক্ত করবে যে দরজা দিয়ে শত্রুরা ইসলামের অভ্যন্তরে সদলবলে প্রবেশ করবে? নাস্তিক, পথভ্রষ্ট, কাফের, বিদ্রোহী এবং বিভিন্ন শত্রুদের হয়তো সত্তরটি দল তোমাদেরকে ঘিরে আছে। তারা প্রত্যেকেই তোমাদের জন্য সকল ভীতি ও দুর্দশার মত ক্ষতিকর। তারা সবাই লোভ, ক্রোধ ও ঘৃণার দৃষ্টিতে তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের সকলের বিরুদ্ধে তোমাদের একমাত্র মযবুত অস্ত্র, ঢাল ও দূর্গ হচ্ছে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব। সুতরাং এটা নিশ্চয় অনুধাবন করার কথা যে, তুচ্ছ অজুহাতে সামান্য বিদ্বেষ যা ইসলামী দূর্গের ভিতকে কাঁপিয়ে তোলে তা বিবেক-বুদ্ধি ও ইসলামী স্বার্থের কতোটা পরিপন্থী।[৫২২] অতএব বিষয়টি নিয়ে ভাবা দরকার। চেতনার জগতে ফিরে আসা দরকার। হাদিসে বর্ণিত আছে– শেষ যামানায় সুফিয়ান এবং দাজ্জালের মত দুষ্ট ও ভয়ঙ্কর লোক নাস্তিক্যবাদী দুনিয়াকে শাসন করবে। মানবজাতি ও মুসলমানদের মধ্যে বিরাজমান লোভ, বিরোধ ও বিদ্বেষী মনোভাবের সুযোগ নিয়ে সামান্য শক্তি দিয়েই মানব সমাজে অরাজকতা সৃষ্টি করবে এবং মুসলিমবিশ্বকে ক্রীতদাসে পরিণত করবে।[৫২৩]

আল্লামা সাঈদ নূরসী (র.) আরো আহবান জানান: 'হে ঈমানদারগণ, যদি তোমরা এ অবমাননাকর দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ হতে না চাও তাহলে চেতনার জগতে ফিরে এসো। সচেতন হও, সে সব যালেমদের বিরুদ্ধে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে রুখে দাঁড়াও, যারা তোমাদের পারস্পরিক বিভেদের সুযোগ নিতে চায়।'[৫২৪]

৬. শত্রুতা ও বিদ্বেষ ইবাদতের বিশুদ্ধতায় বিঘ্ন ঘটায়

শত্রুতা ও বিদ্বেষের কারণে আধ্যাত্মিক জীবন এবং সুষ্ঠু ইবাদত বিঘ্নিত হয়। কারণ যে ইখলাস ও নিয়তের বিশুদ্ধতা নাজাতের একমাত্র মুক্তির উপায় তা এতে খর্ব হয়ে যায়। কারণ পক্ষপাতদুষ্ট ব্যক্তি তার প্রতিপক্ষের সৎ আমলকে শুধুমাত্র বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে এড়িয়ে যেতে চায়। ফলে সে তার নেক আমল শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও বিশুদ্ধ নিয়তে সম্পন্ন করতে পারে না। সে তার নিজ বিচার-বিবেচনা ও কর্মকাণ্ডে এমন ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিতে চায় যে তার পক্ষ অবলম্বন করে। ফলে সে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে অপারগ হয়ে যায়। ফলে সেই ন্যায়বিচার ও ইখলাস তার বিদ্বেষ ও শত্রুতার কারণে

---

৫২২. *মাকতুবাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮
৫২৩. *মাকতুবাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০
৫২৪. *মুসতাদরাকে হাকেম*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৪/৫২৯-৫৩০

ধ্বংস হয়ে যায়। এ ষষ্ঠ আঙ্গিক একটু বেশি জটিল। তাই এখানে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার সুযোগ নেই। বিধায় বিষয়টি এখানেই সংক্ষিপ্ত করা হলো।[৫২৫]

➢ শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (র.)

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (র.) মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর চার বছর পূর্বে ১৭০৪ সালে দিল্লিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশলতিকা হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রা.) এর পরিবার পর্যন্ত পৌঁছায়। দিল্লিতে তাঁর পিতা শাহ আব্দুর রহিম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনা লাভ করেন। কুর'আনের পাশাপাশি তিনি আরবি ও ফারসি ব্যাকরণ, সাহিত্য এবং উচ্চস্তরের দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, অধিবিদ্যা, অতীন্দ্রিয়তা ও আইনশাস্ত্রের ওপর পাঠ নেন। ১৫ বছর বয়সে তিনি এখান থেকে উত্তীর্ণ হন। একই বছর তাঁর পিতা তাঁকে নকশবন্দিয়া তরিকায় পদার্পণ ঘটান। মাদ্রাসায়ে রহিমিয়াতে তিনি তাঁর পিতার মাদরাসায় কর্মজীবন শুরু করেন। ১৭১৮ সালের শেষের দিকে পিতার মৃত্যুর পর তিনি মাদ্রাসার প্রধান হন এবং বার বছর যাবত শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করেন। এসময় তিনি তাঁর নিজস্ব পড়াশোনা চালিয়ে যান। শিক্ষক হিসেবে তাঁর সম্মান সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং শিক্ষার্থীরা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়।

১৭২৪ সালে তিনি হজ্জ পালনের জন্য হেজায গমন করেন। তিনি সেখানে আট বছর অবস্থান করেন এবং আবু তাহের ইবন ইবরাহিম আল কুর্দি আল মাদানির মত পণ্ডিতদের কাছ থেকে হাদিস ও ফিকহ শিক্ষালাভ করেন। এ সময় তিনি মুসলিম বিশ্বের সকল প্রান্তের লোকের সংস্পর্শে আসেন এবং বিভিন্ন মুসলিম দেশের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারেন। এ সময় তিনি সাতচল্লিশটি আধ্যাত্মিক বিষয় দেখতে পান যা তাঁর বিখ্যাত রচনা ফুয়ুদ আল হারামাইনের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়।[৫২৬]

১৭৩২ সালে তিনি দিল্লি ফিরে আসেন এবং ১৭৬২ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত জীবনের বাকি সময় এখানে অতিবাহিত করেন ও লেখালেখি চালিয়ে যান। এ উম্মাহর ঈমান, আকীদাহ সংরক্ষণ ও উম্মাহকে তা একতাবদ্ধ রাখার জন্য তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা'। এছাড়াও অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অধিবিদ্যাসহ সম্পূর্ণ ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়েও তিনি লিখেছেন। ইসলামের প্রকৃত ও আদিরূপ বিষয়ে তাঁর স্বচ্ছ মতামত তিনি এসব লেখায় তুলে ধরেছেন।[৫২৭]

---

৫২৫. *মাকতুবাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

৫২৬. *উইকিপিডিয়া*

৫২৭. শাহওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র), অনু. অধ্যাপক আখতার ফারুক, *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ* (রশিদ বুক হাউজ, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, প্রকাশকাল মে-২০০৮), পৃ. ২৪

মারাঠা শাসন থেকে ভারতকে জয় করার জন্য তিনি আহমেদ শাহ দুররানির কাছে চিঠি লেখেন। তিনি আরবি থেকে ফারসিতে কুর'আন অনুবাদ করেন যাতে মুসলিমরা কুর'আনের শিক্ষা বুঝতে পারে।

মহান এ দ্বীনের খাদেম ৬৩ বছর বয়সে ১১১৪ হিজরীর ৪ঠা শাওয়াল দিল্লিতেই ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন। পুরাতন দিল্লির শাহজাহানাবাদের দক্ষিণ ভাগে তাঁকে দাফন করা হয়।[৫২৮]

➢ সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.)

আল্লাহর পথের এক সুমহান দাঈ, ইলমে ওহীর বাতিঘর যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.)। খাঁটি আরব রক্তের গর্বিত বাহক। বিশ্বময় হেদায়াতের রোশনি বিকিরণকারী। তাঁর সময়কালে এ উম্মতের রাহবার ও মুরুব্বি। কল্যাণের পথে আহ্বানে চিরজাগ্রত কর্মবীর। জন্ম ১৯১৪ সালে ভারতের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার সূতিকাগার উত্তর প্রদেশের রাজধানী লাখনৌর রায়বেরেলীতে। প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া আদ্যোপান্তই দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায়। অধ্যাপনা জীবনের সিংহভাগও এ প্রতিষ্ঠানে কাটিয়েছিলেন। আল্লামা নদভীর খ্যাতির সূচনা হয় বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকে "সীরাতে সাইয়েদ আহমদ শহীদ" রচনার মাধ্যমে। গ্রন্থটি গোটা ভারতবর্ষে তাঁকে পরিচিত করে তুলে। এরপর তিনি রচনা করেন "মা যা খাসিরাল আলামু বিইনহিতাতিল মুসলিমিন" (মুসলিমদের পতনে বিশ্ব কী হারাল) নামক কালজয়ী গ্রন্থ। যা তাঁকে প্রথমত আরববিশ্বে ও পরবর্রতীতে বৈশ্বিক সুখ্যাতি এনে দেয় এবং তাঁকে পৌঁছে দেয় খ্যাতির জগতে এক অনন্য উচ্চতায়। এ পর্যন্ত গ্রন্থটির শতশত সংস্করণ বের হয়েছে। বিগত প্রায় পৌনে এক শতাব্দী ধরে তাঁর কলম অবিশ্রান্তভাবে লিখেছে মুসলিম ইতিহাসের গৌরবদীপ্ত অধ্যায়গুলোর ইতিবৃত্ত। সীরাত থেকে ইতিহাস, ইতিহাস থেকে দর্শন ও সাহিত্য পর্যন্ত সর্বত্রই তাঁর অবাধ বিচরণ। উর্দু থেকে তাঁর আরবী রচনায় যেন অধিকতর দক্ষতা ছিল। আল্লামা নদভী জীবনে যেমন পরিশ্রম করেছেন, তেমনি তার স্বীকৃতিও পেয়েছেন। মুসলিম বিশ্বের নোবেল হিসেবে খ্যাত বাদশাহ ফয়সাল আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে দুবাইয়ে তিনি বর্ষসেরা আন্তর্জাতিক ইসলামী ব্যক্তিত্ব নির্বাচিত হন। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক সেন্টারের পক্ষ থেকে আলী নদভীকে সুলতান ব্রুনাই এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। আন্তর্জাতিক বহু ইসলামী প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার তিনি গর্বিত সদস্য ছিলেন। তিনি একাধারে রাবেতায়ে আলমে ইসলামী এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক সেন্টারের সভাপতি ছিলেন। লাখনৌর বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'দারুল উলূম নাদওয়াতুল-উলামা' এর রেকটর ও ভারতীয় মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ প্লাটফরম মুসলিম পারসোন্যাল ল' বোর্ডের

৫২৮. প্রাগুক্ত

সভাপতি ছিলেন। মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য বিশ্বময় সফর করেছেন। অবশেষে ইসলামের এ মহান সাধক ও সংস্কারক ১৯৯৯ সনের ৩১ ডিসেম্বর জুমুআর সালাতের পূর্বে সূরা ইয়াসিন তেলাওয়াতরত অবস্থায় ইন্তিকাল করেন।[৫২৯]

মোটকথা গতশতকে মুসলিম উম্মাহর হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনা ও তাদের মাঝে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বক্তৃতা, বিবৃতি, অধ্যাপনা, লেখনী ইত্যাদির মাধ্যমে নিরলস কাজ করে যাওয়া অন্যতম মহান সাধক পুরুষ ছিলেন তিনি।

মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব সম্পর্কে তাঁর সংক্ষিপ্ত চিন্তাধারা

তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বিশ্ব মুসলিমের সামনে তুলে ধরেন যে, 'বিশ্বমানবতার সকল অশান্তি ও অকল্যাণের একটিই মাত্র সমাধান রয়েছে। তা হল বিশ্ব নেতৃত্ব ও পরিচালনা সে পাপিষ্ট ও মানবতার রক্তে রঞ্জিত হাত থেকে বের করে আনতে হবে, যা মানবজাতিকে চিরতরে নিমজ্জিত করার অঙ্গীকার করে রেখেছে। আমানতদার, দায়িত্বশীল, আল্লাহভীরু অভিজ্ঞদের হাতে এ নেতৃত্ব আসতে হবে, যাদেরকে মানব জাতি পরিচালনা করার জন্য আদিকাল থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। সফল ও কার্যকর বিপ্লব হল: কেবল বৃটেন, আমেরিকা, রাশিয়া ও তাদের দোসর প্রাচ্য ও এশিয়ার কর্তৃত্ব চলে আসতে হবে সে জাতির হাতে যার নেতৃত্বে রয়েছেন মানব জাতির মহান নেতা বনি আদমের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব মুহাম্মাদ (স.) এর হাতে। তাঁর কাছেই রয়েছে বিশ্বকে পূনর্নির্মাণ ও মানবতার পূনর্জাগরণের একমাত্র নীতিমালা ও শিক্ষা। যাঁর ঈমান বিশ্বকে বর্তমানের জাহেলিয়াত থেকে ঠিক তেমনি উদ্ধার করতে সক্ষম, যেমনটি সক্ষম হয়েছিল চৌদ্দশত বছর পূর্বে।'[৫৩০]

➢ বিশ্ব কবি আল্লামা ইকবাল

বিশ্ব কবি মুহাম্মদ ইকবালের জন্ম ৯ নভেম্বর ১৮৭৭ মোতাবেক ২১ এপ্রিল ১৯৩৮। তিনি আল্লামা ইকবাল নামে ব্যাপক পরিচিত ছিলেন। আল্লামা শব্দের অর্থ হচ্ছে এমন শিক্ষাবিদ যিনি অধিক জানেন। তিনি তৎকালিন পাঞ্জাবের শিয়ালকোট শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম শেখ নূর মোহাম্মাদ মায়ের নাম ইমাম বিবি।[৫৩১] তিনি বিভাগপূর্ব ভারতবর্ষের মুসলিম কবি, দার্শনিক এবং রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ ও ব্যারিস্টার ছিলেন। তাঁর ফার্সি ও উর্দু কবিতা আধুনিক যুগের ফার্সি ও উর্দু সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাঁকে পাকিস্তানের আধ্যাতিক জনক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। আল্লামা ইকবাল তাঁর ধর্মীয় ও ইসলামের রাজনৈতিক দর্শনের জন্যও বিশেষভাবে

---

৫২৯. *উইকিপিডিয়া*

৫৩০. *আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (র) জীবন কর্ম ও চিন্তাধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৪-৩৬৫

৫৩১. আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল, অনু. মোহাম্মদ সুলতান, *শিকওয়া ও জওয়াবে শিকওয়া* (ঢাকা, ধানমণ্ডি, আল্লামা ইকবাল সংসদ, প্রকাশকাল মে-২০০৬), পৃ. ০৫

সমাদৃত ছিলেন। আল্লামা ইকবাল একাধারে ভারতীয়, পাকিস্তানি, বাংলাদেশী, ইরানিয়ান এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সাহিত্যের বিশিষ্ট কবি হিসাবে প্রশংসিত। যদিও তিনি বিশিষ্ট কবি হিসাবে সর্বাধিক পরিচিত, তবে তিনি ‘আধুনিক সময়ের মুসলিম দার্শনিক চিন্তাবিদ’ হিসাবেও অত্যন্ত প্রশংসিত। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ আসরার-ই-খুদী ১৯১৫ সালে পার্সী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং কবিতার অন্যান্য গ্রন্থগুলিতে রুমুজ-ই-বেখুদী, পয়গাম-ই-মাশরিক এবং জুবুর-ই-আজাম প্রকাশ পায়। তাঁর বিখ্যাত উর্দু রচনাগুলি হল ‘বাং-ই-দারা’, ‘বাল-ই-জিবরাইল’ এবং ‘আরমাঘান-ই-হিজায’। ‘ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন’ তাঁর বিখ্যাত বই।[৫৩২]

১৯২২ সালের নিউ ইয়ার্স অনার্সে রাজা পঞ্চম জর্জ তাঁকে নাইট ব্যাচেলর এ ভূষিত করেছিল। দক্ষিণ এশিয়া ও উর্দু-ভাষী বিশ্বের বেশিরভাগ অঞ্চলে ইকবালকে শায়র-ই-মাশরিক' (উর্দু: شاعر مشرق, প্রাচ্যের কবি) হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তাঁকে মুফাক্কির-ই-পাকিস্তান (উর্দু: مفکر پاکستان, পাকিস্তানের চিন্তাবিদ), মোসাওয়ার-ই-পাকিস্তান (উর্দু: مصور پاکستان, “পাকিস্তানের রূপকার”) এবং হাকিম-উল-উম্মাত (উর্দু: حکیم الامت, “উম্মাহর হাকীম”) ইত্যাদি নামে ডাকা হয়।

তাঁর একটি বিখ্যাত চিন্তা দর্শন হচ্ছে ভারতের মুসলিমদের জন্য আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন। এ চিন্তাই বর্তমান পাকিস্তান রাষ্ট্রের তথা বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছে। তাঁর ফার্সি সৃজনশীলতার জন্য ইরানেও তিনি ছিলেন সমধিক প্রসিদ্ধ; তিনি ইরানে ইকবাল-ই-লাহোরী নামে পরিচিত। পাকিস্তান সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে ‘পাকিস্তানের জাতীয় কবি’ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাঁর জন্মদিন ইয়াওম-ই ওয়ালাদাত-ই মুহাম্মাদ ইকবাল (উর্দু: یوم ولادت محمد اقبال, বা ইকবাল দিবস) পাকিস্তানের সরকারী ছুটির দিন হিসাবে পালন করা হয়।

আল্লামা ইকবালের বাড়ী এখনও পাকিস্তানের শিয়ালকোটে অবস্থিত এবং এটি ইকবালের মঞ্জিল হিসাবে স্বীকৃত এবং দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত। তাঁর অন্য বাড়ী যেখানে তিনি তাঁর বেশিরভাগ জীবন কাটিয়েছেন এবং মারা গেছেন তা লাহোরে, ‘জাভেদ মনজিল’ নামে পরিচিত। বর্তমানে এটি জাদুঘর, যা পাকিস্তানের পাঞ্জাবের লাহোর রেলস্টেশনের কাছে আল্লামা ইকবাল রোডে অবস্থিত।[৫৩৩] আরববিশ্বসহ বিশ্ব মুসলিমকে উদ্দেশ্য করে বিশ্ব কবি আল্লামা ইকবালের আর্জি:

> “কাবার নির্মাতা তুমি ঘুম থেকে জেগে উঠ ফের
> হাতে তুলে নাও ফের দায়িত্ব গড়া এ বিশ্বের।”[৫৩৪]

---

৫৩২. প্রাগুক্ত

৫৩৩. *প্রাগুক্ত*

৫৩৪. সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী (র), *মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারাল?*, অনু. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী (ঢাকা: ৩৮ বাংলাবাজার, মুহাম্মাদ ব্রাদার্স, প্রকাশকাল, মে-২০১৮) পৃ. ৩৫৪

➢ ফয়সাল ইব্ন আব্দুল আযিয

১৯০৬ সালের ১৪ এপ্রিল ফয়সাল ইবন আব্দুল আযিয জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর বাবার তৃতীয় সন্তান। তাঁর মা তারফা বিনতে আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুল লতিফ আল শাইখ। ১৯০২ সালে রিয়াদ জয়ের পর আব্দুল আযিয তাকে বিয়ে করেন। ফয়সালের মা ছিলেন আল আশ শাইখ পরিবারের সদস্য। যিনি মুহাম্মদ ইবন আব্দুল ওয়াহ্হাব (র.) এর বংশধর। ফয়সালের নানা আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুল লতিফ ছিলেন আব্দুল আযিযের অন্যতম ধর্মীয় শিক্ষক ও উপদেষ্টা। ১৯১২ সালে ফয়সালের মা মারা যান। এরপর তিনি তাঁর নানার কাছে প্রতিপালিত হন। নানার কাছে তিনি কুর'আন ও ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি শিক্ষা করেন। এ শিক্ষা তাঁকে আজীবন প্রভাবিত করেছে। ফয়সালের একমাত্র বোন নুরাহর সাথে তাঁর এক চাচাত ভাই খালিদ ইবন মুহাম্মদের বিয়ে হয়।

সাহসিকতাকে প্রচুর মূল্য ও সম্মান দেয়া হয় এমন পরিবেশে ফয়সাল বেড়ে উঠেন। অন্যান্য সৎভাইদের তুলনায় এ দিক থেকে তিনি ব্যতিক্রম ছিলেন। তাঁর মায়ের কাছ থেকে তিনি গোত্রীয় নেতৃত্ব বিকাশের উৎসাহ ও উদ্দীপনা পেয়েছিলেন।

১৯১৯ সালে ব্রিটিশ সরকার বাদশাহ আব্দুল আযিযকে লন্ডন আমন্ত্রণ জানায়। তিনি যেতে না পারায় ১৪ বছর বয়সী ফয়সালকে পাঠানো হয়। যুক্তরাজ্য ভ্রমণে যাওয়া তিনি প্রথম সৌদি রাজকীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি সেখানে পাঁচ মাস অবস্থান করেন এবং বিভিন্ন ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাত করেন। একই সময়ে তিনি ফ্রান্স সফর করেন। রাষ্ট্রীয় সফরে ফ্রান্সে আসা সৌদি রাজকীয় ব্যক্তি হিসেবেও তিনি সর্বপ্রথম।[৫৩৫]

প্রাথমিক অভিজ্ঞতা

বাদশাহ আব্দুল আযিয ইবন সৌদের জ্যেষ্ঠ সন্তানদের অন্যতম হওয়ায় ফয়সাল বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপালন করেছেন। বর্তমান সৌদি আরবের হাইল বিজয় ও আসিরের উপর প্রাথমিক নিয়ন্ত্রণের পর ১৯২২ সালে তাকে ছয় হাজার যোদ্ধার সাথে এ সকল প্রদেশে পাঠানো হয়। বছরের শেষনাগাদ তিনি আসিরের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেন।

১৯২৫ সালে ফয়সাল হেজাযে বিজয় অর্জন করেন। ১৯২৬ সালে ফয়সাল হেজাজের শাসক হিসেবে নিয়োগ পান। তাঁর শাসনামলে তিনি প্রায়ই স্থানীয় নেতাদের সাথে আলোচনা করতেন।

---

৫৩৫. অনলাইন পত্রিকা, ফাতেহ ২৪, ২৫ মার্চ ২০১৯

১৯৩০ সালে ফয়সাল পররাষ্ট্রমন্ত্রী হন। বাদশাহ হওয়ার পরও তিনি এ দায়ীত্ব পালন করেছেন। এ সময় তিনি কয়েকবার ইউরোপ সফর করেছেন। ১৯৩২ সালে তিনি পোল্যান্ড ও ১৯৩৩ সালে রাশিয়া সফর করেন।[৫৩৬]

যুবরাজ ও প্রধানমন্ত্রী

ফয়সালের বড় ভাই সৌদ ইবন আব্দুল আযিয বাদশাহ হওয়ার পর ফয়সালকে যুবরাজ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বাদশাহ সৌদ ব্যয়বহুল কাজে হাত দিয়েছিলেন যার মধ্যে ছিল রাজধানী রিয়াদ প্রান্তে বিলাসবহুল রাজপ্রাসাদ নির্মাণ। মিশরের দিক থেকেও সৌদ হুমকি অনুভব করছিলেন। জামাল আবদেল নাসের ১৯৫২ সালে মিশরের রাজতন্ত্র বিলুপ্ত করেছিলেন। মিশরে পালিয়ে যাওয়া তালাল ইবন আব্দুল আযিয ও তালালের প্রভাবিত প্রিন্সদেরকে নাসের ব্যবহার করতে সক্ষম ছিলেন। সৌদের ব্যয়বহুল নীতির কারণে ও বৈদেশিক নীতির ব্যাপারে তাঁর অসফলতার জন্য রাজপরিবারের সিনিয়র সদস্য ও উলামাগণ ফয়সালকে প্রধানমন্ত্রী করার জন্য সৌদের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন। এ নতুন অবস্থানে ফয়সাল অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের জন্য ব্যয় কমিয়ে আনেন। অর্থনীতিতে তার এ পদক্ষেপ তাঁর আমলের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং জনগণের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করে। বাদশাহ সৌদ ও যুবরাজ ফয়সালের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ বৃদ্ধি পায়। ১৯৬০ সালের ১৮ ডিসেম্বর ফয়সাল প্রতিবাদ হিসেবে পদত্যাগ করেন। বাদশাহ সৌদ ফয়সালের নির্বাহী ক্ষমতা ফিরিয়ে নেন এবং প্রিন্স তালালকে মিশর থেকে ফিরিয়ে এনে অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব দেন। ১৯৬২ সালে ফয়সাল রাজপরিবারের মধ্যে ব্যাপক সমর্থন লাভ করেন এবং প্রধানমন্ত্রী হন। এ সময় যুবরাজ ফয়সাল সংস্কার ও আধুনিকীকরণকারী হিসেবে সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হন। রক্ষণশীল মহলের অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও তিনি নারীশিক্ষার বিস্তার ঘটান। সমস্যা সৃষ্টি না হওয়ার জন্য তিনি ধর্মীয় নেতাদের মাধ্যমে নারী শিক্ষার কারিকুলাম লিপিবদ্ধ ও তদারক করান। এ নীতি তাঁর মৃত্যুর অনেক পর পর্যন্ত টিকে ছিল।[৫৩৭]

১৯৬৩ সালে যুবরাজ ফয়সাল দেশে প্রথমবারের মত টেলিভিশন স্টেশন স্থাপন করেন। তবে মূল প্রচার শুরু হতে আরো দুই বছর সময় লাগে। আর অন্যান্য অনেক নীতির মত দেশের ধর্মীয় ও রক্ষণশীল অংশ এর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। ফয়সাল তাদের নিশ্চিত করেন যে ইসলামের নৈতিকতার মাপকাঠি কঠোরভাবে মেনে চলা হবে এবং বেশি মাত্রায় ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রচার করা হবে।[৫৩৮]

---

৫৩৬. *প্রাগুক্ত*

৫৩৭. *প্রাগুক্ত*

৫৩৮. *প্রাগুক্ত*

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

যুবরাজ ফয়সাল ১৯৬১ সালে বিশ্ব ইসলামী চিন্তাবিদদের মতামতের ভিত্তিতে পবিত্র মদিনা নগরীতে মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬২ সালে তিনি মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন। এটি একটি বৈশ্বিক দাতব্য সংস্থা। সৌদি রাজপরিবার এতে বিলিয়ন ডলারের বেশি দান করেছে বলা হয়ে থাকে।[৫৩৯]

সৌদি আরবের বাদশাহ

ক্ষমতা গ্রহণের পর ফয়সাল একটি ভাষণে বলেন, "আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করছি, ভাইয়েরা, আমাকে ভাই ও সেবক হিসেবে আমার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। 'মহিমা' (ম্যাজেস্ট্রি) শুধু আল্লাহর জন্য সংরক্ষিত এবং 'মুকুট' হল আসমান ও যমিনের মুকুট যা শুধু আল্লাহর জন্য। ১৯৬৭ সালে ফয়সাল দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রীর পদ সৃষ্টি করেন এবং প্রিন্স ফাহাদকে সে পদে নিয়োগ দেন।[৫৪০]

অর্থব্যবস্থা

ক্ষমতারোহণের পর ফয়সাল দেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধারকে প্রধান কর্তব্য হিসেবে গুরুত্ব দেন। শাসনের প্রথমদিকে তিনি তাঁর রক্ষণশীল অর্থনৈতিক নীতি চালু রাখেন এবং দেশের বাজেটে ভারসাম্য রক্ষায় তাঁর লক্ষ্য সফল হয় ও তেল উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।[৫৪১]

আধুনিকীকরণ

শাসনের শুরুতে সকল সৌদি রাজপুত্রকে তাদের সন্তানদের বিদেশে পাঠানোর পরিবর্তে দেশের ভেতর লেখাপড়া শেখাতে হবে মর্মে আদেশ জারি করেন। ফলে দেশের উচ্চবিত্ত পরিবারগুলো তাদের সন্তানদের দেশে এনে লেখাপড়া করাতে থাকে। ফয়সাল দেশের বর্তমান প্রশাসনিক অঞ্চলগুলোর প্রবর্তন করেন এবং আধুনিক কল্যাণ ব্যবস্থা চালু করেন। ১৯৭০ সালে তিনি বিচার মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দেশে প্রথমবার "পাঁচ বছরব্যাপী পরিকল্পনা" শুরু করেন।
১৯৬৫ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে টেলিভিশন প্রচার শুরু হয়। ১৯৬৬ সালে ফয়সাল নামে তাঁর এক ভাইপো নতুন স্থাপিত টেলিভিশন হেডকোয়ার্টারে হামলা চালালে নিরাপত্তা রক্ষীদের গুলিতে নিহত হয়। এ হামলাকারী ফয়সালের ভবিষ্যত হত্যাকারীর ভাই।

৫৩৯. *প্রাগুক্ত*
৫৪০. *প্রাগুক্ত*
৫৪১. *প্রাগুক্ত*

ফয়সালের হত্যার জন্য এ ঘটনাকে মোটিভ হিসেবে ধরা হয়। দেশের রক্ষণশীল অংশ থেকে তাঁর সংস্কারের বিষয়ে প্রশ্ন উঠলেও ফয়সাল তাঁর আধুনিকীকরণ চালু রাখেন এবং তাঁর নীতিকে ইসলামের সাথে সংগতিশীল রাখা নিশ্চিত করেন।[৫৪২]

অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ

১৯৫০ ও ১৯৬০ এর দশকে এ অঞ্চলে কয়েকটি অভ্যুত্থান হয়। মুয়াম্মার গাদ্দাফির অভ্যুত্থানের ফলে ১৯৬৯ সালে তেলসমৃদ্ধ লিবিয়া থেকে রাজতন্ত্র উচ্ছেদ হয়। তাই ফয়সাল নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেন। তাঁর শাসনের প্রথমদিকে লিখিত সংবিধানের ব্যাপারে দাবি উঠলে তিনি বলেন যে "কুর'আন আমাদের সংবিধান"। ১৯৬৯ সালের গ্রীষ্মে অভ্যুত্থান চেষ্টার অভিযোগে জেনারেলসহ কয়েকশ সামরিক অফিসারকে গ্রেপ্তার করা হয়। অভ্যুত্থান মূলত বিমান বাহিনীর অফিসাররা পরিকল্পনা করে এবং তাদের লক্ষ্য ছিল রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে নাসেরপন্থি সরকার প্রতিষ্ঠা করা। ধারণা করা হয় যে আমেরিকান গোয়েন্দাদের সহায়তায় এ পরিকল্পনা করা হয়।[৫৪৩]

ধর্মীয় ক্ষেত্র

ফয়সাল তাঁর দেশের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্রকে স্বীকার করতেন। তিনি ওয়াহ্‌হাবিদেরকেও কাছে আনেন। তাঁর শাসন শেষ হওয়ার পর সম্প্রদায়গত বিভাজন বৃদ্ধি পায়। ক্ষমতারোহণে সাহায্য করলেও ফয়সালের ক্ষমতালাভের পর উলামাদের প্রভাব হ্রাস পেয়েছিল। আল আশ শাইখ পরিবারের সাথে মায়ের দিক থেকে সম্পর্ক এবং প্যান আরবিজমের বিপক্ষে থাকা প্যান ইসলামিক আন্দোলনের প্রতি তাঁর সমর্থন থাকলেও তিনি উলামাদের ক্ষমতা ও প্রভাব হ্রাস করেন। চরমপন্থি ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের প্রভাব খর্ব করতে তিনি চেষ্টা চালান। তাঁর আধুনিকীকরণে উলামাদের বিরোধিতাকে তিনি উপেক্ষা করে চলেন। দেশের অন্যতম প্রভাবশালী ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন আল মদিনা কলেজ অব থিওলজির রেক্টর আব্দুল আযিয ইবন বাজ। ফয়সালের সমালোচনার কারণে তাঁকে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। অনেকে চরমপন্থায় প্রভাবিত হয়ে পড়ে। এমন অন্যতম চরমপন্থি ছিলেন জুহাইমিন আল ওতাইবি।[৫৪৪]

---

৫৪২. *প্রাগুক্ত*

৫৪৩. *প্রাগুক্ত*

৫৪৪. *প্রাগুক্ত*

দাসপ্রথার বিলুপ্তি

সৌদি আরবে দাসপ্রথা চালু ছিল। ১৯৬২ সালে জারি করা এক ফরমানে ফয়সাল দাসপ্রথা বিলুপ্ত করেন। পিটার হুবডের বর্ণনা অনুযায়ী এ সময় প্রায় ১৬৮২জন দাস মুক্ত হয় এবং সরকারের খরচ হয় জনপ্রতি ২০০০ মার্কিন ডলার।[৫৪৫]

বৈদেশিক সম্পর্ক

ফয়সাল তাঁর বাবার মত যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন এবং সামরিক বাহিনীর অস্ত্র ও প্রশিক্ষণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভর করেন। ফয়সাল কমিউনিস্ট বিরোধী ছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট ব্লকের অন্য কোনো দেশের সাথে কোনো প্রকার রাজনৈতিক সম্পর্ক তিনি রাখতে রাজি ছিলেন না। তিনি জায়নবাদের কঠোর সমালোচক ছিলেন এবং কমিউনিজম ও জায়নবাদকে সম্পর্কিত হিসেবে দেখতেন। যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য পাশ্চাত্য গণতন্ত্রী দেশের সাথে তিনি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। ১৯৬৭ সালে যুক্তরাজ্য সফরে তিনি রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথকে হিরার হার উপহার দেন।

বাদশাহ ফয়সাল আরব বিশ্বের রাজতন্ত্রী ও রক্ষণশীল আন্দোলনকে সমর্থন দেন। তিনি সমাজতন্ত্র ও আরব জাতীয়তাবাদি প্রভাব বিরোধী ছিলেন ও প্যান ইসলামিজমকে এর বিকল্প হিসেবে দেখতেন। শেষের দিকে তিনি মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন এবং এর পৃষ্ঠপোষকতার জন্য কয়েকটি মুসলিম দেশে ভ্রমণ করেন। প্যান আরবিজমের সমর্থক না হলেও ফয়সাল আরব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বৃহত্তর সৌহার্দের আহ্বান অব্যাহত রাখেন।

➢ ওআইসি প্রতিষ্ঠা

বাদশাহ ফয়সালের নামটি যে কারণে আলোচ্য গবেষণায় গুরুত্বসহকারে নিয়ে আসা হয়েছে তা শুধুমাত্র এ কারণে যে, ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি মরক্কোর রাজধানী রাবাতে একটি ঐতিহাসিক সম্মেলন আহ্বান করেন। এক মাস আগে পবিত্র আল আকসা মাসজিদে ইয়াহুদীদের ন্যাক্কারজনক হামলার প্রতিবাদে এ সম্মেলন ডাকেন তিনি। ২৫টি মুসলিম রাষ্ট্রের নেতারা এতে অংশ নেন। এতে ১৯৬৭ সালে অধিকৃত অঞ্চলগুলো ফিরিয়ে দিতে ইসরায়েলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। এ সম্মেলনে ঐতিহাসিক অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কোঅপারেশন ‘ওআইসি’ প্রতিষ্ঠিত হয়।

৫৪৫. *প্রাগুক্ত*

১৯৭০ সালে নাসেরের মৃত্যুর পর ফয়সাল মিশরের নতুন রাষ্ট্রপতি আনোয়ার সাদাতকে কাছে আনেন। আনোয়ার সাদাত নিজেও সোভিয়েত প্রভাব থেকে বের হয়ে আমেরিকাপন্থি শিবিরে যোগ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন। ১৯৭৩ আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের সময় ইসরায়েলের প্রতি পশ্চিমা সমর্থনের কারণে ফয়সাল আন্তর্জাতিক বাজারে তেল সরবরাহ প্রত্যাহার করে নেন। এর ফলে তেলের মূল্য বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। এ ঘটনা তাঁর কর্মজীবনে উল্লেখযোগ্য ছাপ রেখেছে এবং বিশ্বব্যাপী আরবদের মধ্যে তাঁর জন্য বহুল মর্যাদা বয়ে আনে। ১৯৭৪ সালে টাইম ম্যাগাজিন তাঁকে ম্যান অব দ্য ইয়ার ঘোষণা করে। সংকটের ফলে তেলের মূল্যবৃদ্ধি তাঁর মৃত্যুর পর সৌদি আরবের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। তেল থেকে পাওয়া নতুন মুনাফা ফয়সালকে ছয় দিনের যুদ্ধের পর মিশর, সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনকে সহায়তা বৃদ্ধিতে সক্ষম করে। সাধারণভাবে ধারণা করা হয় যে, ফয়সালের তেল প্রত্যাহার করার কারণে পশ্চিমা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাঁকে হত্যা করা হয়। উল্লেখ্য তাঁর হত্যাকারী অল্পকাল পূর্বেই যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফিরে এসেছিল।[৫৪৬]

হত্যাকাণ্ডের শিকার

১৯৭৫ সালের ২৫ মার্চ ফয়সালের উপর তাঁর সৎ ভাইয়ের ছেলে ফয়সাল বিন মুসাইদ গুলি চালায়। হামলাকারী এর অল্পকাল আগে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরে এসেছিল। মজলিসে হামলার ঘটনা ঘটে। এতে শাসকের সাথে নাগরিকদের সাক্ষাত ও আবেদন জানানোর সুযোগ থাকে। ওয়েটিং রুমে ফয়সাল কুয়েতি প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলছিলেন। তারাও ফয়সালের সাথে দেখা করার অপেক্ষায় ছিলেন। এ সময় হামলাকারী তাঁর দিকে এগিয়ে এসে গুলি চালায়। প্রথম গুলি তাঁর চিবুকে লাগে ও দ্বিতীয় গুলি তাঁর কান ঘেষে চলে যায়। একজন দেহরক্ষী তাঁর খাপবদ্ধ তলোয়ার দিয়ে হামলাকারীকে আঘাত করে। হামলাকারীকে হত্যা না করার জন্য তেলমন্ত্রী আহমেদ জাকি ইয়েমেনি বারবার চিৎকার করতে থাকেন। বাদশাহ ফয়সালকে দ্রুত হাসপাতালে নেয়া হয় এ সময় তিনি বেঁচে ছিলেন। হাসপাতালে তাঁকে চিকিৎসা দেয়া হলেও তা ব্যর্থ হয় এবং বাদশাহ ফয়সাল অল্পসময় পর মারা যান। হামলার আগে ও পরে হামলাকারী শান্ত ছিল বলে জানা যায়। হত্যার পর সৌদি আরবে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয়।

ভাই খালিদ বিন মুসাইদের হত্যার বদলা নেয়ার জন্য ফয়সাল বিন মুসাইদ এ কাজ করেছেন বলে একটি মত রয়েছে। বাদশাহ ফয়সাল দেশে আধুনিক সংস্কার করছিলেন। এ সবের ফলে অনেকেই তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ ছিল। প্রিন্স খালিদ বিন মুসাইদ তাদের অন্যতম। টেলিভিশন ভবনে হামলা করার সময় নিরাপত্তা রক্ষীদের গুলিতে তিনি মারা যান। প্রিন্স ফয়সাল বিন মুসাইদকে হামলার পরপর গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাঁকে মস্তিস্কবিকৃত বলে ঘোষণা করা হয়। তবে বিচারে সৌদি চিকিৎসকদের একটি প্যানেল

৫৪৬. *প্রাগুক্ত*

তাকে সুস্থ ঘোষণা করে। বিচারে তার মৃত্যুদণ্ড হয় এবং রাজধানী রিয়াদে প্রকাশ্যে তার শিরশ্চেদ করা হয়। ১৯৭৫ সালের ১৮ জুন এ দণ্ড কার্যকর করা হয়। এ সময় হাজার হাজার শোকাহত জনতা উপস্থিত ছিল। মৃত্যুর পরের দিন ২৬ মার্চ তাঁর লাশ রিয়াদের আল আউদ কবরস্থানে দাফন করা।[৫৪৭]

➢ সাইয়্যেদ আবুল আলা মাওদুদী (র.)

সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী (র.) (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯০৩-২২ সেপ্টেম্বের ১৯৭৯), যিনি মাওলানা মওদুদী, বা শাইখ সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী নামেও পরিচিত। ছিলেন একজন মুসলিম গবেষক, লিখক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক নেতা ও বিংশ শতাব্দীর একজন গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক। তিনি জামায়াতে ইসলামী নামক একটি ইসলামী রাজনৈতিক দলেরও প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে প্রভাবশালী মুসলিম স্কলারদের মধ্যে অন্যতম। ইসলামে অবদান রাখার জন্যে তাঁকে ১৯৭৯ সালে মুসলিম বিশ্বের নোবেলখ্যাত বাদশাহ ফয়সাল আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রদান করা হয়। তিনি ইতিহাসের দ্বিতীয় এবং সর্বশেষ ব্যক্তি যার গায়েবানা জানাযা পবিত্র কা'বাতে পড়া হয়। ইসলামের উপর তাঁর দুই শতাধিক লিখিত আলোড়ন সৃষ্টিকারী বই রয়েছে। তাফসীরে তাফহীমুল কুরআন তাঁন অনবদ্য সৃষ্টি। ঊনিশ খণ্ডে লিখিত এ তাফসীর গোটা বিশ্বে সমাদৃত। পবিত্র মক্কাতুল মুকাররমায় ১৯৬২ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ইসলামী মহা সম্মেলনে মাওলানা যোগদান করেন এবং ইসলামী বিশ্বের সাথে সংযোগ সম্পর্ক স্থাপনকারী 'রাবেতায়ে আলম আল ইসলামী' নামক আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার প্রতিষ্ঠায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন।[৫৪৮]

মুসলিম ঐক্য চিন্তা

মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মাওদূদী (র.) একান্তভাবে কামনা করতেন যে, বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মাঝে ইসলামের ভিত্তিতে একটি 'কমনওয়েলথ' গঠিত হোক। এ সম্পর্কে তিনি বার বার তৎকালিন সৌদি বাদশাহকে অনুরোধ করেন এবং তা পরবর্তীতে সত্যিই ফলপ্রসূ ও কার্যকর হয়। গঠিত হয় আন্তর্জাতিক ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা 'ওআইসি'। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মাওলানা ছিলেন বিশ্ব মানবতার আহবায়ক ও মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের প্রবক্তা।[৫৪৯]

---

৫৪৭. *প্রাগুক্ত*

৫৪৮. *প্রাগুক্ত*

৫৪৯. মরহুম আব্বাস আলী খান, মাওলানা মওদূদীর বহুমূখী অবদান (ঢাকা: সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, এপ্রিল-২০০৪), পৃ. ১৭-১৮

➢ শহীদ হাসান আল-বান্না (র.)

হাসান আল বান্না (আরবি ভাষায় حسن البنا) (জন্ম ১৪ অক্টোবর, ১৯০৬-মৃত্যু ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৯) ছিলেন একজন মিশরীয় ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারক। তিনি মুসলিম উম্মাহকে একতাবদ্ধ করার স্বপ্ন লালন করে প্রতিষ্টা করেন 'মুসলিম ব্রাদারহুড' দল। তিনি ইসলামকে বাস্তব জীবনের জীবন ব্যবস্থা ও কুর'আনকে এ ব্যবস্থার একমাত্র সংবিধান বলে মনে করতেন। তিনি পাশ্চাত্যের বস্তুবাদ, ব্রিটিশদের সাম্রাজ্যবাদ এবং মিশরের প্রথাগত আলেমদের সমালোচনা করতেন। ১৯০৬ সালে ১৪ অক্টোবর মাসে মিশরের রাজধানী কায়রোর কাছে মাহমুদিয়া অঞ্চলে অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুর রহমান বান্না, যিনি একজন ইমাম ছিলেন। বারো বছর বয়সে তিনি সুফীবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি সেই কিশোর বয়সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে পথে নেমেছিলেন।

তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয় 'মাদরাসা রাশাদ আদ' নামক প্রতিষ্ঠানে।[৫৫০] এরপর তিনি আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দারুল উলূমে ভর্তি হন। ১৯১৭ সালে সেখান থেকে তিনি ডিপ্লোমা লাভ করেন। হাসান আল বান্না ১৯২৭ সালে সরকারী স্কুলের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করে কর্মজীবন শুরু করেন। এ সময় তিনি মিশরে প্রচুর ভ্রমণ করেন এবং সে সময়কার বড় বড় আলেমদের সংস্পর্শে আসেন। তাঁর নযরে পড়ে পাশ্চাত্যের ধর্মনিরপেক্ষতার প্রভাবে কীভাবে মিশরের সমাজ ক্রমশ ভোগের দিকে ঝুঁকে পড়ছে কীভাবে সনাতন মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে আসছে। পরবর্তীতে তিনি আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। সেখানে তিনি স্ব-বিস্ময়ে লক্ষ্য করেন কীভাবে খ্রীষ্টান মিশনারীরা ইসলামের বিরুদ্ধে নাস্তিকতাকে উৎসাহিত করে চলছে। ১৯২৮ সালে ৬ জন ইসলামী ব্যক্তিত্বের সহযোগিতায় হাসান আল বান্না গঠন করেন "ইখওয়ানুল মুসলিমিন বা মুসলিম ব্রাদারহুড" সংগঠনটি। আর তিনি সে সংগঠনের আমির নির্বাচিত হন। সংগঠনটিকে সামাজিক ভিত্তি দিতে পুরো মিশর জুড়ে তিনি একইসঙ্গে সমাজকল্যাণ এবং ইসলামী মূল্যবোধ প্রচারের বিশাল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলেন। মিশরের প্রতিটি শহরে গড়ে ওঠে এর শাখা সংগঠন। ইসলামকে সবার নিকট উপস্থাপনের জন্য তিনি মহিলাদেরকে নিয়ে 'আখওয়াত আল মুসলিমাত' নামক সংগঠন গড়ে তোলেন। ১৯৩৩ সালে আল ইখওয়ানের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় একটি পত্রিকা প্রকাশের। পত্রিকাটির নাম রাখা হয় 'মাজাল্লাতু ইখওয়ানিল মুসলিমিন'। তাঁর এ কর্মকাণ্ড মিশরের তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীকে ভীত করে তোলে। ক্ষণজন্মা এ মহান ইসলামী নেতা মাত্র ৪৩ বছর বয়সে ১৯৪৯ সালে শাসকশ্রেণীর লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসির গুলিতে শাহাদাত বরণ করেন।[৫৫১]

---

৫৫০. খলিল আহমদ হামেদী, *শহীদ হাসানুল বান্নার ডায়েরী* (ঢাকা: প্রফেসর বুক কর্ণার, নভেম্বর-২০১২), পৃ. ০৭
৫৫১. *প্রাগুক্ত*

➢ মুসলিম ঐক্য প্রচেষ্টায় ফুরফুরার পীর সাহেবের অব্যাহত অবদান

ভারত বর্ষে আলেম সমাজ ও মুসলিমদের ঐক্যের জন্য ফুরফুরার এ ঐতিহ্যবাহী পীর বংশের ঐতিহাসিক অবদান রয়েছে। ১৯৯৮ সালের ১৫ ডিসেম্বর বাংলাদেশের আলেম সমাজ ও মুসলিমদের ঐক্যের বিষয়ে জাতীয় শরিয়াহ কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত এ দরবারেই অনুষ্ঠিত সম্মেলনে গৃহীত হয়। প্রতি বছরই ঢাকার মীরপুরস্থ মারকাযে ইশায়াতে ইসলাম দারুস সালামে ফুরফুরার বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হত। এ সম্মেলন ৩-৫ দিনব্যাপী চলত। এ সম্মেলনের সময়ই পীর সাহেব সেখানে জাতীয় শরীয়াহ কাউন্সিলের বার্ষিক সম্মেলনেরও সুযোগ করে দিতেন। পীর সাহেবের সম্মেলনের জন্য তৈরী মঞ্চ ও প্যাণ্ডেলই জাতীয় শরীয়াহ কাউন্সিল ব্যবহার করত। আপ্যায়নের যাবতীয় ব্যয়ভার পীর সাহেবই বহন করতেন।[৫৫২] এছাড়াও পাকিস্তান আন্দোলনের সময় যখন দারুল উলুম দেওবন্দের মোহতামিম ও জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের নেতা মাওলানা হোসাইন আহমাদ মাদানী (র.) পাকিস্তান দাবীর বিরুদ্ধে মি. গান্ধী ও মি. নেহেরুর নেতৃত্বে পরিচালিত ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসকে সমর্থন করেছিলেন তখন ফুরফুরার ঐ সময়কার পীর মাওলানা আবু বকর সিদ্দীকী (র.) ১৯৪৩ সালে কলকাতায় গোটা ভারত বর্ষের ওলামায়ে কেরামের এক সম্মেলনের আয়োজন করেন এবং ঐ সম্মেলনেই পাকিস্তান দাবির পক্ষে জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম গঠিত হয়।[৫৫৩]

➢ ড. ইউসুফ আল-কারযাভী (হাফিযাহুল্লাহ)

ড. ইউসূফ আল-কারযাভী (হাফিযাহুল্লাহ) হলেন পৃথিবী বিখ্যাত একজন মিশরীয় ইসলামিক স্কলার। ইসলামিক বিভিন্ন বিষয়ে লেখা তাঁর কয়েকশ গ্রন্থ রয়েছে। সবগুলোই পাঠক মহলে ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে। আল জাযিরা টেলিভিশনে 'শরীয়াহ এবং জীবন' নামক তাঁর অনুষ্ঠান তাঁকে পৃথিবীব্যাপি পরিচিত করে তোলে। তিনি মিশর ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংগঠন 'মুসলিম ব্রাদারহুড' এর পরামর্শক। তাঁকে ব্রাদরহুডের শীর্ষস্থানীয় নেতা মনে করা হয়। তিনি বিশ্বের আলেমদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক সংগঠন 'ইত্তেহাদুল আলামী লি উলামাইল মুসলিমীন' এর সভাপতি ছিলেন।

তিনি ৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ সালে মিশরের গারবিয়্যা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। দশ বছর বয়স হবার আগেই হিফয সম্পন্ন করেন। অতঃপর আল-আযহারের শিক্ষাপদ্ধতিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পড়াশোনা করেন। উচ্চ মাধ্যমিকে তিনি সারা মিশরে দ্বিতীয় হন। আল আযহারের 'উসূলুদ দ্বীন' অনুষদ থেকে অনার্স, মাষ্টার্স এবং পিএইচ. ডি ডিগ্রি

৫৫২. *প্রাগুক্ত*
৫৫৩. *ঐক্য প্রচেষ্টা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

অর্জন করেন। তাঁর পিএইচ. ডি বিষয় ছিল "যাকাত এবং সামাজিক সমস্যা সমাধানে তার প্রভাব।"[৫৫৪]

তাঁর জীবনের কিছু পট পরিবর্তন

দুই বছর বয়সে তাঁর বাবা মারা যান। চাচা তাঁর শিক্ষাদিক্ষার ভার বহন করেন। ইখওয়ানুল মুসলেমিনের সাথে সম্পৃক্ততার কারণে তাঁকে বেশ কয়েকবার কারাবরণ করতে হয়। প্রথমবার ১৯৪৯ সালে রাজকীয় আমলে। এরপর প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুন নাসেরের আমলে তিনবার। ১৯৫৪ সালের জানুয়ারিতে প্রথমবার। একই সালের নভেম্বর মাসে দ্বিতীয়বার। এবার তিনি ২০ মাস কারাগারে কাটান। শেষবার ১৯৬৩ সালে। ১৯৬১ সালে তিনি কাতারে প্রথম পাড়ি জমান। ১৯৭৩ সালে কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী স্টাডিজ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ডিপার্টমেন্ট প্রধান হিসেবে যোগদান করেন।

পুরস্কার ও সম্মাননা

১৪১১ হিজরীতে ইসলামী অর্থনীতিতে অবদান রাখায় 'ব্যাংক ফয়সাল' পুরস্কার লাভ করেন। ১৪১৩ হিজেরীতে ইসলামী শিক্ষায় অবদানের জন্য আন্তর্জাতিক বাদশাহ ফয়সাল পুরস্কারের জন্য তাঁকে সিলেক্ট করা হয়। মুসলিম বিশ্বের নোবেল খ্যাত এ পদকটির পাওয়ার সম্মাননটা এ বছর তাঁর ভাগ্যে জোটে। ১৯৯৭ সালে ব্রুনাই সরকার তাঁকে 'হাসান বাকলি' পুরস্কারে ভূষিত করে।[৫৫৫] আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দীর্ঘ নেক হায়াত দান করুন। মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রচেষ্টায় আরো বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার তাওফিক দিন।

বাংলায় অনুদিত তাঁর বইসমূহ

- সুন্নাহর সান্নিধ্যে
- ইসলামী পুনর্জাগরণ : সমস্যা ও সম্ভাবনা
- ইসলামে হালাল হারামের বিধান
- ঈমান ও সুখ
- বুদ্ধিদীপ্ত জাগরণের প্রত্যাশায়
- ইসলামের বিজয় অবশ্যম্ভাবী
- আধুনিক যুগ ইসলাম কৌশল ও কর্মসূচী
- ইসলাম ও চরমপন্থা
- ইসলাম ও শিল্পকলা
- ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থাঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগ

---

৫৫৪. ড. *ইউসুফ আল কারযাভী*, *ইসলামে দারিদ্র বিমোচন* (ঢাকা: সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, এপ্রিল-২০১৮), পৃ. ০৩

৫৫৫. *প্রাগুক্ত*

- ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা
- ইসলামে ইবাদতের পরিধি
- ইসলামে দারিদ্র বিমোচন
- ইসলামের যাকাতের বিধান ১ম ও ২য় খন্ড
- জেরুজালেম বিশ্ব মুসলিম সমস্যা[৫৫৬]

মাওলানা আব্দুর রহীম (র.)

বিংশ শতকের বাংলাদেশে যে কয়জন মহান ইসলামী ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছিল তাদের শীর্ষে ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (র.)। তিনি এত আত্মপ্রচার বিমুখ ছিলেন যে নিজের নামের আগে মাওলানা উপাধিটা ব্যবহারেও কুণ্ঠা বোধ করতেন। অথচ কুরআন-হাদিস চর্চা ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের নিরলস প্রচেষ্টার পাশা পাশি ইসলামী রাজনীতিতে অসামান্য অবদান ইত্যাদি তাঁকে বিশ্ব দরবারে জায়গা করে দিয়েছে। তিনি ছিলেন একাধারে প্রখ্যাত আলিম, বিজ্ঞ ফকীহ, ইসলামী চিন্তাবিদ, সুলেখক, বাগ্মী, সুসাহিত্যিক, অন্যদিকে দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ান, বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদ ও অর্থনীতিবিদ। শুধু মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিত একজন ব্যক্তির মাঝে এতগুলো গুণ ও জ্ঞানের সমাহার সত্যিই এক আশ্চার্যের বিষয়। তিনি শুধু পিরোজপুরের আলিম ছিলেন না, তিনি ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের সমকালীন যুগে এক অনন্য ব্যক্তিত্ব।[৫৫৭]

জন্ম ও পড়াশুনা

মাওলানা আব্দুর রহীম (র.) পিরোজপুরের কাউখালি থানার শিয়ালকাঠিতে ১৯১৮ সালের ২ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম আলহাজ্ব খবির উদ্দীন। নিজ এলাকায় প্রাথমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে শর্ষিণা আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখান থেকে কৃতিত্বের সাথে আলিম পাশ করে কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় চলে যান। ১৯৪২ সনে তিনি এ মাদরাসা হতে কৃতিত্বের সাথে মমতাজুল মুহাদ্দেসীন ডিগ্রী লাভ করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি বরিশালের নাজিরপুর ও কেউন্দিয়া কাউখালী মাদরাসায় প্রধান মাওলানা হিসেবে চার বছর শিক্ষাদানে ব্যাপৃত থাকেন। কিন্তু বাঁধাধরা চাকরি তাঁর পছন্দ হয়নি বলে তিনি আর চাকরি করেননি।

লোক মুখে শুনা যায় যে, তিনি তাঁর সকল সার্টিফিকেট ছিঁড়ে ফেলেন এবং মসি যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। বাংলাদেশের আলিমদের মাঝে যে বিষয়টির অভাব পরিলক্ষিত হয়ে আসছিল তা হলো তাদের লিখিত কোনো অবদান তেমন একটা নেই। এ বিষয়টিই

---

৫৫৬. *প্রাগুক্ত*
৫৫৭. প্রফেসর ড. আ.ব.ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী, *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ২০ অক্টোবর ২০২০

হয়তো তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এবং কলকাতায় অধ্যয়নকালেই গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর ক্ষুদ্রতর জীবনের শতাধিক গ্রন্থ অনুবাদ ও রচনা তাঁর এ গবেষণারই বাস্তব ফসল।[৫৫৮]

বিশ্ব বরেণ্য ইসলামী অর্থনীতিবিদ

তিনি ছিলেন একজন বিশ্ব বরেণ্য ইসলামী অর্থনীতিবিদ। বস্তুতপক্ষে তাঁর আগে কোনো আলেম ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শনকে বাংলা ভাষায় এত ব্যাপকভাবে তুলে ধরতে পারেননি। ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে তাদের বাস্তব কোনো ধারণাই ছিল না। বরং অনেকেই একে পার্থিব চিন্তা বা জড়বাদী দর্শন বলে উপেক্ষা করেছেন। তিনি বাংলা ভাষায় সুদের কুফল ও যাকাতের অর্থনৈতিক তাৎপর্য, পুঁজিবাদ ও সমাজবাদী অর্থনীতির মোকাবেলায় ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবহারের শ্রেষ্ঠত্ব যুক্তিতর্কের মাধ্যমে প্রমাণ করে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতের এক বিরাট অংশকে ইসলামী আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করেছেন-অনুপ্রাণিত করেছেন। শুধু তাই নয় এ সম্পর্কে তিনি বেশ কয়েকটা বইও রচনা করেন। ইসলামী অর্থনীতির উপর তাঁর আরবীতে রচিত আল-ইকতিসাদ আল-ইসলামী পুস্তিকাটি তাঁর ইসলামী অর্থনীতি ও আরবী বিষয়ে পাণ্ডিত্যের বড় প্রমাণ।[৫৫৯]

বাগ্মী সুবক্তা

তিনি ছিলেন একজন বাগ্মী সুবক্তা। তাঁর ভাষা ছিল যেমনি প্রাঞ্জল সুন্দর তেমনি আকর্ষণীয়। সাধারণ জনসভার চেয়ে সুধী সমাবেশে, সেমিনার সিম্পোজিয়ামে তাঁর বক্তৃতায় আকর্ষণ বেশি ছিল। তাঁর বক্তৃতা হত বিষয়বস্তু ভিত্তিক, সুসংহত এবং আকর্ষণীয়। আধুনিক ও প্রাচীন ভ্রান্ত ধারণাগুলোর মোকাবেলায় ইসলামী জীবন দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব যুক্তি ও তর্কের মাধ্যমে এমনভাবে তুলে ধরতেন যে, কোনো সমালোচক তার সমালোচনা করতে পারত না।[৫৬০]

আন্তর্জাতিক খ্যাতি

তাঁর খ্যাতি শুধু দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এক মহান ব্যক্তিত্ব। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এবং বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে তিনি এক অনন্য মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তিনি 'রাবেতা আলমে ইসলামী' এবং ওআইসির ফিকাহ কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৭৭ সালে মক্কায় অনুষ্ঠিত "বিশ্ব ইসলামী শিক্ষা সম্মেলন" এবং রাবেতা আলমে ইসলামীর সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯৭৮ সালে মালয়েশিয়ার

৫৫৮. প্রাগুক্ত
৫৫৯. প্রাগুক্ত
৫৬০. প্রাগুক্ত

রাজধানী কুয়ালালামপুরে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় ইসলামী দাওয়াত সম্মেলনে যোগদান করেন। এ ছাড়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইসলামী সেমিনারে যোগদানের জন্য তিনি নেপাল, থাইল্যান্ড, ভারত, আরব আমিরাত, ইরান, পাকিস্তান ইত্যাদি দেশ সফর করেন।[৫৬১]

প্রখ্যাত সাংবাদিক

তিনি ছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক, ছাত্র জীবনেই তিনি পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করেন। নিম্নের পত্রিকাগুলোতে তিনি লিখতেন এবং সম্পাদনা করতেন ।

১৯৪৯-৫০ সালে বরিশালে তানজিন সম্পাদনা; ১৯৫৯-৬০ সালে দৈনিক নাজাতের জেনারেল ম্যানেজার; সাপ্তাহিক জাহানে নও'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক । ১৯৪৫ সাল থেকে যে সকল পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন : সাপ্তাহিক নকিব, মাসিক মোহাম্মদী (কলকাতা ও ঢাকা) মাসিক হেদায়েত, মাসিক সুন্নাত আল জামাত, ইসলামী একাডেমী পত্রিকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, মাসিক পৃথিবী, দৈনিক আজাদ, দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা ডাইজেষ্ট, মাসিক মদীনা, মাসিক তাহজীব, ত্রৈমাসিক কলম, সাপ্তাহিক মিজান (কলকাতা), মাসিক মঞ্জিল, দৈনিক পূর্বদেশ, মাসিক কুরআনুল হুদা (করাচী), মাসিক চেরাগে রাহ (করাচী), সন্ধান (ইসলামাবাদ), সাপ্তাহিক নাজাত, দৈনিক সংগ্রাম, মাসিক তাওহীদ প্রভৃতি। এককথায় তিনি ছিলেন ইসলামী সাহিত্যাঙ্গনে এক জ্ঞানবান স্রোতধারা।[৫৬২]

বরেণ্য ইসলামী রাজনীতিবিদ

তিনি ছিলেন উপমহাদেশের ইসলামী আন্দোলনের সওগত। ১৯৪৫ সালে মাওলানা মওদুদির বিপ্লবী পুস্তকসমূহের সাথে পরিচিত হবার পর জামায়াতে ইসলামী হিন্দে যোগদান করেন। ১৯৪৬ সালে মাতৃভূমিতে ফিরে এসে ইসলামী সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। সাথে সাথে উর্দু থেকে অনুবাদ চলতে থাকে। দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সমানে তা ছাপা হতে থাকে। পাকিস্তান হবার পর ঢাকাকে কেন্দ্র করে ইসলামী আন্দোলনের কাজে মনোযোগী হন। কিছুকালের ব্যবধানে এখানে সাংগঠনিক ভিত্তি স্থাপিত হয়। তিনি জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী হিসেবে ১৯৫১-৫৫ সাল, ১৯৫৬-৬৮ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর, ১৯৬৮-৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময়ের মধ্যে ১৯৪৮-৪৯ পাকিস্তানের আদর্শ প্রস্তাব, ১৯৫১-৫৬ ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে

৫৬১. প্রাগুক্ত
৫৬২. প্রাগুক্ত

দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলা, ১৯৬০-৬২ সালে আইয়ূব সরকারের বিরুদ্ধে ইসলামী নীতিমালা প্রতিষ্ঠার জন্য ৬৪ জন জামায়াত নেতাসহ তিনি কারাবরণ করেন। জামায়াতকে বেআইনি ঘোষণা করা হয়। ১৯৭১-এর শেষ হতে ১৯৭৪ পর্যন্ত নেপালের কাঠমুণ্ডুতে অবস্থান করে এ উপমহাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ব্যাপারে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন।[৫৬৩]

ইসলামী দলগুলোকে একত্রিত করতে তাঁর প্রচেষ্টা

দেশের সকল ইসলামী দল ও শক্তিকে একটিমাত্র দলে পরিণত করার লক্ষ্যে সর্বপ্রথম ১৯৭৬ সালে ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ গঠন করে তিনি তাঁর সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। পরের বছর তিনি চেয়ারম্যান নির্বাচন হন। ১৯৭৯ সালে তিনিসহ ছয়জন এ দল থেকে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৮৩ সালে দলের নাম পরিবর্তন করে ইসলামী ঐক্য আন্দোলন গঠন করেন। তিনি সর্বদাই ইসলামী আন্দোলনকামীদের জোট সৃষ্টির মাধ্যমে গণ-আন্দোলনে বিশ্বাস করতেন বলে দেশের প্রখ্যাত ওলামায়েকেরাম, পীর মাশায়েখ ও বুদ্ধিজীবী সমন্বয়ে ‘সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ’ ‘খেলাফত সংগ্রাম পরিষদ’ গঠন করেন। ১৯৮৭ সালের ৩ মার্চ ‘ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন’ আত্মপ্রকাশ করে।[৫৬৪]

তাঁর কয়েক মাসের মধ্যে দেশের সর্বত্র ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন এক ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। তিনি ব্যক্তিগতভাবে এ আন্দোলনের প্রতিটা প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতেন। এজন্য পুলিশের নির্যাতনসহ নানাভাবে হয়রানীর সম্মুখীন হয়েও তা তিনি হাসিমুখে বরণ করে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অটল থাকেন।[৫৬৫]

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পণ্ডিত

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে তিনি ছিলেন পণ্ডিত ও মহাজ্ঞানী। ইসলামী জীবন দর্শনের উপর মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে তিনি তাঁর দায়িত্ব শেষ করেননি। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ, কমিউনিজম ও সোস্যালিজম, সৃষ্টি ও স্রষ্টা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিবর্তনবাদ, আসমান জমিনের সৃষ্টি রহস্য প্রভৃতি মৌলিক বিষয়ে তত্ত্ববহুল সাড়াজাগানো বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর মধ্যে মহাসত্যের সন্ধানে, বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব, কমিউনিজম ও ইসলাম, ইসলামের দৃষ্টিতে বিজ্ঞান, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও

---

৫৬৩. প্রাগুক্ত
৫৬৪. প্রাগুক্ত
৫৬৫. প্রাগুক্ত

ইসলামী সমাজ, পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাধারণ একজন আলেম হয়ে আধুনিক এত জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সত্যিই আশ্চার্যের বিষয়।[৫৬৬]

স্বার্থক গবেষক

মাওলানা আব্দুর রহীম (র.) ছিলেন স্বার্থক গবেষক। তিনি গতানুগতিকভাবে শুধু পড়েই তাঁর দায়িত্ব শেষ করেননি। তিনি প্রতিটি বিষয়ের উপর চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা করেছেন। কুর'আন-সুন্নাহ তথা ইসলামী জীবন দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান করেছেন। তিনি আধুনিক যুগ জিজ্ঞাসার বিভিন্ন প্রশ্ন ও সমস্যার আলোকে ইসলামী সমাধান দিয়েছেন এবং যে কোনো মতবাদ বা মতাদর্শের উপর ইসলামী জীবন ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি।[৫৬৭]

আদর্শবাদী সুলেখক

তিনি ছিলেন আদর্শবাদী সুলেখক। তিনি যা পড়েছেন, গবেষণা করেছেন, তা তাঁর ক্ষুরধার মসিতে প্রকাশ করতে সদা ছিলেন সচেষ্ট। সে যে কলম হাতে তুলে নিয়েছিলেন, মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তা আর থামেনি। ১৯৪৩-১৯৮৭ এ দীর্ঘ সময়ে তিনি বিরামহীনভাবে লিখেছেন। বর্তমান যুগের আলেমদের কেউই তাঁর লেখার সমকক্ষতা অর্জন করতে পারেননি।[৫৬৮]

বাংলা সাহিত্যের পণ্ডিত

তিনি ছিলেন সুসাহিত্যিক পণ্ডিত। তাঁর লেখায় যেমন ছিল জোর আর ভাষা ছিল তেমনি সহজসরল। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জ্ঞান ভাণ্ডারে মাওলানা আব্দুর রহীম (র.) তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন রেখে গেছেন। তাঁর রেখে যাওয়া বিশাল ইসলামী সাহিত্য ভাণ্ডারে শতাধিক মৌলিক ও অনুদিত গ্রন্থ শোভা বর্ধন করছে।

নিরহংকার ও নির্লোভ ব্যক্তিত্ব হসেবে তাঁর নাম সর্বাগ্রে। ১৯৭৭ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন তাঁকে গবেষণার জন্য 'গবেষণা কর্ম পুরস্কার' ও ১৯৮৩ সালে 'অনুবাদের' জন্য পুরস্কার প্রদান করে।[৫৬৯]

তাঁর লিখিত গ্রন্থ

---

৫৬৬. প্রাগুক্ত
৫৬৭. প্রাগুক্ত
৫৬৮. প্রাগুক্ত
৫৬৯. প্রাগুক্ত

মাওলানা আব্দুর রহীম (র.) শুধুমাত্র একটি ব্যক্তিই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একটি জীবন্ত প্রতিষ্ঠান। তিনি জীবদ্দশায় যে বিশাল ইসলামী সাহিত্য রচনা করে গেছেন তার ফিরিস্তি নিচে প্রদান করা হলো:-

প্রকাশিত মৌলিক গ্রন্থ :

১. কালেমায়ে তাইয়্যেবা (প্রকাশিত ১৯৫০)

২. ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা (প্রকাশিত ১৯৫২)

৩. ইমাম ইবনে তাইমিয়া (প্রকাশিত ১৯৫৩)

৪. কমিউনিজম ও ইসলাম (প্রকাশিত ১৯৫৪)

৫. ইসলামী সমাজে মজুরের অধিকার (প্রকাশিত ১৯৫৪)

৬. ইসলামের অর্থনীতি (প্রকাশিত ১৯৫৬)

৭. সমাজতন্ত্র ও ইসলাম (প্রকাশিত ১৯৬২)

৮. সূরা ফাতিহার তাফসীর (প্রকাশিত ১৯৬৩)

৯. পাক-চীন বন্ধুত্বের স্বরূপ (প্রকাশিত ১৯৬৬)

১০. তাওহীদের তত্ত্বকথা (প্রকাশিত ১৯৬৭)

১১. সুন্নাত ও বিদ'আত (প্রকাশিত ১৯৬৭)

১২. হাদীস শরীফ ১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড (প্রকাশিত ১৯৬০)

১৩. হাদীস সংকলনের ইতিহাস (প্রকাশিত ১৯৬৯)

১৪. ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা (প্রকাশিত ১৯৬০)

১৫. পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ইসলামী সমাজ (প্রকাশিত ১৯৬৯)

১৬. অর্থনৈতিক সুবিচার ও হযরত মুহাম্মদ (স.) (প্রকাশিত ১৯৭৭)

১৭. হযরত মুহাম্মদের অর্থনৈতিক আদর্শ (প্রকাশিত ১৯৭০)

১৮. খিলাফতে রাশেদা (প্রকাশিত ১৯৭৪)

১৯. হাদীস শরীফ ২য় খণ্ড ও ৩য় খণ্ড (প্রকাশিত ১৯৭৫)

২০. মহাসত্যের সন্ধানে (প্রকাশিত ১৯৭৭)

২১. সূদ মুক্ত অর্থনীতি (প্রকাশিত ১৯৭৭)

২২. নারী (প্রকাশিত ১৯৭৮)

২৩. ইসলামী অর্থনীতির বাস্তবায়ন (প্রকাশিত ১৯৭৯)

২৪. ইসলামের দৃষ্টিতে বিজ্ঞান (প্রকাশিত ১৯৭৯)

২৫. খোদাকে অস্বীকার করা হচ্ছে কেন? (প্রকাশিত ১৯৮০)

২৬. আজকের চিন্তাধারা (প্রকাশিত ১৯৮০)

২৭. আল-কোরআনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ (প্রকাশিত ১৯৮০)

২৮. অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে ইসলাম (প্রকাশিত ১৯৬৬)

২৯. চরিত্র গঠনে ইসলাম (প্রকাশিত ১৯৭৭)

৩০. বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব (প্রকাশিত ১৯৭৭)

৩১. ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (প্রকাশিত ১৯৭৭)

৩২. জিহাদের তাৎপর্য দেহলভীর সমাজ দর্শন

৩৩. বিশ্ব সমস্যা ও ইসলাম

৩৪. অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে ইসলাম

৩৫. আল-কুরআনের আলোকে শিরক ও তাওহীদ

৩৬. আল-কুরআনের আলোকে রাষ্ট্র ও সরকার

৩৭. ইসলাম ও মানবাধিকার

৩৮. রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী দাওয়াত

৩৮. শিক্ষা ও সংস্কৃতি[৫৭০]

উর্দু থেকে অনুবাদ :

---

৫৭০. প্রাগুক্ত

৪০. ইসলামের জীবন পদ্ধতি (প্রকাশিত ১৯৪৯)

৪১. ইসলামের হাকীকত (প্রকাশিত ১৯৫০)

৪২. নামাজ রোজার হাকীকত (প্রকাশিত ১৯৫১)

৪৩. যাকাতের হাকীকত (প্রকাশিত ১৯৫১)

৪৪. হজ্জের হাকীকত (প্রকাশিত ১৯৫০)

৪৫. জিহাদের হাকীকত

৪৬. ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি (প্রকাশিত ১৯৫৪)

৪৭. আমাদের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সমস্যা (প্রকাশিত ১৯৫৪)

৪৮. মুসলমানদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত কর্মসূচী (প্রকাশিত ১৯৫২)

৪৯. আল্লাহর পথে জিহাদ (প্রকাশিত ১৯৫৫)

৫০. অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান (প্রকাশিত ১৯৫২)

৫১. ইসলামী শাষনতন্ত্রের মূলনীতি (প্রকাশিত ১৯৫৩)

৫২. ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রনয়ণ (প্রকাশিত ১৯৫৪)

৫৩. একমাত্র ধর্ম (প্রকাশিত ১৯৫৩)

৫৪. ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ (প্রকাশিত ১৯৫৫)

৫৫. ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি (প্রকাশিত ১৯৫৪)

৫৬. কাদিয়ানী সমস্যা (প্রকাশিত ১৯৫৪)

৫৭. ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ (প্রকাশিত ১৯৬০)

৫৮. তাফহীমুল কুরআন ১৯ খণ্ডে

৫৯. সমাজ গঠনে ছাত্রদের ভূমিকা (প্রকাশিত ১৯৭৭)

৬০. ইসলাম ও জাহেলিয়াত (প্রকাশিত ১৯৫৫)

৬১. ইসলাম ও জাতীয়াতাবাদ (প্রকাশিত ১৯৫৭)

৬২. হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর রাষ্ট্র ব্যবস্থা

৬৩. ইসলামী রাষ্ট্র সম্ভবপর?

৬৪. ঈমানের হাকীকত (প্রকাশিত ১৯৫২)[৫৭১]

আরবী থেকে অনুবাদ

৬৫. ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা

৬৬. জাতির উত্থান পতন ও পুনরুত্থান

৬৭. কিতাব-আত-তাওহীদ

৬৮. ইসলামের যাকাত বিধান, ১ম ও ২য় খণ্ড

৬৯. ইসলামে হালাল ও হারামের বিধান

৭০. বিংশ শতাব্দির জাহেলিয়াত

৭১. আহ্কামুল কুরআন

৭২. দ্বীন ইসলামের বৈশিষ্ট্য।[৫৭২]

অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলী

৭৩. জাতি ও জাতীয়তাবাদ

৭৪. অপরাধ দমনে ইসলাম

৭৫. ইসলামী শরীয়াতের উৎস

৭৬. হাদীছ শরীফ ৫ম খণ্ড

৭৭. দাস প্রথা ও ইসলাম

৭৮. সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন

৭৯. শ্রম ও শান্তি

৮০. উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষার বিকাশ ও বিস্তার

---

৫৭১. প্রাগুক্ত
৫৭২. প্রাগুক্ত

৮১. যাকাত ও উশর

৮২. ইতিহাস বিজ্ঞান

৮৩. সৃষ্টিতত্ত্ব

৮৪. ইসলামী নীতি দর্শন

৮৫. কুরআন কিভাবে পড়তে হবে

৮৬. আল-কুরআনে নবুওয়্যাত ও রিসালাত

৮৭. ভাই-বোন প্রিয়া (উপন্যাস)

৮৮. চির অনির্বাণ।[৫৭৩]

বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা

মাওলানা আব্দুর রহীম (র.) নিঃসন্দেহে বিংশ শতাব্দীর একজন সেরা আলিম ছিলেন। তিনি আমাদেরকে রেখে চলে গেছেন আজ ৩৪ বছর হলো। কিন্ত তিনি চলে গিয়েও আমাদের মাঝে তাঁর জ্ঞানের জগতে সমুজ্জল হয়ে রয়েছেন। জীবিত আব্দুর রহীমের চেয়ে মৃত আব্দুর রহীম যেন ফুলে-ফলে সুশোভিত হচ্ছেন প্রতিনিয়ত। তাঁর জীবন, জ্ঞান গবেষণা এবং তাঁর রাজনীতি জীবন নিয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে ৮টি এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রী সম্পন্ন হয়েছে। তাঁকে নিয়ে আরো সাতটি পিএইচডি ডিগ্রী হতে পারে বলে প্রাজ্ঞজন মনে করেন। মহাসত্যের সন্ধানে, বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব কমিউনিজম ও ইসলাম, ইসলামের দৃষ্টিতে বিজ্ঞান, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ইসলামী সমাজ, পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার এ গ্রন্থগুলোর একেকটির উপর একটি করে এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রী হতে পারে। তাঁর অনেক গ্রন্থই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যভুক্ত। এছাড়াও মাওলানার লেখা প্রবন্ধরাজী, চিঠি-পত্র এবং ক্যাসেট ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বিশ্বময়।[৫৭৪]

ইন্তেকাল

৫৭৩. প্রাগুক্ত
৫৭৪. প্রাগুক্ত

ক্ষণজন্মা এ মহান ব্যক্তি ১৯৮৭ সনের ১ অক্টোবর বৃহস্পতিবার রাজধানী ঢাকার রাশমনো হাসপাতালে দুপুর ১২.২০ ঘটিকায় ইহধাম ছেড়ে পরপারে যাত্রা করেন। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউসের মেহমান হিসেবে কবুল করুন।[৫৭৫]

➢ রজব তাইয়্যেব এরদোয়ান

বর্তমান বিশ্ব রাজনীতিতে আলোচিত একটি নাম, একটি সংগ্রাম, একটি সফল আন্দোলনের প্রাণ পুরুষ রজব তাইয়্যেব এরদোগান।[৫৭৬] বিগত বছরগুলোতে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা তাকে বিশ্ব রাজনীতিতে মহানায়ক বানিয়েছে। বর্তমান যুগের সুলতান সুলেমান বা মুসলিম বিশ্বের অঘোষিত সেনাপতি তকমাকে তাই জনগণ তার জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অনেক আগেই তিনি সেক্যুলার তুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা মুস্তফা কামাল আতাতুর্কের পর সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী শাসক হিসেবে ইতিহাসের পাতায় নাম লেখিয়েছেন। সবশেষ গত ২০১৮ সালের ২৪ জুনে তুরস্কে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে ক্ষমতা গ্রহণের পর[৫৭৭] বিশ্বব্যাপী আবারো জাদুর ঝিলিক দেখালেন এরদোয়ান।

গত তুর্কি নির্বাচনে প্রেসিডেন্সিয়াল পদে ৯৬ শতাংশ ভোটের ফলাফল অনুযায়ী এরদোগান একাই পেয়েছেন ৫২ দশমিক ৭ শতাংশ ভোট। মোট ৫ কোটি ৯৪ লাখ ৫৪ হাজার ৮৪০ জন ভোটারের মধ্যে প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ ভোট দিয়েছেন। এর মধ্যে এরদোয়ান পেয়েছেন ২ কোটি ৫৩ লাখ ৮৮ হাজার। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দী মুহাররেম পেয়েছেন ১ কোটি ৪৮ লাখ ৮১ হাজার। এদিকে একই সাথে অনুষ্ঠিত পার্লামেন্ট নির্বাচনেও বড় ব্যবধানে জয় পেয়েছে এরদোগানের দল জাস্টিস এন্ড ডেভলপমেন্ট (একে) পার্টি। এর পূর্বে তিনি ২৮ আগস্ট ২০১৪ তে তুরস্কের ১২তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৪ মার্চ ২০০৩ সালের ২৮ আগস্ট থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত টানা প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন তিনি।[৫৭৮]

২০০১ সালে তিনি এ.কে. পার্টি (জাস্টিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি) প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার অল্প দিনেই দলটি জনসমর্থনের দিক দিয়ে এক নাম্বারে চলে আসে। দলটি ১৯৮৪ সালের পর প্রথমবার একক দল হিসেবে পরপর চারবার (২০০২, ২০০৭, ২০১১, ২০১৪) সংসদীয় নির্বাচনে বিজয়ী হয়। রাষ্ট্রপতি হবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি ক্ষমতাসীন এ দলের সভাপতি ও প্রধান দলনেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এর পূর্বে তিনি ১৯৯৪-১৯৯৮ পর্যন্ত ঐতিহাসিক ইস্তাম্বুলের মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[৫৭৯]

---

৫৭৫. প্রাগুক্ত

৫৭৬. ড.হাফিজুর রহমান, *এরদোগান দ্যা চেঞ্জ মেকার* (ঢাকা: গার্ডিয়ান পাবলিকেশন, প্রকাশকাল ৩০ এপ্রিল-২০১৮), পৃ. ০৭

৫৭৭. মোস্তফা ফয়সাল পারভেজ, *আতাতুর্ক থেকে এরদোয়ান* (গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স, ৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, প্রকাশকাল মার্চ-২০১৯), পৃ. ১৯৮

৫৭৮. *এরদোগান দ্যা চেঞ্জ মেকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩-১৫৪

৫৭৯. *প্রাগুক্ত*

তুরস্কে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান

ইইউ'র সাথে বাণিজ্যিক প্রবেশাধিকার চুক্তি তার অন্যতম সফলতা। নতুন ব্রিজ, বিমান বন্দরসহ বৃহৎ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে তলাবিহীন তুরস্ককে শক্তিশালী বাজারে পরিণত করেন তিনি। তার সরকার বিগত দশ বছরের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও তুর্কি লিরার (তুর্কি মুদ্রা) মূল্য পুনঃনির্ধারণ করে তুরস্কের অর্থনীতিকে আরো শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে যায়। এরদোগান অতীতের সেক্যুলার সরকার কর্তৃক আরোপিত হিজাবের উপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল করেন, যা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের হৃদয়ে দাগ কাটে।[৫৮০]

তিনি অতীতে অটোম্যান শাসনাধীন দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন ও বিশ্বায়নে নেতৃস্থানীয় ও সৌহার্দ্যপূর্ণ রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তিকে মূললক্ষ্য রেখে বৈদেশিক নীতি (নব তুর্কীবাদ) গ্রহণ করেন। এছাড়া বিরোধী বিক্ষোভকারীদের ফলপ্রসূভাবে নিয়ন্ত্রণের কারণে বিশ্ব মহলে তিনি ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হন।

২০১৬ সালের যে ঘটনা তাকে মহানায়কের পর্যায়ে নিয়ে আসে তা হলো **১৫ জুলাই ২০১৬** সংঘটিত সামরিক অভ্যুত্থানের ব্যর্থ প্রচেষ্টা। সেনাবাহিনীর একটি অংশ নিয়ে গঠিত 'তুর্কি শান্তিপরিষদ' নামক সংগঠন এ অভ্যুত্থান করার প্রচেষ্টা চালায়।[৫৮১]

বিশ্ববাসী দেখেছে ওই দিন, নেতার আহ্বানে তুরস্কের অগণিত মানুষ রাস্তায় নেমে পড়ে। ইস্তাম্বুলের মানুষ চলন্ত ট্যাংকের সামনে শুয়ে পড়ে। জনগণের এমন বিস্ময়কর বাঁধার মুখে অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়। এ ক্যু ব্যর্থ করে দিতে নির্মমভবে **১৭**জন পুলিশসহ **১৬১**জন সাধারণ নাগরিককে শাহাদাত বরণ করতে হয়, আহত হন ১৪৪০ জন।[৫৮২] তুরস্কের আরও একটি নাটকীয় পরিবর্তন হল রাশিয়ার সাথে সুসম্পর্ক গঠন।

সিরিয়া সংকট সমাধান

সিরিয়ার চলমান সংকট নিয়ে রাশিয়া, সিরিয়া, তুরস্ক যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে এরদোয়ান বিশেষ অবদান রাখেন। সংকট নিরসনে রাশিয়ার সাথে সম্মিলিত উদ্যোগ এবং সিরিয়ার উদ্বাস্তুদের জন্য সীমান্ত খুলে দেওয়ার কথাও জানান তিনি।

---

৫৮০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৬
৫৮১. *প্রাগুক্ত*
৫৮২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৮

এছাড়া প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান আই এস দমনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে চলেছেন। ইতিমধ্যে ইরাকে তুর্কী সেনাবাহিনীও প্রেরণ করেন তিনি। তিনি বলেন আইএস জিহাদের নামে মুসলিমদের চরম ক্ষতি সাধন করে যাচ্ছে।[৫৮৩]

তুরস্ক-মধ্যপ্রাচ্য ও মুসলিম বিশ্ব সম্পর্ক

এরদোয়ানের নেতৃত্বে গঠিত একে পার্টি সরকারের শুরু থেকেই তুরস্ক মুসলিম বিশ্ব এবং মধ্যপ্রাচ্যের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে আলাদাভাবে গুরুত্ব প্রদান করে। সব মিলিয়ে তুরস্ক এখন মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু।[৫৮৪]

ফিলিস্তিন সমস্যা

এরদোয়ান সবসময় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী মুসলিমদের পক্ষে কাজ করেছেন এবং এখনো করে যাচ্ছেন। গত ২০১৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ট ট্রাম্প কর্তৃক জেরুসালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী ঘোষণা করার পর থেকে ট্রাম্প ও ইসরায়েলের বিপক্ষে শক্ত অবস্থান নিয়েছেন এরদোয়ান।[৫৮৫]

রোহিঙ্গা ইস্যু

মায়ানমারের নির্যাতিত মুসলিম জনগোষ্ঠীর পাশে সর্বদাই সুদৃঢ় অবস্থান ছিল এরদোয়ানের। মায়ানমারে রোহিঙ্গাদের উপর মানবতাবিরোধী জঘন্য নির্যাতনের কঠোর সমালোচনা করেন তিনি। এছাড়া নিজে সহায়তার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মহলকে রোহিঙ্গাদের সহযোগিতার জন্য আহবান জানান তিনি।[৫৮৬]

কাশ্মির সমস্যা

পাকিস্তান সফরে এসে কাশ্মির নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন এরদোয়ান। ভারত-পাকিস্তানকে দ্রুত বিষয়টি সমাধান করতেও পরামর্শ দেন তিনি। প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের শক্তিশালী নেতৃত্বের কারণে তুরস্ক আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অন্যতম পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে যাচ্ছে।[৫৮৭]

মুসলিম বিশ্ব ঐক্যের ডাক

---

৫৮৩. *প্রাগুক্ত*
৫৮৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৮-২৫৯
৫৮৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৩
৫৮৬. *প্রাগুক্ত*
৫৮৭. *প্রাগুক্ত*

তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহরে দু'দিনব্যাপী (ওআইসি) শীর্ষ সম্মেলনে মুসলিম বিশ্বের সকল ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যের ডাক দেন এরদোগান। এ সম্মেলনের মুসলিম দেশগুলোর মধ্যকার বিদ্যমান তিক্ততা দূর করে সুসম্পর্কের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের মর্যাদা পুনরুদ্ধারের আহ্বান জানান তিনি। তাঁর বক্তব্য ছিল- 'আমাদের ধর্ম ইসলাম, শিয়া বা সুন্নি নয়'।

এছাড়া মুসলিম দেশগুলোর নিকট তুরস্ক পরিণত হয়েছে রোল মডেলে। আগামী দিনগুলোতে এরদোয়ানের এ বলিষ্ঠ ভূমিকা মুসলিম বিশ্বের শান্তি ও ঐক্য প্রক্রিয়াকে যে আরো সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে তার আর বলার অপেক্ষা রাখে না।[৫৮৮]

সুলতান হবার সম্ভাবনা

গণতান্ত্রিক তুরস্কে তিনি প্রথমে একে পার্টি গঠন করেন। প্রথমত নির্বাচনে জয়লাভ করেই বহু চড়াই উৎরাইয়ের পর প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন। দীর্ঘদিন সে দায়িত্ব যথাযথ আঞ্জাম দিয়ে সংবিধান সংশোধন করে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করে ব্যাপক ভোটে নির্বাচিত হলেন। গোটা মুসলিম জগতের সাথে অতীতের উসমানী সুলতানদের মত সুসম্পর্ক গড়ে তুলে চলেছেন। এভাবেই সামনে এগিয়ে চলছেন যার কারণে তাঁর ভক্তবৃন্দ, সমালোচক সকলেরই বক্তব্য তিনি সুলতান হবার ইচ্ছা পোষণ করছেন।[৫৮৯]

হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনা

রজব তাইয়্যেব এরদোয়ান ঐতিহাসিক আয়া সোফিয়াকে পুনরায় মসজিদে রূপান্তর করেছেন। তিনি যেভাবে তুরস্ককে শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, সামরিকসহ ইসলামি চিন্তা চেতনায় এগিয়ে নিয়ে চলছেন আশা করা যায় তা উসমানী খিলাফাহ-এর আদলে আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করবে। এর মাধ্যমে মুসলিম বিশ্ব হারানো গৌরব ফিরে পাবে। মুসলিমদের ওপর বিভিন্ন দেশে চলমান অত্যাচার নির্যাতন হ্রাস পাবে। ঘুরে দাঁড়াবে মুসলিম বিশ্ব।

খিলাফাহ ফিরিয়ে আনার ইঙ্গিত

সাম্প্রতিক এরদোয়ানের বক্তব্য বিবৃতি ও কর্মকাণ্ডে একটি বিষয় ফুটে ওঠছে– আর তা হল ইসলামী খিলাফাহ। এতে যদি তিনি সক্ষম হন এটা গোটা মুসলিম বিশ্বের জন্য এ শতাব্দির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি হবে।

---

৫৮৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৭-২৬৮
৫৮৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৬

তুর্কি জাতির বৈশিষ্ট্য

অতীতের তুর্কি জাতি ছিল পরিশ্রম প্রিয় সৎ, চরিত্রবান, ন্যায়-নিষ্ঠ ও উন্নত মনোবল সম্পন্ন। সহজ সরল ও অনাড়ম্বর জীবনের কাছাকাছি অবস্থানের কারণে তাদের নৈতিক-চারিত্রিক ও সামজিক রোগ ব্যাধির হাত থেকে তারা নিরাপদ ছিল, যেসব রোগে প্রাচ্য ভূখণ্ডের অন্যান্য মুসলিম জাতিগোষ্ঠী আক্রান্ত হয়ে দূর্বল হয়ে পড়েছিল। তাদের কাছে এমন সামরিক শক্তি ছিল যা দিয়ে তারা ইসলামের বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক প্রাধান্য কেবল বজায় রাখতেই নয় বরং চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিতে এবং প্রতিদ্বন্দী ও প্রতিপক্ষ জাতিগুলোর আগ্রাসন প্রতিরোধ করতে পারে এবং দুনিয়ার নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হতে পারে। তারা তাতে সক্ষমও হলেন একই সময়ে উসমানী খিলাফাহ তিনটি মহাদেশ তথা এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বুকে রাজত্ব করেছে।[৫৯০] বর্তমানেও তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সে পথে তুর্কি জাতি সাহসিকতার সাথে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে চলছে।

➢ মুহাম্মাদ ইবন সালমান

বর্তমান বিশ্বের আলোচিত ও সমালোচিত প্রভাবশালী অল্পবয়সী একজন সৌদি প্রিন্স (অলিউল আহাদ) হলেন মুহাম্মাদ ইবন সালমান। যিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হয়ে সময়োপযোগী একটি মুসলিম সামরিক জোট গঠনের ঘোষণা দিয়ে ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে ৩৪টি মুসলিম দেশের সমন্বয়ে এ সামরিক জোটের পদযাত্রা শুরু করেন। পরবর্তীতে তা ৪১ টি মুসলিম দেশের সামরিক ঐতিহাসিক জোটে পরিণত হয়। এ জোট গোটা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সামরিক জোট হিসেবে ইতিহাসে জায়গা করে নেয়। তবে পরাশক্তিগুলোর চক্রান্ত ও আরব বিশ্বের কিছু মুনাফিক নেতার ষড়যন্ত্রের কারণে এর কার্যক্রমে ভাটা পড়েছে। মুহাম্মাদ ইবন সালমানও মিস গাইডেড হচ্ছেন বলে ইসলামী চিন্তাবিদগণ মতামত ব্যক্ত করছেন।[৫৯১]

এছাড়াও বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন ব্যানারে বাংলাদেশে ইসলামী ঐক্য প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এমন অনেকে ইন্তেকাল করেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের সাবেক খতীব মাওলানা ওবায়দুল হক (র.), বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের সাবেক আমীর মাওলানা আহমাদুল্লাহ আশরাফ (র.), মাসিক মদীনার সাবেক সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (র.), ইসলামী ঐক্যজোটের সাবেক চেয়ারম্যান মাওলানা আব্দুল লতীফ নিজামী (র.), যারা উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠায় গৌরবোজ্জল ভূমিকা পালন করে গেছেন।

---

৫৯০. *মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কি হারালো?* প্রাগুক্ত
৫৯১. *উইকিপিডিয়া*

অনেকে এখনো মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রচেষ্টায় দিনরাত পরিশ্রম করছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান সাইয়্যেদ মাওলানা কামালুদ্দীন আব্দুল্লাহ জা'ফরী (হাফিযাহুল্লাহ), তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসার সাবেক অধ্যক্ষ মাওলানা যাইনুল আবেদীন (হাফিযাহুল্লাহ), আল হাইয়াতুল উলইয়ার চেয়ারম্যান মুফতি মাওলানা মাহমুদুল হাসান (হাফিযাহুল্লাহ), বাংলাদেশ মসজিদ মিশনের জেনারেল সেক্রেটারী ড. মুফতি মাওলানা খলীলুর রহমান মাদানী (হাফিযাহুল্লাহ), জামিয়া ইমদাদিয়ার মুহতামিম মাওলানা আবু তাহের জিহাদী (হাফিযাহুল্লাহ)সহ অসংখ্য ওলামায়ে কেরাম। আল্লাহ তাঁদের প্রত্যেকের যাবতীয় ঐক্য প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় তাঁদের নাম আর এখানে উল্লেখ করা হলো না।

পঞ্চদশ অধ্যায়

সুপারিশমালা

নিম্নে বিশ্ব মুসলিম ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সুপারিশমালা প্রদত্ত হল:-

১. সকলের জন্য সুশিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে

ঐক্যের অন্যতম হাতিয়ার সুশিক্ষা। যে শিক্ষা ব্যক্তিকে বিনয়ী হতে শিখায়, নিজস্ব মূল্যবোধ তৈরী করে দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে কাজ করতে যোগ্য করে তোলে সে শিক্ষা সর্বস্তরে নিশ্চিত করতে হবে। যে শিক্ষা মানুষকে ভালবাসতে শিখায়, কাছে টানতে শিখায়, মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূরীকরণে প্রেরণা দেয় তা আজ অনেক বেশি প্রয়োজন। আর তা হলো আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত ও রাসূল (স.) প্রদর্শিত শিক্ষা ব্যবস্থা। কিন্তু যে শিক্ষা পারস্পরিক বিভেদ শিখায় বা বিভেদকে উসকে দেয় আপাতত সে শিক্ষা বর্জন করতে হবে।

২. প্রকৃত মু'মিন হতে হবে

বিশ্বের প্রতিটি মু'মিনের উচিৎ প্রকৃত মু'মিন হওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: 'হে মু'মিনগণ! তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি এবং সে কিতাবের প্রতি যা আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর অবতীর্ণ করেছেন। আর সে কিতাবের প্রতিও যা তার পূর্বে তিনি নাযিল করেছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং শেষ দিবসকে অস্বীকার করে সে সীমাহীন পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়।"[৫৯২] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন: "আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মু'মিন হও তোমরাই বিজয়ী হবে।"[৫৯৩]

৩. ইসলামকে অনুসরণ করতে হবে

ইসলাম মানব জাতির মুক্তি ও কল্যাণের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত্ব একমাত্র পরিপূর্ণ জীবন বিধান। পৃথিবীতে ইসলামী অনুশাসন বাদ দিয়ে প্রকৃত কোন কল্যাণ অতীতেও কেউ

---

৫৯২. আল কুরআন, ০৪:১৩৬
৫৯৩. আল কুরআন, ০৩:১৩৯

পায়নি ভবিষ্যতেও পাবে না। সুতরাং ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রে সর্বত্র ইসলামকে অনুসরণ করতে হবে।

৪. কুর'আনের কাছে ফিরে আসতে হবে

মানব জাতিকে সঠিক পথের দিশা দানের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সর্বশেষ নাযিলকৃত আসমানী কিতাব আল কুর'আন। সুতরাং জীবনের সকল ক্ষেত্রে সঠিক পথে চলার জন্য সকলকে কুর'আনের কাছে ফিরে আসতে হবে। বিশেষ করে কেউ না আসলেও প্রতিটি মুসলিমকে অবশ্যই কুর'আনের কাছে ফিরে আসতে হবে। আর প্রত্যেক মুসলিম নিয়মিত অর্থবুঝে সূরা হুজুরাত তিলাওয়াত করতে হবে এবং সে অনুযায়ী আমল করতে হবে।

৫. ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে ও ঐক্যের মানসিকতা লালন করতে হবে

কুর'আন এবং সুন্নাহ এর মাধ্যমে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ঐক্যবদ্ধ থাকা ফরয এ বিষয়টি সকল মুসলিমকে হৃদয় দিয়ে সর্বদা উপলব্ধি করতে হবে এবং ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। মুসলিম উম্মাহর প্রত্যেক সদস্য মত বৈচিত্র্য ও মতভিন্নতাসহকারেই মহান রবের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ঐক্যের মানসিকতা রেখে যাবতীয় কাজ চালিয়ে যেতে হবে। সর্বাবস্থায় এ চিন্তা লালন করতে হবে 'নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে জাতিকে একতাবদ্ধ রাখবো। আর তা না পারলেও অন্তত নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে কাউকে বিচ্ছিন্ন করবো না।'

৬. বিশ্ব ইসলামী গবেষণা বোর্ড গঠন করতে হবে

ওআইসির মাধ্যমে সমসাময়িক প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় সকল মাযহাবের বাছাই করা শ্রেষ্ঠ আলেমগণকে নিয়ে একটা বিশ্ব ইসলামী গবেষণা বোর্ড গঠন করে প্রতি বছর অন্তত একবার সবাই একত্রিত হয়ে উম্মাহর সমসাময়িক বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করে নিজ নিজ বলয়ে তা বাস্তবায়ন করাবেন। এতে মুসলিম উম্মাহর মাঝে দীর্ঘদিন ধরে যে দূরত্ব তৈরী হয়ে রয়েছে তা দূরীভূত হবে।

৭. রাজনীতিবিদদের নিয়ে বোর্ড গঠন করতে হবে

ওআইসি সদস্যভুক্ত প্রতিটি দেশে ইসলামী রাজনীতিবিদগণ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে নিয়ে একটা বোর্ড গঠন করবেন, এর মাধ্যমে মুসলিম দেশগুলোতে যে রাজনৈতিক বিভাজন ও রেষারেষি রয়েছে তা দূরীভূত করতে হবে। এ ছাড়াও দেশে দেশে মুসলিম উম্মাহ আজ শতধাবিভক্ত। ওআইসিভুক্ত প্রতিটি মুসলিম দেশে এমন একটা বোর্ড থাকবে যেখানে সে দেশের মুসলিমদের মাঝের যাবতীয় বিভক্তি দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় সভা, সেমিনার

ইত্যাদী নিয়মিত আয়োজন করা হবে। দেশীয়ভাবে যেগুলো সমাধান সম্ভব হবে না ওআইসির কেন্দ্রিয় সম্প্রীতি বোর্ডে তার সামাধান করতে হবে।

৮. মীমাংসা বোর্ড গঠন করতে হবে

মুসলিমদের মাঝের প্রচলিত ভুলগুলো চিহ্নিত করে তা সংশোধন করতে হবে। কুর'আনুল কারীমের ৪৯নং সূরার ০৯নং আয়াতের দিক নির্দেশনার আলোকে বিবাদমান মুসলিম দল, দেশ ও সরকারের মাঝে মীমাংসার জন্য একটি শক্তিশালী মীমাংসা বোর্ড গঠন করতে হবে। এ দায়িত্বটা ওআইসি পালন করলে ফলপ্রসূ হবে।

৯. প্রাকৃতিক সম্পদ জনকল্যাণে ব্যয় করতে হবে

বর্তমান প্রতিটি মুসলিম দেশেই প্রচুর পরিমান প্রাকৃতিক সম্পদ আল্লাহ তা'আলা দান করেছেন, তা কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা রাজা বাদশার সম্পদ নয় বরং তা মুসলিম উম্মাহর জন্য আল্লাহ প্রদত্ত্ব সম্পদ। সুতরাং মুসলিম উম্মাহর কল্যাণের জন্যই তা ব্যয় এবং ব্যবহার করতে হবে। কারো ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য নয়।

১০. মিডিয়া প্রতিষ্ঠা করতে হবে

বর্তমান পৃথিবীর এ প্রান্তের খবর ঐ প্রান্ত থেকে মুহুর্তের মধ্যে পাওয়া যায়। যে কোন খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বময়। এত তাড়াতাড়ি অতীতে কোন খবর ছড়িয়ে পড়ার ইতিহাস নেই। এ কারণে খবরের সত্য মিথ্যা অনেক সময়ই যাছাই বাছাই করা হয় না। আর মিথ্যা তথ্য দিয়ে বিশ্বের পরাশক্তিগুলো যুগ যুগ ধরে মাযলুম মুসলিমদেরকে কোনঠাসা করে রেখেছে। এছাড়াও মুসলিমদের অনেক ভাল ভালো কাজও শুধু মিডিয়া না থাকার কারণে কেউ জানে না। বিবিসি, সিএনএন এর মোকাবেলায় এ মানের কোন মিডিয়া আজ পর্যন্ত তৈরী করা সম্ভব হয়নি। এ জন্য দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রতিটি মুসলিম দেশে শক্তিশালী মিডিয়া প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ওআইসিভুক্ত দেশগুলো কেন্দ্রিয়ভাবে সত্যের প্রচার ও প্রসার এবং মুসলিমদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষাকারী মিডিয়া ব্যবস্থাপনা করা সময়ের দাবী।

১১. ইন্টারনেটের বিকল্প ইন্টারনেট তৈরী করতে হবে

বর্তমান ইন্টারনেট সিস্টেম সবটাই অমুসলিমদের তৈরী ও তাদের নিয়ন্ত্রণে। এ প্রযুক্তির বিষয়ে মুসলিম বিজ্ঞানীগণ এগিয়ে আসা উচিৎ এবং পৃথিবীর প্রায় ২০০ কোটি মুসলিমের জন্য বিকল্প কোন আয়োজন সামনে নিয়ে আসা দরকার। কারণ নেট দুনিয়া নিয়ন্ত্রণ করেই আজকে ইসলামের দুশমনরা তথ্য প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে মুসলিমদেরকে দাবিয়ে

রেখেছে। সবগুলো মুসলিম দেশ একত্রে চিন্তা ও গবেষণা করলে এ বিষয়ে বিকল্প কিছু সামনে নিয়ে আসা অসম্ভব নয়।

১২. নিজস্ব স্যাটেলাইট বানাতে হবে

দু-একটি মুসলিম দেশ ছাড়া অধিকাংশ মুসলিম দেশেরই নিজস্ব কোন স্যাটেলাইট ব্যবস্থা নেই। বরং ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের কাছ থেকে ধার করা স্যাটেলাইট দিয়ে নিজেদের প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা করছে, এটা খুবই হতাশাজনক বিষয়। এজন্য প্রতিটি মুসলিম দেশেরই উচিৎ নিজেদের ব্যবস্থাপনায় নিজেদের স্যাটেলাইট উৎক্ষেপন এবং নিজেদের প্রযুক্তি সংক্রান্ত উন্নতি নিজেরাই পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

১৩. ঐক্যের স্বার্থে সংবাদ যাছাই করতে হবে

যে কোন সংবাদ পেলেই বিশ্বাস করা যাবে না। কারণ এতে দ্বন্দ ও সংঘাতের সৃষ্টি হয়। একে অপরের প্রতি অপবাদ আরোপ করার কারণে বহু মারামারি দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়। এক দল আরেক দলের প্রতি, একদেশ আরেক দেশের প্রতি বিরোপ প্রতিক্রিয়া দেখায়। এমনকি কখনো কখনো যুদ্ধও লেগে যায়। অতীতে এমন অসংখ্য রেকর্ড রয়েছে। সুতরাং কারো বিরুদ্ধে কোন সংবাদ পেলে আগে তা যাছাই করতে হবে।

১৪. অভ্যন্তরীণ কোন্দল মিটিয়ে ফেলতে হবে

মুসলিম বিশ্বকে নিজেদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল মিটিয়ে যে কোন মূল্যে ঐক্যবদ্ধ হতেই হবে। ধর্মীয়, সামাজিক, সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের দিকে মুসলিম দুনিয়াকে অবশ্যই পুরো মনোযোগ দিতে হবে। একটি সহনশীল ও স্থিতিশীল রাজনৈতিক কাঠামো নিশ্চিত করতে হবে। স্থিতিশীল রাজনৈতিক কাঠামো ছাড়া সামরিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। মুসলিমদের বর্তমান বিপর্যয়ের জন্য মুসলিম দুনিয়ার কিছু লোভী ও অমুসলিমদের সেবা দাস নেতৃবৃন্দ ও তাদের দোসররাই দায়ী। তাদের সেচ্ছাচারী মনোভাব ও অপচয়ের দরুন জনবল ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। তাদের গাফলতির দরুন অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। নেতৃবৃন্দ উপযুক্তভাবে উন্নয়নের পথে মুসলিম উম্মাহকে পরিচালিত করলে অতিশীঘ্রই মুসলিম দুনিয়া অন্ধকার থেকে আলোর রাজ্যে প্রবেশ করবে এতে কোন সন্দেহ নেই। তারা অতীতের হারানো গৌরব ফিরে পাবে, ইন-শা-আল্লাহ।

১৫. শক্তিশালী মুসলিম দেশের নেতৃত্ব নির্বাচন করতে হবে

মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষায় একনিষ্ঠ তুর্কি অথবা আরব অথবা এশিয়ান কোন মুসলিম দেশকে নেতৃত্বের আসনে বসিয়ে মুসলিম বিশ্ব এক হওয়া সময়ের একান্ত দাবী। সুতরাং এ বিষয়ে

মুসলিম দেশের নেতৃবৃন্দকে পদক্ষেপ নিতে হবে। এটা যদি সম্ভব না হয় তবে শক্তিশালী যে কোন একটি মুসলিম দেশ নেতৃত্বদানের জন্য এগিয়ে এসে আগ্রহীদেরকে নিয়ে উম্মাহর হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য বলিষ্ঠ কার্যক্রম শুরু করতে হবে।

১৬. খিলাফত ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে

ইসলামী খিলাফত বর্তমান মুসলিম উম্মার অস্তিত্ব ও সম্মান রক্ষার জন্য অনেক বেশি প্রয়োজন। মুসলিমদের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনা ও সর্বোপরি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং উম্মাহর অস্তিত্ব রক্ষার সার্থেই খিলাফত ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে।

১৭. ইয়াহুদী ও নাসারাদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না

আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদী ও নাসারাদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং কোনভাবেই তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে কেউ তাদের সাথে বন্ধুত্ব করলে সে তাদেরই দলভুক্ত হবে। নিশ্চই আল্লাহ যালিমদেরকে হিদায়াত করেন না।"[৫৯৪]

১৮. আসল বন্ধু ও আসল শত্রু চিনতে হবে

মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি সদস্যকে আসল বন্ধু ও আসল শত্রু চিনতে হবে। প্রকৃতপক্ষে এক মু'মিন আরেক মু'মিনের ভাই, এক মুসলিম আরেক মুসলিমের বন্ধু। সুতরাং মুসলিমের প্রকৃত বন্ধুত্ব মুসলিমের সাথেই হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 'নিশ্চই মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই।'[৫৯৫] পক্ষান্তরে মুসলিমদের আসল শত্রু হল ইয়াহুদী ও মুশরিকরা। সুতরাং তাদের বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছেন: "আপনি মানবমণ্ডলীর মধ্যে ইয়াহুদী ও মুশরিকদেরকে মুসলিমদের সাথে অধিক শত্রুতা পোষণকারী পাবেন।"[৫৯৬]

১৯. সামরিক শক্তি অর্জন করতে হবে

মুসলিম দেশগুলোর উচিৎ আধুনিক মুসলিম দেশগুলো থেকে সামরিক অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়পূর্বক বর্তমান এ শতাব্দিতে নিজেরা বিজয় অর্জনের জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা। বাংলাদেশসহ প্রতিটি মুসলিম দেশ মুসলিম দেশগুলোর সাথে সামরিক চুক্তিবদ্ধ থাকা।

---

৫৯৪. আল কুরআন, ০৩:১৩৯
৫৯৫. আল কুরআন, ৪৯:১০
৫৯৬. আল কুরআন, ০৫:৮২

Dhaka University Institutional Repository

যেন কোন ইসলাম বিদ্বেষী শত্রুদেশ কখনো কোন ধরনের ষড়যন্ত করলে দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে দেয়া যায়।

২০. শত্রুকে পরোয়া করা যাবে না

ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রুরা যত শক্তিশালীই হোক না কেন তাদেরকে পরোয়া না করা। বদর যুদ্ধ, ওহুদ যুদ্ধ, খন্দক যুদ্ধ, তাবুক অভিযান ইত্যাদী তার জ্যান্ত উদাহরণ। এ সকল যুদ্ধে অমুসলিম সৈন্য সংখ্যা ছিল মুসলিমদের কয়েকগুণ বেশি। তাদের অস্ত্রশস্ত্রও ছিল আধুনিক। কিন্তু মুসলিম সৈন্য বাহিনী তা পরোয়া করেননি। স্মরণীয় বিজয় আল্লাহ মুসলিমদেরকেই দান করেছেন। সুতরাং ভয় করতে হবে একমাত্র আল্লাহকে। আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকেও ভয় করা জায়েয নয়।

২১. প্রতিরোধ যুদ্ধের সূচনা করতে হবে

বর্তমান মুসলিমগণ দীর্ঘদিন ঐক্যবদ্ধভাবে এক নেতার নেতৃত্বে কোন লড়াই ও সংগ্রামের সুযোগ পাচ্ছেন না। যদি মুসলিমদের হাতে কাফির ও মুশরিক কিংবা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এজেন্ডা থাকতো তবে নিঃসন্দেহে সবাই তাতে ঐক্যবদ্ধভাবে সে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করতো। এতে ছোট খাট বিষয় নিয়ে নিজেদের মাঝে যে দ্বন্দ ও অনৈক্য তা দূর হয়ে যেত। সুতরাং বিশ্ব মুসলিমদের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক যুলমের মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ যুদ্ধের শুভ সূচনা করতে হবে।
এতে দু'টো উপকার; এক. নিজেদের হারানো অধিকার ফিরে পাওয়া যাবে, দুই. ছোট-খাট মতপার্থক্য ভুলে সব এক হয়ে যাবে। অতীতে এমন অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। যেমন, আরব ইসরাঈল যুদ্ধের সময় সব মুসলিম দেশগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

২২. কাফিরদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে

বর্তমান পৃথিবীর সমগ্র কুফরি শক্তি মুসলিমদের সমূলে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে চক্রান্ত ষড়যন্ত্র করছে এবং যুদ্ধও করছে। এতে তারা মুসলিমদের কী পরিমাণ ক্ষতি করছে তা ভাষায় প্রকাশ করে শেষ করা যাবে না। মুসলিমদের অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে তারা এ অন্যায় যুদ্ধ ইচ্ছাকৃতভাবে মুসলিম উম্মাহর ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। সুতরাং মুসলিম উম্মাহর নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধভাবে কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।

২৩. দুনিয়ার জীবনকে আসল জীবন মনে করা যাবে না

দুনিয়া হচ্ছে পরকালের ক্ষেত্র স্বরূপ। দুনিয়াকে আসল মনে করে পরকালকে উপেক্ষা করা বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়, সুতরাং দুনিয়াকে আসল ভাবা যাবে না। বরং

Dhaka University Institutional Repository

দুনিয়ার জীবনের যাবতীয় কাজ যেন পরকালকে কেন্দ্র করেই হয় সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। প্রাধান্য দিতে হবে পরকালকে দুনিয়াকে নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "আর অবশ্যই আখিরাত তোমার জন্য দুনিয়ার জীবন থেকে উত্তম।"[৫৯৭]

২৪. বিনয়ী হতে হবে

উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য একজন আরেকজনকে বিভিন্ন বিষয়ে ছাড় দিতে হবে। আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্য অন্যের প্রতি বিনয়ী হতে হবে। রাসূল (স.) বলেছেন: "যে বক্তি আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয় আল্লাহ তার সম্মান বাড়িয়ে দেন।"[৫৯৮] প্রয়োজনে নিজে হারতে শিখতে হবে অন্য মুসলিম ভাইকে জিতিয়ে দেয়ার মানসিকতা লালন করতে হবে।

২৫. অন্য মুসলিমের প্রতি সু-ধারণা পোষণ করতে হবে

অন্য মুসলিমের প্রতি সু-ধারণা পোষণ করতে হবে। তার বিষয়ে মন্দ ধারণা থেকে বিরত থাকতে হবে। প্রতিটি মুসলিমের চিন্তা-চেতনা ও দীনি কাজকে সম্মানের চোখে দেখতে হবে। তাদের কাজের মূল্যায়ন করতে হবে। মুসলিম হিসেবে আরেক মুসলিমের ভাল কোন কাজ দেখলে তার প্রশংসা করতে হবে। হিংসা থেকে দূরে থাকতে হবে। সে কোন অন্যায় করে বসলে প্রকাশ্যে জনসম্মুখে তার তিরস্কার না করে প্রয়োজনে একান্তে তার ভুল ধরিয়ে দিতে হবে। তার মাগফিরাতের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করতে হবে।

২৬. ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিতে হবে

মানুষ মাত্রই ভুল আছে। কোন মুসলিম কোন ভুল করলে তা নিয়ে মাতামাতি না করা। নিজের সাথে কোন অন্যায় করলে সম্ভব হলে তা আল্লাহর সন্তোষ লাভের আশায় ক্ষমা করে দিতে হবে। শরয়ী' অসুবিধা না থাকলে অন্য মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখতে হবে। নবী (স.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে আল্লাহও তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখেন।"[৫৯৯]

২৭. বিপদে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে

দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে যে কোন সময়, যে কেউ যে কোন বিপদে-মুসিবতে পতিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। মুসলিম হিসেবে আরেকজন মুসলিমের বিপদে এগিয়ে আসতে হবে। তাঁর প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। নবী (স.) বলেছেন: "আল্লাহ

---

৫৯৭. আল কুরআন, ৯৩:০৪
৫৯৮. *বায়হাকী* (আল মাকতাবাতুশ শামিলাহ, ২য় সংস্করণ, তা. বি), হাদীস নং. ৭৯১৭
৫৯৯. *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৬৬০৮

তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দাহকে সাহায্য করতে থাকেন যতক্ষণ বান্দাহ তার ভাইকে সাহায্য করতে থাকে।"[৬০০]

২৮. ওআইসিকে পুনর্গঠন করতে হবে

ক. মুসলিম দেশগুলোর সফল রাষ্ট্র প্রধানগণের মধ্য থেকে সাহসী ও উদ্যোমী একজনকে চেয়ারম্যান ও একজনকে মহাসচিব নির্বাচিত করে তার লক্ষ্য বাস্তবায়নের যথাযথ ক্ষমতা প্রদান করতে হবে। যেন তা জাতিসংঘের চেয়েও শক্তিশালী ও কার্যকর হয় সে বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে গুরুত্ব দিতে হবে। ওআইসি তার কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে জাতিসংঘের কাছে ধর্ণা না দিয়ে নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরা বাস্তবায়নের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। মোটকথা ওআইসিকে মুসলিম উম্মাহর সার্থে সময়োপযোগী ও কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য প্রস্তুত করতে হবে।

খ. ওআইসির জন্য মুসলিম দেশগুলোর প্রত্যক্ষ সহায়তায় আন্তর্জাতিক সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

গ. ওআইসির শান্তি রক্ষা বাহিনী প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

ঘ. নিয়মিত প্রতি বছর ওআইসির আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন ও সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে।

ঙ. ওআইসিভুক্ত দেশগুলোতে একই পাসপোর্টে যাতায়াত সুবিধা চালু করতে হবে।

চ. ওআইসিভুক্ত দেশগুলোতে একই মুদ্রা ব্যবস্থা প্রবর্তণ করতে হবে।

ছ. আন্তজার্তিক ইসলামী স্বাস্থ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

জ. তথ্য ও প্রযুক্তি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

ঝ. আন্তর্জাতিক শিক্ষা সংস্থা চালু করতে হবে।

ঞ. বিশ্বের জনপ্রিয় সেরা আলেমগণকে মুসলিমদের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনা এবং ওআইসির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সফল করার জন্য শুভেচ্ছাদূত হিসেবে নিয়োগ প্রদান করতে হবে।

---

৬০০. *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

➢ শেষকথা

সমগ্র পৃথিবীতে বর্তমানে দুইশত কোটি মুসলিম রয়েছে। এরপরও পৃথিবী জুড়ে নির্মমভাবে নির্যাতিত-নিপীড়িত হচ্ছে মুসলিম জাতিই। এর অন্যতম কারণ একটাই অন্যান্য জাতির মত মুসলিম জাতি ঐক্যবদ্ধ নয়। আজকে ভারতের কাশ্মীরসহ সে দেশের প্রতিটি রাজ্যে মুসলিমরা নির্যাতনের শিকার। গুজরাটের মুসলিমদেরকে কীভাবে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে বিশ্ববাসী তা দেখেছে। কিছুদিন আগে দিল্লির মুসলিমদের উপর কী নির্যাতন চালানো হয়েছে তাও বিশ্ব বিবেক দেখেছে। মায়ানমারের মুসলিমদেরকে রোহিঙ্গা নাম দিয়ে কীভাবে অত্যাচার নির্যাতন চালানো হয়েছে তার প্রত্যক্ষদর্শী গোটা পৃথিবী। গত কয়েক বছরে সে দেশের লক্ষাধিক মাযলুম মুসলিমকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে সে দেশেরই বৌদ্ধ দস্যুরা। জানের ভয়ে পালিয়ে আসা প্রায় দশ লক্ষের অধিক মিয়ানমারের নির্যাতিত মুসলিমকে বাংলাদেশে আশ্রয় দিতে হয়েছে। চীনের ঝিংঝিয়াংয়ে ভয়াবহ মুসলিম নির্যাতন চলছে। আফগানিস্তান, ইরাক, লিবিয়া, সিরিয়া, ইয়ামান সর্বত্রই বিভিন্ন অযুহাতে মুসলিম নিধন চলছে। ফিলিস্তিনের মুসলিমদের উপর হাতে গোনা ইয়াহুদী সম্প্রদায় দীর্ঘ সত্তর বছরের অধিক সময় ধরে নির্মম নির্যাতন চালাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ ফিলিস্তিনি মুসলিমকে হত্যা করেছে। বহু মুসলিমকে তাদের বাড়ী-ঘর থেকে উচ্ছেদ করেছে। আজকে ফিলিস্তিনের মুসলিমরা এত মাযলুম ও অসহায় জীবন যাপন করছে যে, মনে হয় তারা ছাড়া তাদের পাশে দাঁড়ানোর মত কোন মুসলিম পৃথিবীর কোথাও বেঁচে নেই। আর তাদের ওপর যে ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের লোকেরা নির্যাতন চালাচ্ছে তাদের ভাবটা এমন যেন গোটা প্রথিবী জুড়ে ইয়াহুদীদের বসবাস, তারা পৃথিবীর অপ্রতিরোধ্য শক্তি এবং গোটা পৃথিবীটা যেন তাদের! তারা এ ধৃষ্ঠতা দেখাতে পারছে কীভাবে? কোন শক্তির বলে? জবাব একটাই পৃথিবীতে দুইশত কোটি মুসলিম আছে ঠিকই কিন্তু একতাবদ্ধ নয়। অথচ পৃথিবীর সব ইয়াহুদীকে একত্রিত করলেও মুসলিমদের একশভাগের একভাগ হবে না কিন্তু তারা ঐক্যবদ্ধ, বিশেষ করে মুসলিম নির্যাতনে তারা একতাবদ্ধ। এমনকি পৃথিবীর সব কুফরি শক্তিই (ইয়াহুদী, মুশরিক, বৌদ্ধ, খৃষ্টান) মুসলিমদের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ।

আর দুঃখজনক হলেও সত্য, এক আল্লাহর প্রতি ঈমান, এক কুর'আনের অনুসারী, এক কিবলার অধিকারী ও এক নবীর উম্মাত হওয়া সত্ত্বেও আজো আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারলাম না। ফলশ্রুতিতে ফিলিস্তিনসহ সমগ্র বিশ্বজুড়ে দুইশত কোটি মুসলিমের বিরাট এ বাহিনী প্রতিনিয়ত মার খাচ্ছেন প্রতিনিয়ত। এভাবে আর কত মার খাবে মুসলিম উম্মাহ?

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম উম্মাহর সদস্যবৃন্দ যেন আর মার খেতে না হয়, দেশে দেশে নির্যাতিত ও অপমানিত হতে না হয় বরং মুসলিম উম্মাহ যেন ঐক্যবদ্ধ হতে পারে, কুফরি শক্তির চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র ও অত্যাচার এবং নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচতে পারে। এক মুসলিমের বিপদে যেন আরেক মুসলিম, এক মুসলিম দেশের বিপদে যেন আরেক মুসলিম দেশ এগিয়ে আসতে পারে। পরস্পর পরস্পরের প্রতি আরো সদয় ও আন্তরিক হতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "আর তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করছ না সে সব দুর্বল নারী, পুরুষ এবং শিশুদের (রক্ষার) জন্য? যারা বলছে: 'হে আমাদের প্রতিপালক, অত্যাচারী অধিবাসী বিশিষ্ট এ জনপদ থেকে আপনি আমাদেরকে উদ্ধার করুন। আর আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন অভিভাবক এবং একজন্য সাহায্যকারী প্রেরণ করুন।" (আল কুরআন, ০৪:৭৫)

বিশ্ব নবী (স.) বলেছেন: "সকল মুসলিম এক ব্যক্তির সমতুল্য। যদি তার চক্ষু পীড়িত হয় তবে তার সমগ্র দেহ পীড়িত হয়ে পড়ে। যদি তার মাথা আক্রান্ত হয় তাহলে সমগ্র শরীরই আক্রান্ত হয়ে পড়ে।" (মুসলিম, ই.ফা.বা, হাদীস নং-৬৩৫৩)

মুসলিম উম্মাহ যেন জাগতিক ভেদাভেদ ভুলে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে পারেন সে প্রেরণা দেয়ার জন্যই এ ক্ষুদ্র প্রয়াস "বিশ্ব মুসলিম ঐক্য সমস্যা ও করণীয় (২০০০-২০১৫)।"

আল্লাহ তা'আলার কাছে কড়জোরে প্রার্থনা করছি তিনি যেন চলতি এ দশকের মধ্যেই মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলিমদের মাঝের সকল বিভেদের দেয়াল ছিন্ন করে হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য ভূমিকা রাখার তাওফীক দেন। গোটা বিশ্বে যেন আবার মুসলিমদের বিজয়ের সুবাতাস বয়ে চলে, শান্তির ফল্গুধারা আবার যেন সকলকে সিক্ত করে। আর এ জন্য সকলেরই উচিৎ যার যার জায়গা থেকে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের জন্য কাজ করা ও নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

সহায়ক গ্রন্থাবলীর সংক্ষিপ্ত তালিকা

আল-কুর'আন ও তাফসির

- *মু'জামুল কুর'আন*, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনুদিত ও সম্পাদিত, ঢাকা: ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশন এন্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন, অক্টোবর ২০১২
- আল জাসসাস, *আহকামূল কুর'আন*, কায়রো: দারুল মা'আরিফা, ১৪০১ হিজরি
- আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্ন কাছির, *তাফসীরুল কুর'আনিল আযীম*, বৈরুত: দারুল মা'আরিফ, ১৯৮৩ খ্রি.
- তরজমা ও সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনুদিত ও সম্পাদিত, *আল-কুর'আনুল কারীম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২২তম মুদ্রণ, ডিসেম্বর ১৯৯৯
- হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, *কোরআন শরীফ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ*, লন্ডন: আল কোরআন একাডেমী, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১১
- মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, *তাফসীরে নূরুল কুর'আন*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুলাই ১৯৮৮
- মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি আহকামিল কুর'আন*, কায়রো: তাহকীকুত তুরাস, ১৯৮৭ খ্রি.
- মুহাম্মদ ইবন্ জারীর আত-তাবারী, *জামিউল বয়ান আত-তা'বীলির আ'ইল কুর'আন*, বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৩৪৫ হি.
- রাগিব আল-ইস্পাহানী, *আল-মুফরাদাত ফী গারায়িব আল-কুরআন*, কায়রো: মুস্তফা আল-বাবী আল-হালাবী, ১৩২৪ হি.
- সাইয়েদ কুতুব শহীদ, *তাফসির ফি যিলালিল কোরআন*, অনুবাদ: হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, লন্ডন: আল কোরআন একাডেমী, সেপ্টেম্বর ২০১০
- হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফি' (র.), *পবিত্র কোরআনুল করীম (মূল:তাফসীর মা'আরেফুল ক্বোরআন)*, অনুবাদ ও সম্পাদনা মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, মদীনা মোনাওয়ারা: খাদেমুল-হারমাইন আশ শারিফাইন বাদশাহ ফাহাদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি.
- হাফেজ আল্লামা 'ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইব্ন কাসীর (র.), অনু. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *তাফসীর ইবনে কাসীর*, ঢাকা: হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী, বংশাল, জুলাই ২০১০

Dhaka University Institutional Repository

আল-হাদীস

- মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নু'মানী (র.), অনুবাদঃ মাওলানা সাঈদুল হক, *মা'আরিফুল হাদীস*, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
- মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ আল-খতীব, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, দিল্লীঃ কুতুবখানা রশিদীয়া, ১৩৮৭ হিজরি
- সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *তাজরীদুস্‌ সিহাহ্‌* (পুনরাবৃত্তিমুক্ত সহীহ্‌ হাদীস), ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৭
- ইব্‌ন আবী শায়বাহ, 'আবদুল্লাহ, *আল-মুছান্নাফ*, রিয়াদঃ মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪০৯ হিজরি.
- বায়হাকী, আবূ বাকর আহমাদ, *আস-সুনানুল কুবরা'* , মক্কাঃ মাকতাবাতু দারিল বায, ১৯৯৪
- দারু কুতনী, 'আলী, *আস-সুনান*, বৈরূতঃ দারুল মা'আরিফাহ, ১৯৬৬
- ইবনুল আছীর, মাজুদ্দীন, *আন-নিহায়াতু ফী গারীবিল হাদীস*, বৈরূত : আল-মাকতাবাতুল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৭৯
- আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী, *বুখারী শরীফ*, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত ও অনুদিত, ঢাকাঃ ই.ফা.বা. প্রকাশকাল, জুন-২০০৩
- আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, অনুবাদঃ মাওলানা আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ জালালাবাদী, ঢাকাঃ ই.ফা.বা. সেপ্টেম্বর ২০০৮
- ইমাম আবু ঈসা আত-তিরমিযী (র.), জামে আত-তিরমিযী, অনুবাদ ও সম্পাদনা মুহাম্মাদ মূসা, ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, প্রকাশকাল-৭ম প্রকাশ, মে-২০১৮
- আবূ না'ঈম আল-ইস্পাহানী, *মা'আরিফুতস সাহাবাহ*, রিয়াদঃ দারুল ওয়াতন, ১৪১৯ হি.

সীরাত ও তা'রীখ

- শায়খ সফিউর রহমান মুবারকপুরী, *আর রাহীকুল মাখতুম*, অনু. খাদিজা আক্তার রেজায়ী, লন্ডনঃ আল কুর'আন একাডেমী, আগষ্ট ২০১২
- আস সীরাতুন নববিয়্যাহ, *ইবনু হিশাম*, মাকতাবাতুল মা'আরিফিল ইসলামিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, তা. বি.
- মাওলানা ফজলুর রহমান ও আবুল কালাম আযাদ, *বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর জীবনী*, ঢাকাঃ মীনা বুক হাউজ, প্রথম প্রকাশ ফেব্রু. ২০০৫

- ড. মজিদ খান, *শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)*, অনুবাদঃ আবু মহাম্মদ, ঢাকাঃ ই.ফা.বা. প্রকাশকাল, এপ্রিল ২০০৫
- তাবারী, আবূ জা'ফার মুহাম্মদ ইবনু জারীর,*তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, লিডেনঃ ১৮৭৯
- ইব্‌ন হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, বৈরূতঃ দারু ইহ্‌য়া'ইত্ তুরাছিল আরবী, ১৪১৫ হি.
- ইব্‌ন কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, বৈরূতঃ দারুল ফিকর, তা. বি.
- আল-বালাযূরী, *ফুতূহুল বুলদান*, বৈরূতঃ দারুল হিলাল, ১৪০৩ হি.
- গোলাম মোস্তফা, *বিশ্বনবী*, ঢাকাঃ আহমেদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৯৩ খ্রি.
- মেজর জেনারেল এম এ মতিন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সতেরো'শ সাতান্ন থেকে উনিশ'শ সাতচল্লিশ*, দি ইউনিভার্সেল একাডেমী, ৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারী-২০১৭

বিশ্বকোষ ও অভিধান

- সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকাঃ ই. ফা. বা. পঞ্চম সংস্করণ, মে-২০০৭
- ইবরাহীম মাদকুর, *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, দেওবন্দঃ আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, ১৩৩৬ হি.
- ইব্‌ন মানযুর, *লিসানুল আরব*, বৈরুতঃ দারুল ইহ্ইয়াউত তুরাছিল আরাবী, ১৯৯৬
- ড. বা'লবাক্কী রুহী, *আল মাওরিদ (আরবী-ইংরেজী অভিধান)*, বৈরুতঃ দারুল ইলম লিল মালাইন, একাদশ সংস্করণ, ১৯৯৯
- ডক্টর মুহাম্মদ এনামূল হক ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, পরিমার্জিত সংস্করণ, চতুর্দশ পুনর্মুদ্রণ জুন ২০১১ খ্রি.
- ড. খুরশিদ আলম, *পকেট বাংলা বানান অভিধান*, ঢাকাঃ মিনার্ভা পাবলিকেশন্স, ফেব্রু. ২০০১
- ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী বাংলা অভিধান*, ঢাকাঃ রিয়াদ প্রকাশনী, ৪র্থ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর-২০০৭

- **ফিকহ**

- ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (র), *আল-ফিকহুল আকবার বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা*, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, পৌর বাস টার্মিনাল, ঝিনাইদহ-৭৩০০, প্রকাশকাল নভেম্বর-২০১৭
- অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ ও ড. মোঃ ইবরাহীম, *ফিকহশাস্ত্রের মূলনীতি ও ইতিহাস*, মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, প্রকাশকাল-জুন ২০১৯
- ড. আহমদ আলী, *তুলনামূলক ফিকহ*, বাংলাদেশ ল' রিসার্চ এন্ড লিগাল এইড সেন্টার, ৫৫/বি পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০, প্রকাশকাল অক্টোবর-২০১৮
- ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক, *ইলমুল ফিক্হ ঃ সূচনা ও ক্রমবিকাশ*, বিআইসি, ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫, প্রকাশকাল সেপ্টেম্বর-২০১৬
- আব্দুল্লাহ যায়ল‘ঈ, *নাসবুর রায়াহ*, কায়রো: দারুল হাদীস, ১৩০৫ হিজরি
- আলাউদ্দীন আল-মুত্তাকী, *কানুযূল উম্মাল*, বৈরুতঃ মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৫ খ্রি.
- আহমাদ শারাবী, *আল-হুকমাতুল ইসলামিয়া*, কায়রো: দারুল আরব, ১৯৯১ খ্রি.
- আবূ মুহাম্মদ বদরুদ্দীন আল-আইনী, *‘উমদাতুল কারী*, দিল্লীঃ মাকতাবাতে রশিদীয়া, ১৯৮১
- ড. আবদেল রহীম ‘উমরান, *তানজিম আল উসরাত ফীত তিরাসিল ইসলামী*, কায়রো: জামেয়া আল-আযহার, ১৯৯৪
- ড. ওয়াহবা আয-যুহায়লী, *আল-ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু*, বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৯৮৯ খ্রি.
- সাইয়েদ সাবিক, *ফিকহুস সুন্নাহ*, কায়রো: দারুল ফাতহ লিল ‘ইলমিল আরাবী, ১৯৯০ খ্রি.
- মাওলানা ইউসুফ ইসলাহী, *আসান ফেকাহ*, অনুবাদ ও সম্পাদনাঃ আব্বাস আলী খান, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, এপ্রিল ২০০৯

- **বিবিধ**

- ড. রাগেব সারজানী, *তাতারীদের ইতিহাস*, ঢাকাঃ মাকতাবাতুল হাসান, প্রকাশকাল, জানুয়ারী-২০১৮
- প্রফেসর ড. নাজমুদ্দিন এরবাকান, *ইসলাম ও জ্ঞান*, অনু. মু. বুরহান উদ্দিন, মক্তব প্রকাশন, টঙ্গী গাজীপুর, প্রকাশকাল মে-২০১৯

- শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলাবী (র), অনু. আব্দুস শহীদ নাসিম, *মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়*, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ঢাকা-১০০০, প্রকাশকাল জুন-২০১৬
- ড. খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (র), *কুরআন সুন্নাহর আলোকে জামায়াত ও ঐক্য*, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, পৌর বাস টার্মিনাল, ঝিনাইদহ-৭৩০০, প্রকাশকাল অক্টোবর-২০১৭
- রইস আহমদ জাফরী, চার ইমামের জীবন কথা, অনুবাদ মোস্তফা ওয়াহীদুজ্জামান, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২য় প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী-২০০৯
- মুহাম্মদ ইরফান হাওলাদার, *বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসী এবং রিসালায়ে নুর*, গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, প্রকাশকাল ২১ ফেব্রুয়ারী-২০২০
- ড. মোস্তফা আস-সিবায়ী, অনু. হাফেয মাওলানা আকরাম ফারুক, *মানবতার কল্যাণে ইসলামী সভ্যতার অবিস্মরণীয় অবদান*, হাসনা প্রকাশনী নিউ, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫, প্রকাশকাল নভেম্বর-২০০০
- মুসা আল হাফিজ, *আমেরিকা মুসলিমদের আবিষ্কার*, কালান্তর প্রকাশনী, সিটি বানিজ্যিক ভবন, বন্দর বাজার সিলেট, বাংলাদেশ, প্রকাশকাল এপ্রিল ২০১৭
- ড. খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (র), *কুরআন সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা*, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, পৌর বাস টার্মিনাল, ঝিনাইদহ-৭৩০০, প্রকাশকাল ডিসেম্বর-২০১৭
- খুররম মুরাদ, অনু. আব্দুস শহীদ নাসিম, *সীরাতে রাসূলের আয়নায় ইসলামী নেতৃত্বের গুণাবলী*, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, প্রকাশকাল জুন ২০০৭
- আহমাদ মানসুর আবূ আওদাহ, *ওয়াহদাতুল উম্মাহ আল ইসলামিয়্যাহ ফিস সুন্নাতিন নববিয়্যাহ দেরাসাতুন মাউদু'ইয়াতুন*, জামেআহ ইসলামিয়্যাহ গায্যাহ, ফিলিস্তিন, প্রকাশকাল ২০০৯
- মোঃ মোস্তফা জামান, *বিশ্ববিবেক ঐক্য গড় রোহিঙ্গাদের রক্ষা কর*, দারুন নাজাত পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, সেপ্টেম্বর-২০১৭
- মওলানা সদরুদ্দিন ইসলাহী, অনু. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব*, খায়রুন প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, প্রকাশকাল জুন-২০১৫
- মোস্তফা ফয়সাল পারভেজ, *আতাতুর্ক থেকে এরদোয়ান বদলে যাওয়া তুরস্কের ১০০ বছর*, গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, প্রকাশকাল ১৮ মার্চ-২০১৯
- তামিম আনসারী, অনু. আলী আহমাদ মাবরুর, *ডেসটিনি ডিজরাপ্টেড ইসলামের চোখে পৃথিবীর ইতিহাস*, গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, প্রকাশকাল এপ্রিল-২০১৮

Dhaka University Institutional Repository

- ফিরাস আল খতীব, অনু. আলী আহমাদ মাবরুর, *লস্ট ইসলামিক হিস্ট্রি ইসলামের হারানো ইতিহাস*, ১০/৪ আরামবাগ ঢাকা-১০০ প্রকাশকাল-জুলাই ২০১৯
- মোহাম্মাদ ফারিস, *প্রোডাক্টিভ মুসলিম*, গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারী-২০২০
- ড. আবুলা আ'লা মুহাম্মদ হোছামুদ্দিন, *আল্লামা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (র) জীবন কর্ম ও চিন্তাধারা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, প্রকাশকাল মে-২০১৮
- মুহাম্মাদ ইবনু আবিদ-দুনইয়া (র), *আল্লাহর প্রতি সু ধারনা*, ওয়াফি পাবলিকেশন বাড়ি ৩৭৬, রোড ২৮ মহাখালী ডিওএইচএস, ঢাকা, প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারী-২০২০
- মুহাম্মাদ ইবনু আবিদ-দুনইয়া (র), অনু. মুনীরুল ইসলাম ইবনু যাকির, *সীসাঢালা প্রাচীর*, মাদরাসা মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, প্রকাশকাল, জুন-২০২০
- মুহাম্মাদ সিদ্দিক, *ষড়যন্ত্রের কবলে উপমহাদেশের মুসলমান*, প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স, বড়মগবাজার, ঢাকা-১২১৭, প্রকাশকাল, ফেব্রুয়ারী-২০০৬
- প্রফেসর ড. ইউসুফ আল কারযাভী, *আধুনিক যুগ ইসলাম কৌশল ও কর্মসূচী*, ১৩৭/এ ওয়াপদা রোড, পশ্চিম রামপুরা, ঢাকা-১২১৯, প্রকাশকাল অক্টোবর-২০০৩
- ড. সৈয়দ শাহ এমরান, *বাংলাদেশ ও ওআইসি*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, প্রকাশকাল এপ্রিল-২০১৮
- মাওলানা মোহম্মাদ আব্দুল মালেক, *উম্মাহর ঐক্য পথ ও পন্থা*, ঢাকা: মারকাযুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়াহ, ১ম প্রকাশ ২৬ মে ২০১২
- আহমাদ মানসুর আবূ আওদাহ, *ওয়াহদাতুল উম্মাহ আল ইসলামিয়্যাহ ফিস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যাহ*, গায্যাহ: জামেআহ আল ইসলামিয়্যাহ, কুল্লিয়্যাতু উসূলুদ্দীন, ২০০৯
- হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, *মনীষীদের কুরআন গবেষণা*, লন্ডন: আল কুরআন একাডেমী, ফেব্রু ২০০৫
- খোন্দকার এমদাদুল করিম, *পবিত্র কুর্আন শরীফে কোথায় কি পাবেন: প্রসঙ্গে নিদর্শন*, ঢাকা: অন্তরালোক প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর ২০০৭
- সাইয়েদ কুতুব, *ইসলামের স্বর্ণ যুগে সামজিক ন্যায়-নীতি*, অনুবাদ: আকরাম ফারুক, ঢাকা: স্মৃতি প্রকাশনী, জুলাই ২০০৫
- ইমাম কুরতুবী (রহ.), *রাসূলুল্লাহ সা. এর বিচারালয়*, অনু: মুহাম্মাদ খলিলুর রহমান মুমিন, ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন্স, জানুয়ারী ২০০২
- আল্লামা জামাল আল বাদাবী, *ইসলামের সামাজিক বিধান*, ড. আবু খলদুন আল মাহমুদ, ড. শারমিন ইসলাম, ঢাকা: দি পাইওনিয়ার, সেপ্টেম্বর ২০০৯

- সাইয়েদ কুতুব শহীদ, *কালজয়ী আদর্শ ইসলাম*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, মে ২০০৩
- সাইয়েদ কুতুব শহীদ, অনু. গোলাম সোবহান সিদ্দিকী, *বিশ্বশান্তি ও ইসলাম*, ফাহিম বুক ডিপো, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, প্রকাশকাল এপ্রিল-২০১৮
- মাওলানা আব্দুল জলিল মাযাহেরী (র.), *তলোয়ারে নয় উদারতায়*, ঢাকা: এমদাদিয়া পুস্তকালয়, অক্টোবর ১৯৯৬
- মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *আল কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার*, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, জানুয়ারী ২০০৭
- প্রফেসর ড. ইউসুফ আল কারযাভী, *আধুনিক যুগ ইসলাম কৌশল ও কর্মসূচী*, অুনবাদ: মুহাম্মাদ সানাউল্লাহ আখুঞ্জী, ঢাকা:নতুন সফর প্রকাশনী, অক্টোবর ২০০৩
- ড. মোবারক হোসাইন, *সমকালীন চ্যালেঞ্জ নেতা ও নেতৃত্ব*, গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, প্রকাশকাল এপ্রিল-২০১৯
- মাওলানা মুহাম্মাদ বুরহানুদ্দীন সাম্ভলী, *পারিবারিক সংকট নিরসনে ইসলাম*, অনু: মাওলানা আবুল কাশেম মুহাম্মাদ ছিফাতুল্লাহ, ঢাকা: ই.ফা.বা. জুন ২০০৩
- আব্দুর রশিদ মতিন, *রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইসলামী প্রেক্ষিত*, অনু: এ কে এম সালেহ উদ্দিন, ঢাকা: বিআইআইটি, এপ্রিল ২০০৮
- এস এ এম মহিউদ্দিন খান, *ইসলাম এবং বিশ্ব শান্তি*, ঢাকা: খান পাবলিকেশান্স, ডিসেম্বর ২০০২
- অধ্যাপক মফিজুর রহমান, *বিশ্ব শান্তির রোড ম্যাপ*, চট্টগ্রাম: মদীনা একাডেমী, মে ২০০৬
- ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *খুৎবাতুল ইসলাম*, ঝিনাইদহ: আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ডিসেম্বর ২০০৮
- আহমেদ দিদাত, অনু: এ কে মোহাম্মদ আলী, *অলৌকিক কিতাব আল কুর'আন*, ঢাকা: রেক্স্ পাবলিকেশন্স, মার্চ ২০০৮
- খন্দকার আবুল খায়ের, *বিজ্ঞানময় কুর'আন কুর'আনই বিজ্ঞানের উৎস*, ঢাকা: খন্দকার প্রকাশনী, মার্চ ২০০৮
- মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল আযিয, *বিশ্ব শান্তির সন্ধানে*, ঢাকা: কাঁটাবন বুক কর্ণার, আগষ্ট ২০০৯
- ড. এসরার আহমাদ, *কুর'আনের পরিচয়*, অনু: মোস্তফা ওয়াহিদুজ্জামান, ঢাকা: নাকিব পাবলিকেশন্স, অক্টোবর ২০০৭
- মোঃ সাইফুর রহমান, *কুর'আন হাদীসের আলোকে সুন্দর জীবন*, ঢাকা: আর আই এস পাবলিকেশন্স, জুলাই ২০১২
- ড. ইউসুফ আল কারযাভী, ইসলামে দারিদ্র বিমোচন, ঢাকা: সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, এপ্রিল-২০১৮

- স্যামুয়েল পি হান্টিংটন, অনুবাদ: ড. মোহাম্মদ আব্দুর রশীদ, *দ্য ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশন্স এন্ড দ্য রিমেকিং অব ওয়ার্ল্ড অর্ডার*, ঢাকা: অনিন্দ প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী- ২০১০
- সংকলন ও সম্পাদনা, আই. ই. আর এর ফেলোবৃন্দ কর্তৃক, *পবিত্র কুরআনের আলোকে মানুষের করণীয় ও বর্জনীয়*, ঢাকা: ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশন এন্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন, অক্টোবর- ২০০৩
- আব্দুল মান্নান তালিব, *উপমহাদেশে ইংরেজ বিরোধী সংগ্রামের সূচনায় উলামায়ে কেরাম*, আধুনিক প্রকাশনী ঢাকা, প্রকাশকাল ডিসেম্বর-২০০২
- মাওলানা আব্দুস শহীদ নাসিম, *কুর'আন ও পরিবার*, ঢাকা: বর্ণালী বুক সেন্টার, ডিসেম্বর ২০০৬
- ড. মুহম্মদ ইউসুফ, *সামাজিক নিরাপত্তা ও ইসলাম*, পিএইচ. ডি. গবেষণাপত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৮
- অধ্যাপক খুরশীদ আলম, *ইসলামী শিক্ষার মূলনীতি*, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী - ১৯৯০
- আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, জুন ১৯৯৪
- আহমাদ মুহাম্মদ আস্‌সাফ, *আল-হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম*, বৈরূত: দারুল ইহয়া'ইল 'উলূম ১৯৮৮
- আবদুল হামীদ তাহমায, *আল-ফিকহুল হানাফী ফী ছাওবিহিল জাদীদ*, বৈরূত: দারুল কলম ২০০১
- ইমাম গাযালী, *এহইয়াউ 'উলূমিদ্দীন*, ভাষান্তর: মুহিউদ্দীন খান, ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশান্স, সেপ্টেম্বর ২০০৪
- এ. কে. এম. নাজির আহমেদ, *ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ফেব্রু. ২০০৫
- গোলাম মোস্তফা কিরণ, *আজকের বিশ্ব*, ঢাকা: প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স, ৩৬ তম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০৮
- জাওয়াদ আলী, *আল-মুফাছ্‌ছাল ফী তারীখিল আরব কাবলাল ইসলাম*, বৈরূত: দারুল 'ইলম, ১৯৭১
- ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, অনু: মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী ১৯৯৫
- ড. আবদুল কারীম যায়দান, *আল-মুফাছ্‌ছাল ফী আহকামিল মার'আতি ওয়াল বায়তিল মুসলিমি*, বৈরূত: মু'আস্‌সাসাতুর রিসালাহ ১৯৯৭
- মুফতি তাকী উসমানী, *স্পেনের কান্না*, ঢাকা: মাকতাবুল হাসান, নভেম্বর ২০১৯
- মরহুম আব্বাস আলী খান, *মাওলানা মওদূদীর বহুমূখী অবদান*, ঢাকা: সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, এপ্রিল-২০০৪

Dhaka University Institutional Repository

- খলিল আহমদ হামেদী, *শহীদ হাসানুল বান্নার ডায়েরী*, ঢাকা: প্রফেসর বুক কর্ণার, নভেম্বর-২০১২
- ড. আহমদ আলী, *ইসলামের দৃষ্টিতে পোশাক পর্দা ও সাজসজ্জা*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ২০১০
- ড. আহমাদ আলী, *ইসলামে শাস্তি আইন*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ২০১১
- ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, গবেষণা বিভাগ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগস্ট ২০০৪
- মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন, *ইসলামে মানবাধিকার*, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, এপ্রিল ১৯৯২
- অধ্যাপক এম. আই. চৌধুরী ও মারমাডিউক পিকথল অনুদিত, *কুর'আনের উপদেশাবলী*, ঢাকা: ফাতেমা-যাহরা পাবলিশার্স, জুন ২০০৪
- মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রব, *অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে আল-কুর'আন*, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, নভেম্বর ২০০২
- ড. মরিস বুকাইলি, অনুবাদ আখ্‌তার-উল্‌-আলম, *বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান*, ঢাকা: জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, সপ্তম সংস্করণ, অক্টোবর, ১৯৯৬
- ডাঃ মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ, অনুবাদ: হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও আধুনিক বিজ্ঞান*, ঢাকা: আল-কাওসার প্রকাশনী, নভেম্বর ২০০৯
- প্রফেসর, ড. এমাজউদ্দীন আহ্‌মদ, *ইসলাম ও উন্নত জীবন ব্যবস্থা*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল ২০০৫ খ্রি.
- ফুয়াদ আল খতীব, *ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা*, ঢাকা: বাংলাদেশ-সৌদি আরব মৈত্রী সমিতি, জুলাই, ১৯৮০
- মুহাম্মদ নূরুল আমীন, *বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান*, ঢাকা: আহসান পাব. ফ্রেব্রু. ২০০৮
- মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম*, ঢাকা: ই.ফা.বা. মে ২০০৭
- মুহাম্মদ ওয়াজিদুর রহমান ও মোঃ সাহাব উদ্দীন, *ইসলামী শিক্ষা পরিচিতি*, ঢাকা: পূর্বদেশ পাবলিকেশন্স, ১৯৯৬ খ্রি.
- মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামী রাষ্ট্রচিন্তা*, ঢাকা: আজিজিয়া বুক ডিপো ২০১০
- শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী, *আল-ইনসাফ ফী বায়ানি আসবাবিল ইখতিলাফ*, দেওবন্দ: মাকতাবাতে রশিদীয়া ১৪১২ হি.
- শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী, *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ*, দিল্লী: কুতুবখানা রশিদীয়া ১৩৭৩ হি.

- সাইয়েদ কুতুব, *আল-ইসলাম ওয়া সালামুল আলম*, বৈরুত: দারুস সালাম ১৯৯৩ হি.
- সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা: ই ফা বা ২০০০
- এ.কে.এম. নাজির আহমদ, *ইসলামের সোনালী যুগ*, ঢাকা: বিআইসি, অক্টোবর ২০০৪
- সৈয়দ আমীর আলী, *দি স্পিরিট অব ইসলাম*, অনুবাদ: মুহাম্মদ দরবেশ আলী খান, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯৩
- সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *হযরত রাসূলে করীম (স.) : জীবন ও শিক্ষা*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯৭
- হাফিজ ইব্ন হাযম, *আল-আহকাম*, কায়রো: মুআস্সাসাতুর রিসালাহ ১৪১০ হিজরি
- আবু সালীম মুহাম্মাদ আব্দুল হাই, অনু. জুলফিকার আহমাদ কিসমতি, *আদর্শ কিভাবে প্রচার করতে হবে*, আইসি এস প্রকাশনী পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০, প্রকাশকাল ডিসেম্বর-২০১৯
- *সেমিনার স্মারক গ্রন্থ ২০০৮*, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
- *সেমিনার প্রবন্ধ সংকলন* ২০০৯, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
- *সেমিনার প্রবন্ধ সংকলন* ২০১০, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
- *দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব ইসলামিক স্টাডিজ*, সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ষ-০২, সংখ্যা-০১, জানু.- জুন ২০০৮
- ড. আহমদ আলী, *ইসলামের শাস্তি আইন*, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫, ৩য় প্রকাশ, নভেম্বর-২০১৯
- *আল মাকতাবাতুস্ শামিলাহ*, ২য় সংস্করণ, তা. বি. (সফ্টওয়্যার)
- *মাকতাবাতুল মা'আরিফিল ইসলামিয়্যাহ*, প্রথম সংস্করণ, তা. বি. (সফ্টওয়্যার)

তাম্মাত বিল খইর